নিরুদ্দেশ

শ্রীপৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০৩-১-১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ··· কলিকাতা-৬

চার টাকা

8.7.74
8577

প্রথম প্রকাশ
আশ্বিন—১৩৬১

4402
897

জ্যেষ্ঠপুত্র

শ্রীমান মলয়াদ্রি ভট্টাচার্য্যকে

দিলাম

4402

নিবেদন

যাঁহারা দিবানিদ্রার অনুপানরূপে বা রেলগাড়ীতে চড়িয়া সময় ক্ষেপণের অবলেহ রূপে এই উপন্যাসে একটা সুষ্ঠু সঙ্গত গল্প খুঁজিবেন তাঁহারা হতাশ হইবেন এ কথা পূর্ব্বেই বলিয়া রাখা ভাল। তবে যাঁহারা দরদী অন্তর লইয়া চিন্তা করেন, আপনার জীবনকে অনুভব করিতে চান তাঁহারা কিছু চিন্তার খোরাক পাইবেন এ আশ্বাস দিতে পারি। সেই প্রসঙ্গে কিছু বক্তব্য আছে—

সভ্যতা বলিতে আমরা কি বুঝি তাহা লইয়া তর্ক চলিতে পারে—চিন্তাশীল ব্যক্তিগণও এ বিষয়ে একমত নয়। তবে আমার ব্যক্তিগত ধারণা, অন্তরের বিস্তৃতি, পরের জন্য অনুভূতিশীলতার উৎকর্ষতাই সভ্যতা। এবং তাহাই মাপকাঠি হওয়া উচিত। আদিম অবস্থার পপুয়ানগণ মানুষ ধরিয়া জ্যান্ত পোড়াইয়া খায়—ইহা তাহাদের উৎসব। আমরা সভ্য—মানুষ খাই না—অর্থাৎ আমাদের মধ্যে মানুষের প্রতি ঐটুকু সমবেদনা আজ কয়েক হাজার বৎসরে জন্মিয়াছে। জ্যান্ত পোড়াইয়া না খাইলেও অবশ্য রক্তশোষণ করি পরোক্ষ ভাবে। এই মাপকাঠির বিচারে দেখা যায়, ভারতীয় ত্যাগমূলক সভ্যতার উপর প্রতিষ্ঠিত এই বহুসম্বন্ধবিশিষ্ট সমাজ ও পরিবারে একদা যে মনের বিস্তৃতি ছিল আজ তাহা নাই। পাশ্চাত্য সভ্যতার আক্রমণে আমাদের গ্রাম শোষণ করিয়া নগর গড়িয়া উঠিয়াছে—বিলাস ব্যসন বাড়িয়া অভাবকে বাড়াইয়াছে। মানুষ স্বার্থপর ও আত্মকেন্দ্রিক হইয়া পড়িয়া সমাজ ও পরিবার জীবনে নিজের দুঃখকে শতগুণ বাড়াইয়া লইয়াছে। প্রাচ্যের লৌকিক ধর্ম্মশিক্ষা, সামাজিক আচার শীল আমরা ত্যাগ করিয়াছি, এবং

অসম্পূর্ণ পাশ্চাত্য শিক্ষা লাভ করিয়া নাগরিকতাবোধ অর্জ্জন করিতে পারি নাই—এবং এমনি একটা অসংবৃত শৃঙ্খলহীন অবস্থায় নতুন শিক্ষা দেওয়া স্বার্থবুদ্ধি ও আত্মকেন্দ্রিকতা সমস্ত জাতিকে দুর্নীতি ও দুর্য্যোগের মধ্যে ডুবাইয়া দিয়াছে। দেশে আজ দুর্নীতির জন্যে অনেকে দুঃখ বোধ করেন কিন্তু সে বিষ সমাজ দেহের সমস্ত পেশী ও স্নায়ুতে বহুদিন ধরিয়া সঞ্চারিত হইয়াছে—আজ তাই রোগ লক্ষণটা ভয়ানক ভাবে প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। বর্ত্তমান যুগে আত্মঘাতী পাশ্চাত্য শিক্ষার দিকে আমরা অনিচ্ছাকৃত ভাবেই চালিত হইতেছি—এবং অসহায় ভাবেই পৃথিবীর আবর্ত্তে আপনাদিগকে হারাইতে হইবে।

আমাদের দেশে মানবমন সমবেদনাশীল ও অনুভূতিসম্পন্ন ছিল—ত্যাগ ছিল জীবন-ব্রত কিন্তু কেমন করিয়া সেই মন এমন আত্মকেন্দ্রিক হইয়া উঠিল তাহাই লিখিত রহিয়াছে বিগত একশত বৎসরের সমাজ অঙ্গে। 'গোপালপুর' গ্রামের একশত বৎসরের ইতিহাসের মধ্যে সেই মনের ক্রমপরিবর্ত্তন ও তাহার একটা চলচ্চিত্র দিতে চাহিয়াছি "নিরুদ্দেশে"—জীবনের গভীরতর অনুভূতির চিত্র। ধৃষ্টতা হইলেও বলিব, ইহাতে অবসর বিনোদনের মত গল্প নাই। অবসর চিন্তার উপাদান আছে।

আশ্বিন, ১৩৬১

বিনীত
শ্রীপৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তের বুকের উপর দিয়া সর্পিল বিরাট সড়ক রচনা করিয়াছিলেন শের শাহ—ইতিহাসের পৃষ্ঠায় তাঁর নাম লেখা আছে। কিন্তু যাহারা রুধির স্রাবে, কোদাল ঝুড়িতে মাটি কাটিয়া বহিয়াছিল তাহাদের কথা কোথায়ও লেখা নাই। সে কথা কেহ জানে না, ইতিহাস রাখিয়াছে সম্রাটের খেয়াল-খুশীর ফর্দ্দ ও তালিকা, জনগণের ইতিহাস কেহ লিখে নাই—তাহাদের সুখ-দুঃখ সমাজ-সংসার রহিয়া গিয়াছে অজ্ঞাত—

এই রাস্তা দিয়া চলিত ঘোড়ার ডাক—পাশে পাশে ছিল গ্রাম, সেই গ্রামের দুঃখ বেদনা, উৎসব আনন্দ ধীরে ধীরে কালের গর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে—কালপ্রবাহের মাঝে তাহারা অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে কিন্তু সৈকতরেখা হয়ত বা বিলীন হয় নাই, ঐতিহাসিকের গবেষণাগারে ...লের হইয়া রহিয়া গিয়াছে কৌতূহলীর জন্যে, জনস্রোত চলিয়াছে উদাসীন—সে খবর তাহারা রাখে না—

ঐ রাস্তার পাশে একটি গ্রাম, ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, গয়লা, ধোপা, নাপিত, বাগ্দী, বাউরী মিশ্রিত বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম। গ্রামের পরে বিস্তীর্ণ মাঠের বুক চিরিয়া চলিয়া গিয়াছে শেরশাহের কীর্ত্তি, মাঠের মাঝে কদাচিৎ তাল বট অশ্বত্থ গাছ—উচ্চাবচ বন্ধুর মাঠ—বিশুষ্ক উষর—মাঠের প্রান্তে বন, তাহার পর আবার মাঠ। তাহার পরেও চলিয়াছে সড়ক—

আজ তাহার আশে পাশে কলিয়ারী ও কারখানার গগনচুম্বী চিমনি আকাশকে ধূম-মলিন করিয়া তুলে। বাঁশী বাজে—পাটকল, তুলার কল, লোহার কারখানা আরও কত কি, মেষপালের মত মানুষ ছুটে যন্ত্রের আহ্বানে ফিরিয়া আসে—নির্জ্জন প্রান্তর হইয়াছে জনপদ, জনপদ হইয়াছে ভগ্নস্তূপ—কালের আবর্ত্তন বিবর্ত্তনে চলিয়াছে পৃথিবীর তেপান্তরে মানুষের নিরুদ্দেশ যাত্রা, উদ্দেশ্যহীন—আদিম মানুষের মত

ভোগের উৎসাহে ছুটিয়াছে, সহজ প্রকৃতির উপরে শিক্ষা ও সভ্যতার রঙীন প্রলেপ দিয়া—

*

গ্রামের নাম গোপালপুর। গ্রামের প্রান্তে তালবন-ঘেরা বিরাট দিঘীতে সলজ্জ গৃহবধূগণ জল আনিতে যায়, ঘোমটার ফাঁকে চাহিয়া দেখে দূর-বনান্তের কোলে অস্তায়মান সূর্য্যাস্তের রঙীন সমারোহ। ঘাটে বসিয়া আলোচনা চলে সিপাহীদের কথা, সিপাহীরা ইংরাজদের সহিত লড়িয়াছে, লড়িতেছে—নীলকুঠিয়াল সাহেব সস্ত্রীক কোথায় পলাইয়াছেন, লাঠিয়াল কালী বাগ্দী ও নীলমণি বাউরীর কঠোর পাহারা তাহাদিগকে আটকাইতে পারে নাই। ঠেঙ্গাড়ে সহদেব কুর্ম্মী কোথায় নাকি গিয়াছে ...বের অত্যাচারী সরকারকে শেষ করিতে—সভয়ে আলোচনা চলে ঘাটে বধূগণের মাঝে—মাঠে কৃষকগণের মাঝে—চণ্ডীমণ্ডপে ঠাকুরদের মাঝে, মহুয়া-মদ্যপানের পরে বাউরী-কুর্ম্মী পাড়ায়—

অগ্রহায়ণের সন্ধ্যা। ভগবতী চাটুয্যে মহাশয়ের চণ্ডীমণ্ডপের পাশার আড্ডা সবেমাত্র শেষ হইয়াছে। সারদা মল্লিক মহাশয়, মতি ভট্টাচার্য্য গৃহে ফিরিতেছিলেন। ঘরে ঘরে তুলসী তলায় রেড়ীর তেলের প্রদীপ জ্বলিয়াছে, শাঁখের শব্দ উঠিয়াছে, শিবমন্দিরে আরতি আরম্ভ হয় নাই। গ্রামের মাঝে ছায়াঘন অন্ধকার, মাঠে তখনও গোধূলির দীপ্তি। মতি ঠাকুর মশায় দ্রুত ফিরিতেছিলেন—আহ্নিক করিয়া ঠাকুরকে বৈকালী দিতে হইবে, তাহার পর আছে নিত্যকার ভাগবত না হয় রামায়ণ পাঠ।

পথের পাশেই পাড়ার শেষ প্রান্তে আদাড়ী ঠাকুরের বাড়ী—সে একাই থাকে—অবিবাহিত ভদ্রলোক গান রচনা করে, আপন মনে গায়। স্বহস্তে রাঁধিয়া খায়, সামান্য ভূসম্পত্তি ও ফলমূল বেচিয়া এবং নিমন্ত্রণ

খাইয়া একপেট চলিয়া যায়—অর্থাভাবে কন্যাপণ দিতে না পারায় তাহার বিবাহ হয় নাই--

মতি ভট্টাচার্য্য যাইতে যাইতে একটা হৈ হৈ গোলমাল শুনিয়া থমকিয়া দাঁড়াইলেন। আদাড়ী ঠাকুরের বাড়ীতে মশাল জ্বালাইয়া, লাঠি ঠেঙ্গা লইয়া কাহারা যেন হল্লা করিতেছে। মতি ঠাকুর কৌতূহলী হইয়া আগাইয়া গেলেন—ডাকাতি হইবে আদাড়ী ঠাকুরের বাড়ী! এমনি সন্ধ্যায়?

উঠানে আসিয়া দেখেন, সদ্গোপ চাষী পাড়ার যুবকগণসহ কয়েকজন বাগ্দী কুর্ম্মী যুবক খড়ের মশাল জ্বালাইয়া চীৎকার করিতেছে—চোর চোর—

ঘর একখানি, ঠাকুর বারান্দায় রাঁধিয়া খায়, ঘরে শোয়। সকলে গৃহের চারিপাশ ঘেরিয়া ফেলিয়াছে, পশ্চাতের দরজা বন্ধ। মশালের আলোয় মতি ঠাকুর দেখিলেন—কুলুপ ঝুলিতেছে। তিনি বলিলেন—কি হে, কুলুপ ঝুলছে তা চোর কোথায়?

আজ্ঞে হ ঠাকুর মশায়, ঘরের মাঝে সেঁধিয়ে বসে আছে।

—পাগল আর কি, চোরের কাজ নেই, আদাড়ীর ঘরে ঢুকেছে চুরি করতে—

ঘরের পিছনে আম কাঁঠালের বন, তাহার মাঝে ঝোপঝাড়। মতি ঠাকুর ঘুরিয়া ঘরের পিছনে যাইয়া দেখেন, পিছনের দরজাও বন্ধ। বনের পিছনের প্রান্তরটা শুক্লা সপ্তমীর নিষ্প্রভ চন্দ্রালোকে স্বল্পালোকিত। মতি ঠাকুর বলিলেন—পাগলের দল, ঘরে কুলুপ দেওয়া, দরজা বন্ধ, চোর কোথা থেকে এল? আর জায়গা না পেয়ে এল আদাড়ীর ঘরে—ছিঃ—

ঘরের পিছনে যাহারা পাহারায় নিযুক্ত ছিল তারা অকস্মাৎ যেন বুঝিল যে ব্যাপারটা একটু হাস্যকরই হইয়াছে এবং সকলে একসঙ্গে

উঠানে আসিয়া জটলা করিতে লাগিল। মতি ঠাকুর বলিলেন, এ দুর্বুদ্ধি হ'ল কার রে?

ভরত বাগ্দী বলিল, হ্যাঁ, ঠাকুর মশায়, যেতে যেতে শুন্নু, চুক্‌চুক্ ক'রতে লাগছে, তাই ডেকে আনন্নু সকলকে—

জনতার প্রান্ত হইতে কে যেন বলিল, শেয়াল—শেয়াল— একটা হাসির রোল উঠিল। কে যেন প্রশ্ন করিল, মশায় কোথায় রইছে।

মশালের আলোকগুলি জ্বলিয়া জ্বলিয়া নিস্তেজ হইয়া গিয়াছে, উঠানে আলো ছায়ার মাঝে লোকগুলি আকস্মিকভাবে নীরব হইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, বিমূঢ়ের মত! কেন সকলে আসিয়াছে, কেনই বা সকলে হঠাৎ নীরব কিছুই বোঝা গেল না—লোকগুলির ছায়া উঠানে নাচিয়া ফিরিতেছে—

জনতার প্রান্তে রাঘব মণ্ডল দাঁড়াইয়াছিল একান্তই বিষণ্ণ মনে, সে চীৎকার করিয়া উঠিল, ঐ—ঐ—

তাহার দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া সকলে দেখিল, স্বল্পালোকিত প্রান্তরের উপর দিয়া একটী শুভ্রবেশা নারীমূর্ত্তি দ্রুত ওপারের জঙ্গলে অদৃশ্য হইয়া গেল।

—কি কি?

—মেয়েমানুষ—ঐ ঐ—

কথা বলিতে না বলিতে ছায়ামূর্ত্তিটি বনের মাঝে অন্ধকারে বিলীন হইয়া গিয়াছে, পশ্চাদ্ধাবন করিয়া আর লাভ নাই। সকলে সবিস্ময়ে চাহিয়া রহিল মাত্র—

মতি ঠাকুর বলিলেন, তা চোর কোথায়? ও ত যেন মেয়েমানুষ—

লালমোহন চাষী কহিল, ঘরের মাঝেই ছিল, পালিয়ে গেল—

মতি ঠাকুর উত্তেজিত হইয়া কহিলেন, চল্ ত দেখি পিছনের দরজা। সকলে আসিয়া পিছনের দরজা দেখিল, কিন্তু সেটা পূর্ব্ববৎ দেওয়াই রহিয়াছে। মতি ঠাকুর প্রশ্ন করিলেন, তবে কি বল? কেন হল্লা কচ্ছিস্ সব—

ভরত মুখখানা কাচুমাচু করিয়া কহিল, সন্দ হ'ল তাই—

—যা যা সব বাড়ী যা, তাড়ি খেয়ে হল্লা করার জায়গা মিল্লো না আর? এসেছ ঠাকুর পাড়ায়—

আকস্মিক উত্তেজনার বশে ঠাকুর পাড়ায় আসিয়া হৈ-হল্লা করাটা ভাল হয় নাই, একথাটা যেন তাহাদের এতক্ষণে মনে হইল। নিজেকে নির্দ্দোষ প্রমাণ করিতে ভরত কহিল, ভাবনু চোর—

উপস্থিত জনতা এক পায়ে দুই পায়ে যখন সরিতে আরম্ভ করিয়াছে তখন সামান্য তরকারী হাতে করিয়া আদাড়ী উপস্থিত হইল। সে প্রশ্ন করিল, কি, কি হ'য়েছে?

ঘটনাটা সংক্ষেপে মতি ঠাকুর মশায় জানাইলেন, আদাড়ী ব্যাপারটা শুনিয়া হো হো করিয়া হাসিয়া কহিল, ঠিকই হ'য়েছে ও একটা আছে বটে ঐ মাঠের ধারে শড়া গাছে, একদিন মাছ নিয়ে ফিরছি নাকি সুরে বল্লে, মাঁছ দেঁ—আমি গায়ত্রী জপ করে বল্লুম, আয় মাছ নিয়ে যা, তখন বলে পৈতে ফেঁলে দেঁ—দেঁ না—

লালমোহন সভয়ে কহিল, পেত্নি?

—হ্যাঁ, ওর সঙ্গে কথা হ'য়েছে, বিধবা আত্মহত্যা করে মরেছিল—এখানে এসে ঠাঁই নিয়েছে, মাঝে মাঝেই আসে আমার সঙ্গে গল্প করে—ওতে ভয়ের কিছু নেই—

ভরত কহিল, বল কি ঠাকুর, পেত্নির সঙ্গে গল্প কর?

—তাতে কি? গলায় পৈতে থাক্‌তে আর ইষ্টমন্ত্র জপতে ভয় কি? ডাক্‌লেই আসে—

মতি ঠাকুর অবিশ্বাসের সঙ্গে কহিলেন, এই আর কি? তোমার পরিবার কিনা, যে তোমার কাছে আসে গল্প ক'রতে—

—বিশ্বাস ক'রলেন না খুড়ো মশায়—

—না, প্রেতযোনি যারা পায় তারা নরলোকে আসে না।

আদাড়ী বলিল, পায়ের ধূলো দেন খুড়ো, আপনাকে দেখাচ্ছি ও আসে আবার যায়। তোমরা সব দাঁড়াও, মশাল নিভিয়ে দাও—দেখবে আদাড়ী মিথ্যে বলে না—

সকলে মশাল নিভাইয়া উঠানে দাঁড়াইয়া রহিল। আদাড়ী ঘরে গিয়া একটা বাঁশের বাঁশী আনিয়া বাউল সুরে কি যেন একটা গান বাজাইতে আরম্ভ করিল। একটু বাদে সে কহিল, মাঠের দিকে নজর রাখবেন খুড়ো, তোমরা দেখো—

আদাড়ী বাঁশী বাজাইতেছে—দূরের বনান্তের প্রান্তে তাহার সুর আছাড় খাইয়া শূন্যে বিলীন হইয়া যাইতেছে। অদূরের মাঠ পাণ্ডুর নিষ্প্রভ জ্যোৎস্নায় স্বল্পালোকিত, বাঁশীর একটা উদাস করুণ সুর পিছনের বন ও প্রান্তরকে মোহময় করিয়া তুলিয়াছে। অগ্রহায়ণের সন্ধ্যায় স্বল্প কুয়াশা মাঠের উপরে শুভ্র উত্তরীয়ের মত বিছাইয়া রহিয়াছে—

সকলে সবিস্ময়ে দেখিল—একটি ছায়া নারীমূর্ত্তি ধীরে ধীরে মাঠে আসিয়া নামিল, ধীর মন্থরপদক্ষেপে এইদিকেই আসিতেছে, তন্বী, চঞ্চলচরণা একটি বিধবার মতই তাহার বেশ—ধীরে নিঃশব্দে মাঠ অতিক্রম করিয়া সে আসিল, পিছনের জঙ্গলের নিকটে—

সকলেই দেখিতেছিল—কেহই এতক্ষণ কথা বলে নাই, আদাড়ী বাঁশী থামাইয়া কহিল, দেখ্‌ছেন খুড়ো—

—হ্যাঁ—

আদাড়ী পুনরায় আর একটা গানের কলি বাজাইল, সঙ্গে সঙ্গে

নারীমূর্ত্তি পিছন ফিরিয়া আবার দ্রুত চলিয়া গেল, দেখিতে দেখিতে বনের কোলে মিলিয়া গেল—

চারিদিক নিস্তব্ধ, উঠানে লোকগুলি ছায়ামূর্ত্তির মত দাঁড়াইয়া আছে, বিস্ময়ে ভয়ে কেহ নড়ে নাই, কথাটি পর্য্যন্ত বলে নাই—সেই গভীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া আদাড়ী হঠাৎ অট্টহাস্যে হো হো করিয়া উঠিল—সে কহিল, খুড়ো আরও আছে, পরীসাধন, কালীসাধন, আদাড়ী পাগল নয়। আর লেলো, আমার ঘর তোকে সাম্‌লাতে হবে না, বুঝলি ?

লালমোহন কহিল, আমি ত কিছু জানি না, ঠাকুরদাদা—ভরত ডাক্‌লে তাই এলুম—

—হ্যাঁরে—হ্যাঁ, আমি সবই জানি, সবই বুঝিরে লেলো, তবে বেশী বাড়াবাড়ি করলে সরষে বাণ ঝেড়ে দেব, দেখবি ঠেলাটা—

লালমোহন মুখ ফিরাইয়া কহিল, আমি কিছু জানিনে খুড়ো—

—সময় হ'লে জান্‌বি, আজ তার কি ?

এতক্ষণ বাদে মতি ঠাকুর কহিলেন, সব থাক্‌তে লেলোকে ধরলি কেন আদাড়ী—ও ত ডাকেনি, ডেকেছে ত ভরত—

আদাড়ী আবার হাসিয়া উঠিয়া কহিল, হ্যাঁ খুড়ো, হ্যাঁ—

ধীরে ধীরে সকলেই চলিয়া আসিল। মতি ঠাকুর শেষ পর্য্যন্ত দাঁড়াইয়া থাকিয়া কহিলেন, কিরে আদাড়ী, এ সব কি ?

—একা থাকি, একটু সাধন ভজন করি। তান্ত্রিক মতে একটু ভগবানকে ডাকা। উনুনটা জ্বালতে হবে খুড়ো, যা হয় দুটো—

—হ্যাঁ—রান্না কর—

মতি ঠাকুর চলিয়া আসিলেন—

*

[ম]তি ঠাকুর বাড়ীতে আসিয়া দেখেন—ভগবতী চাটুয্যের বিধবা ভগিনী পাড়ার কয়েকজন বধূ ও গৃহিণী সমবেত হইয়াছেন রামায়ণ

শুনিবার জন্যে। তিনি কহিলেন, ‘বসো সকলে, ব’সো আমি বৈকালীটা দিয়ে আসি। পথে আস্‌তে আবার আদাড়ীর ওখানে এক কীর্ত্তি, তাই দেরী হয়ে গেল।

মতি ঠাকুর ঠাকুর-বৈকালী দিয়া আসিয়া রামায়ণ খুলিয়া বসিলেন। ভগবতী চাটুয্যের বিধবা বোন বিন্দু প্রশ্ন করিল, আদাড়ীর ওখানে কি কাণ্ড হ’ল ঠাকুর মশায়—

মতি ঠাকুর চাটুয্যেদের কুলপুরোহিত, তাহাকে সকলেই প্রায় ঠাকুর মশায় বলিয়া ডাকে। চাটুয্যেরাই জমিদার, তাহাদের পুরোহিত সকলেরই সম্মানার্হ। একটি কিশোরী বধূ ঠাকুর মহাশয়কে প্রণাম করিল, তিনি প্রশ্ন করিলেন, এ কে?

—শশধরের বৌ।—শশধর ভগবতী চাটুয্যের বড় ছেলে।

—বেশ বেশ, ব’সো মা।

আদাড়ীর ওখানকার ঘটনা প্রাথমিক ভাবে আলোচনা হইল। মহিলারা কেহ ভয়ে, কেহ বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। কেবল বিন্দু কহিল, আদাড়ী এত জানে?

কথাটা মেয়ে মহলে প্রচারিত হইল। তৎপরে কিছু পল্লবিত হইয়া গ্রামেও প্রচারিত হইল এবং এই সামান্য ঘটনাটা আদাড়ীকে অন্ততঃ এই গোপালপুরে বেশ খ্যাতনামা করিয়া দিল।

অতঃপর মতি ঠাকুর রামায়ণ পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন। সংস্কৃত রামায়ণ পাঠ করিয়া তিনি ব্যাখ্যা করেন, কৃত্তিবাসী রামায়ণ তিনি পছন্দ করেন না, তাহার মতে উহা প্রক্ষেপ-দুষ্ট।

মতি ঠাকুর মশায় বলিতে আরম্ভ করিলেন—

প্রজানুরঞ্জনের জন্য রামচন্দ্র জানকীকে বনে বিসর্জ্জন দিতে সঙ্কল্প ক’রেছেন। এই বিপদে কে তার সহায় হবে—ভ্রাতৃবৎসল লক্ষ্মণ ছাড়া এ দুঃসহ কাজ কে করবে? তিনি লক্ষ্মণকে এই গুরু কর্ত্তব্য ন্যস্ত করলেন।

রথ সজ্জিত হল। জানকী কিছুই জানেন না, দেবর লক্ষ্মণের সঙ্গে তিনি রথে উঠ্‌লেন—রথ এসে সরযূ তীরে দাঁড়াল! লক্ষ্মণ কেমন করে জানাবেন যে রামচন্দ্র জানকীকে এই গর্ভবতী অবস্থায় বনবাস দিচ্ছেন। লক্ষ্মণ কিছু ব'ল্‌তে না পেরে মাথা নীচু করে আছেন, তার চোখ দিয়ে জলের ধারা গড়িয়ে পড়ছে। সীতা ব'ললেন, কি লক্ষ্মণ? তোমার মনোবেদনার হেতু কি? লক্ষ্মণ বহুকষ্টে ব'ললেন, আমি অযোধ্যার রাজলক্ষ্মীকে বনবাসে দিতে এসেছি, আমি নরাধম মহাপাতক। রামচন্দ্রের আজ্ঞা আপনাকে বনে বিসর্জ্জন দিতে হবে—

সীতা হঠাৎ নির্ব্বাসন আজ্ঞা পেয়ে একটু যেন স্তম্ভিত হ'য়ে গেলেন, পরক্ষণেই স্মিতহাস্যে তিনি লক্ষ্মণকে বল্‌লেন, এ ত দুঃখের নয়, এ ত পরম আনন্দের বিষয় লক্ষ্মণ, স্বামীর ইচ্ছাই আমার ইচ্ছা, তাঁর ইচ্ছা পূরণ করতে আমি সক্ষম হ'য়েছি, বনবাসের মাঝে আমি যে তার বাসনাকে পূর্ণ করতে পারবো এ ত আমার পরম আনন্দ, জীবনের তৃপ্তি—তুমি কেঁদো না লক্ষ্মণ, এই ত আমার চরম আনন্দ—

মতি ঠাকুর ভাবাবেশে বলিতে লাগিলেন—এই ত দেবী সীতা, তার পতিভক্তি, তার প্রেম এত গভীর এত সুন্দর যে তাঁর নিজের সত্বা নাই, স্বামীর ইচ্ছার সঙ্গে তা একীভূত হ'য়ে গেছে, আপনার সুখ দুঃখ ব'ল্‌তে আর কিছুই নেই—এই আত্মসমর্পণই সীতাকে দেবী ক'রে রেখেছে—মা যেমন সন্তানকে মুখের অন্ন খাইয়ে আনন্দ পান, তেমনি সীতা তার জীবনের শত দুঃখের মাঝে পরিতৃপ্তি পান রামচন্দ্রের ইচ্ছা পূরণে—এই ত হিন্দু বধূর আদর্শ। নিজের সর্ব্বস্ব ত্যাগ করে অন্যকে সুখী করাই ধর্ম্ম—

কে যেন ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল—সীতার এই চরম দুঃখকে আপনার ভাবিয়া। মতি ঠাকুর চাহিয়া দেখিলেন—শশধরের কিশোরী

বধূ—তিনি আনন্দে বলিয়া উঠিলেন—পরের জন্যে কাঁদতে শেখাই ধর্ম্ম মা, সব শিক্ষার গোড়ার শিক্ষাই এই।

কিশোরী বধূ বনলতা আপনার মূঢ়তায় যেন একটু লজ্জিত হইয়াছে এমনি ভাবে সলজ্জ হাতে ঘোমটা টানিয়া দিল। মতি ঠাকুর উচ্ছ্বসিত হইয়া কহিলেন, এই ত চাই মা। তুমি ভবিষ্যতের জমিদার গৃহিণী, তুমি সকলকে পালন করবে তোমার চোখে যেন জল ঝরে পরের দুঃখে —তবেই তুমি গিন্নী—মতি ঠাকুর মহাশয় রামায়ণ বন্ধ করিলেন। প্রদীপের আশে পাশে সিধাগুলি ছিল—বিন্দু তাই কহিল, বউঠাকুরুণ সিধে নিয়ে বাসন ছেড়ে দাও ভাই—

মতি ঠাকুরের স্ত্রী একটা পাত্রে সিধাগুলি ঢালিলেন, এবং পয়সা কটা আঁচলে বাঁধিলেন। সকলে প্রণাম করিয়া যাইতে উদ্যত হইল। বিন্দু কহিল, কাল চণ্ডীমণ্ডপে ভাগবত পাঠ করবেন ত?

—যেমন তোমাদের ইচ্ছা, ভগবানের একটু নাম, করলেই হল। এস মা বনলতা, বড় খুশী হলুম তোমার প্রাণের মায়া দেখে। মানুষের হৃদয়ের এই বৃত্তির প্রকাশই ত সভ্যতা মা—এসো বেঁচে থাকো, ধনে পুত্রে লক্ষ্মী-লাভ করো। সকলে চলিয়া গেল—

*

অন্ধকার রাত্রি হইলে এতক্ষণ গ্রাম নিঝুম হইয়া যাইত; কিন্তু জোছনায় এখনও লোকে উঠানে বসিয়া গল্প করিতেছে। ওদিকে বাউড়ী-পাড়ায় মাদলের শব্দ হইতেছে, গৃহে-প্রস্তুত হাড়িয়া পান করিয়া সেখানে নারী পুরুষের নৃত্য চলিতেছে; সেই সঙ্গে সমবেত কণ্ঠের গান অদূরের প্রান্তরে ভাসিয়া আসিতেছে।

সেই পাড়ারই শেষ প্রান্তে বাগদীদের বাড়ী। ভরত মহুয়ার মদ পান করিয়া উঠানে বসিয়া বাবুই-দড়ি পাকাইতেছিল। জোছনা রাত্রের

আলোকটুকুকে সে কাজে লাগাইতেছে—মনটা তাহার বিষণ্ণ, গত বছর ফাল্গুন মাসে মড়কে তাহার স্ত্রী বিয়োগ হইয়াছে, ঘরে পাঁচ বছরের একটি শিশু পুত্র রাখিয়া গিয়াছে—সে গৃহে ঘুমাইতেছে। ভরত বহু দুঃখে পান্তাভাত খাইয়া চাষের কাজ চালায়, মনিষ খরচ হয় অনেক ধান রোপনে। নটবরের মেয়ে আহুরীর বিবাহ হইয়াছিল ভিন গাঁয়ে, কিন্তু তাহার 'ছাড়' হইয়া গিয়াছে গত আষাঢ় মাসে। সে তাহাকে কত বুঝাইয়াছে সাঙ্গা করিতে, কিন্তু আহুরী কিছুতেই রাজী হয় নাই। আহুরীর বয়স এই আঠার, তন্বী সুঠাম সুন্দর তাহার দেহ; তাহার দিকে চাহিলেই ভরতের অন্তর হইতে যেন সুধা ক্ষরিত হয়; কিন্তু আহুরী কেন যেন সে কথায় কান দেয় না।

বনের প্রান্তে চণ্ডীতলার বটগাছের তলায় সন্ধ্যার অন্ধকারে দাঁড়াইয়া সেদিন আহুরী আদাড়ী ঠাকুরের সঙ্গে কি যেন বলিতেছিল—সে সচক্ষে দেখিয়াছে আদাড়ী ঠাকুর হাত ধরিয়া কি যেন বলিতেছে। আদাড়ী ঠাকুর যে গান রচনা করিয়া গায়—ধান্য রোপন সময়ে আহুরী ঠিক সেই গানই করে কেন। আদাড়ী ঠাকুরের বাড়ী যাইয়া ঘর-নেকানো, দেয়াল-নেকানো সবই করিয়া আসে, অথচ তাহাকে সে একদিনের জন্যেও 'কামিন' দিল না—ভাবিতে ভাবিতে তাহার সন্দেহ হয়। আজ সন্ধ্যার ব্যাপারটা কি রকম হইয়া গেল, কাল হয়ত চাটুয্যেপাড়ার কাছারীতে ডাক পড়িবে—সে কি বলিবে?

ভাবিতে ভাবিতে ভয়ে শঙ্কায়, তাহার অন্তর ম্রিয়মান হইয়া গিয়াছিল, তাহার উপরে দ্রব্যগুণ তাহার দুঃখ-বেদনাকে দ্বিগুণ করিয়া দিল—আহুরীর জন্যে শূন্য অন্তরটা খাঁ খাঁ করিতেছে। গৃহে নিদ্রিত শিশু তাহাকে ফেলিয়া কোথায় যাইবে!

বাবুই-দড়িতে কোথায় যেন একটা প্যাঁচ পড়িয়া গিয়াছে, সে নীচু হইয়া সেটা খুলিতে চেষ্টা করিতেছিল, হঠাৎ লাঠি ও বল্লম

লইয়া—কালী, রাঘব, নীলমণি, লালমোহন আরও জনকয়েক আসিয়া উপস্থিত—

নীলমণি কহিল, চল্ ভরত, বনের মাঝে একটা গাড়ী ঢুকলে রে এই রাতে, সঙ্গে আবার লেঠেল নিয়ে চলেছে, চল ত দেখে আসি কেমন জোয়ান—

ভরত প্রশ্ন করিল—কে যায় ?

—তা কে জান্‌ছে, চল্ চণ্ডীতলার মাঠ রাতে পেরুতে সাহস করে সে কে দেখে আসি—

—চল্—

সকলে বাহির হইয়া পড়িল। কেন কি জন্য যাইতেছে এ সব তাহাদের জিজ্ঞাসা করা প্রয়োজন হয় না। রাত্রের অন্ধকারে এই প্রবৃত্তি তাহাদের জন্মগত। কি পাওয়া যাইবে, কি লাভ, কি ক্ষতি—তাহারা তাহা জানে না। চণ্ডীতলার মাঠে ঠেঙ্গাড়ের প্রাদুর্ভাবে কেহ রাত্রে চলাচল করে না, এইটি এতদ্দেশের প্রবাদ, বাপ পিতামহের আমল হইতে এই খ্যাতি চলিয়া আসিতেছে, আজ তাহার সত্যতা রক্ষা করা তাহাদের প্রয়োজন। যে দুর্জ্জয় অভিমানে মানুষ গৌরীশৃঙ্গের তুষারশুভ্র কিরীটি জয় করিতে চায়, সেই দুর্জ্জয় মদের মোহেই তাহারা চলিয়াছে—পাণ্ডুর ঊষর মাঠ অতিক্রম করিয়া বনের উদ্দেশ্যে।

নিঃশব্দ দ্রুত চরণে তাহারা দুই ক্রোশ রাস্তা অতিক্রম করিয়া বনের নিকটে আসিয়া পড়িল। মাঠের পরে উঁচু ডাঙ্গা। ডাঙ্গার উপরে কচি শাল, মহুয়া, পলাশ বন—ফাল্গুনের শেষে বনটা পলাশের আগুনে লাল হইয়া যায়, তাই লোকে বলে হিঙ্গুলবন। বনের মাঝ দিয়া গিয়াছে রাস্তা—দুইখানি গাড়ী চলিয়াছে নিঃশব্দে, আগে পিছনে লাঠি বর্শাধারী জনদশেক লোক। আর রশি দুই তিন আগে একজন এবং অমনি পিছনে আর একজন—ইহারা আছে সম্মুখে ও পিছনের বিপদ জ্ঞাপনের জন্য।

আর কিছুক্ষণ গেলেই তাহারা বনের প্রস্থ বরাবর রাস্তাটা পার হইয়া পুনরায় পলাশডাঙ্গার মাঠে পড়িবে?

কালী কহিল, পেছনের লোকটাকে ধর, কে যায় দেখি—

—হ্যাঁ, তাই ভাল—

কয়েকজন লোক এদিক ওদিক ঘুরিয়া গাছের আড়াল দিয়া একটি গাছের নিকটে অন্ধকারে আসিয়া দাঁড়াইল। এমন ইহাদের চলিবার প্রণালী যে ইহারা বাঘের মত শুষ্ক পাতার উপর দিয়াও নিঃশব্দ চরণে দ্রুত যাইতে পারে। গাড়ী দুইখানি চলিয়া গিয়াছে, পিছনের লোকটি যাইতেছে একাকী, মনে হয় কিছু পান করিয়াছে, পায়ের চালনা যেন সুসংবদ্ধ নয়।

আকস্মিক ভাবে তাহারা একসঙ্গে লোকটির উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া মুখ চাপিয়া ধরিল—কালী বাগ্দী বুকের উপুর চাপিয়া বসিয়া বলিল, বল শালা কে যাচ্ছে বটে?

লোকটি কথা বলে না—কালী তাহার নাকের উপর পায়ের গোড়ালি দিয়া দুইবার আঘাত করিয়া কহিল, বল শালা বল, তোর কোন বাবা যাচ্ছে—

লোকটি নাসা-নিঃসৃত রক্তটাকে মুছিতে চেষ্টা করিল কিন্তু হাত ধরা—সে কহিল, আলমপুরের নীল সাহেব।

—কোথায় যায়?

—পালিয়ে যাচ্ছে—সেপাইরা লড়াই করছে তাই—

নীলমণি কহিল, ঐ শালাই ত বাগ্দী মেয়েদের ধরে নিয়ে যেত। আলমপুরের বাউরীদের ঘরে সাদা ফুট্‌ফুটে ছেলে-মেয়ে হ'য়েছে—বাঁধ শালারে, নেমকহারাম তোরাই ত স্বজাত মেয়েদের ধরে নিয়ে যেতিস্—

—না, না, আমি নয়, আমি সঙ্গে এসেছি, সাহেব যাওয়া করবেন তাই—

মুখের মাঝে লোকটার বস্ত্রের এক অংশ ভাল করিয়া পুরিয়া দিয়া তাহারা তাহাকে গাছের সঙ্গে বাঁধিয়া ফেলিল। আবার নিঃশব্দ চরণে তাহারা আগাইল।

গাড়ীর নিকটবর্ত্তী হইয়া তাহারা ক্ষণেকের জন্য দাঁড়াইল। তাহাদের হাতে সূক্ষ্মাগ্র দুই হাত পরিমাণ কয়েকখানা লাঠি ছিল। লক্ষ্য ঠিক করিয়া সেগুলিকে হঠাৎ তাহারা ছুঁড়িয়া দিল এবং পাহারার সর্দ্দার কয়েকজন মুহূর্ত্তে 'বাবারে' বলিয়া ধরাশায়ী হইয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে বিপুল আনন্দে তাহারা আক্রমণ করিল সকলকে। সাহেব বন্দুকের আওয়াজ করিলেন, কিন্তু অন্ধকারে কোথায় কোন দিকে শত্রু তাহা বোঝা গেল না।—গরু-যুগল ভয় পাইয়া দিশাহারা হইয়া বনের মাঝে গাড়ী সমেত দৌড় দিল; প্রথম গাড়ীখানা একটা বড় গাছে ধাক্কা খাইয়া থামিয়া গেল, গরু দুইটি জোয়াল ছিঁড়িয়া আর্ত্তনাদ করিতে করিতে চলিয়া গেল, দ্বিতীয় গাড়ীখানা ভিন্ন পথে দৌড় দিল এবং একখানা চাকা বড় একখানা পাথরে বাধিয়া গেলে সমস্ত গাড়ীখানা উল্টাইয়া গেল। সাহেব ও মেমসাহেব ছিটকাইয়া অদূরে ঝোপের উপরে যাইয়া পড়িলেন। সাহেবের হাতের আয়ুধ কোথায় যেন ছিটকাইয়া পড়িয়াছে।

কালী কহিল, মেমসাহেব নিয়ে চল—পলাশতলা—দেখিতে দেখিতে ভরত ও কয়েকজন মেমসাহেবের আহত দেহ স্কন্ধে করিয়া ছুটিল—কালী আর নীলমণি সাহেবের দেহটাকে লইয়া ছুটিল প্রান্তরের দিকে।

নীলমণি ও কালী ডাক-সাইটে জোয়ান, স্থূলোদর সাহেবকে স্কন্ধে করিয়া তাহারা নক্ষত্র বেগে ছুটিয়া আসিয়া মাঠের মাঝে বোঝাটাকে ধপাশ করিয়া ফেলিল এবং বিন্দুমাত্র দেরী না করিয়া তাহার সর্ব্বদেহ তল্লাস করিয়া যাহা পাইল—লইয়া প্রস্থান করিল অন্য দিকে—তাহারা

জানিত ভরতরা মেমসাহেবকে লইয়া গিয়াছে চণ্ডীতলার মাঠের দিকে—পলাশতলায়—

সাহেবের পকেটে ছিল কিছু টাকা, সেটাকে ট্যাঁকে করিয়া তাহারা ছুটিল—

মাঠের অন্য দিকে ভরতরা তখনও ছুটিয়াছে। কালী পিছন হইতে কহিল, ফেলে দে, ফেলে দে—

সকলে মেমসায়েবকে নামাইল—কালী কহিল, বাগ্দী মেয়েদের বে-ইজ্জত করবেক না? শালীকে ল্যাংটো করে ছেড়ে দে—

দেখিতে দেখিতে মেমসাহেবের দেহের মূল্যবান সমস্ত পোষাক ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল—এবং তাহার মাঝে কোথায় যেন কি একটা ছিঁড়িয়া ঝন্ ঝন্ করিয়া কতকগুলি টাকা পড়িয়া গেল—জোছনার আলোকে রূপা চিক্ চিক্ করিয়া উঠিল—যে যাহা পারে তাহাই কুড়াইয়া লইল হরির লুটের বাতাসার মত—

একমিনিটের মধ্যে ঘটিয়া গেল বিরাট একটা রাহাজানি। একখানা খণ্ড শুভ্র মেঘ আসিয়া ঢাকিয়া দিল চাঁদের আলো—মাঠের মাঝে অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল—মেঘের অবগুণ্ঠনের মাঝে চণ্ডীতলার বিখ্যাত প্রান্তর, ডাঙ্গার হিঙ্গুলবন অন্ধকারের কালো কুহেলীর মাঝে বিলীন হইয়া গেল—যেমন করিয়া গিয়াছে অতীতের অন্ধকারে কত শত অত্যাচার অনাচার সুখ দুঃখের অজ্ঞাত কাহিনী, নীলকরের অত্যাচার—দেশীয় চাষীর সংগ্রাম। কাল-প্রবাহের অতল তলে রহিয়াছে—অজ্ঞাত অখ্যাত জীর্ণতরীর পচনশীল কাষ্ঠখণ্ড। মেঘাবৃত আকাশের অস্বচ্ছ আলো-অন্ধকারের মাঝে তেমনি করিয়া রহিয়া গিয়াছে মানুষের আদিম প্রবৃত্তির উত্তেজনা ও সংগ্রাম, প্রতিহিংসা ও প্রায়শ্চিত্ত—ঐ চণ্ডীতলার মাঠে পলাশতলায়—

*

যেমন নিঃশব্দে গিয়াছিল তেমনি নিঃশব্দে তাহারা ফিরিয়া আসিল গ্রামে। গ্রামের পিছনের দিকে আদাড়ী ঠাকুরের বাড়ীর পিছনের দিকে মাঠের মাঝে আসিয়া তাহারা বাহির করিল, তাহাদের লুণ্ঠিত সামগ্রী, ভাগ হইল—রক্ষিত থাকিল জমিদারের কর—অথবা অংশ। তাহারা মাঠ পার হইয়া ঘরের দিকে রওনা দিল।

ভরত মাঝে মাঝে মাঠের পানে চাহিয়া দেখিতেছিল—সে হঠাৎ কহিল, কালী, দাদা ঐ যে, ঐ দেখ—সকলে ফিরিয়া দেখিল আজ সন্ধ্যার মত একটি শ্বেতাম্বরা বিধবা মূর্ত্তি মাঠের মাঝখান দিয়া বনের দিকে যাইতেছে—কালু, রাঘব সকলেই দেখিল, ঠিক তেমনি চঞ্চলচরণা তন্বী ক্ষীণ একটি মূর্ত্তি—

সকলেই নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া দেখিল। হঠাৎ ভরত কহিল, চল ত ধরা করি—চল দাদা—

—চল্—

উত্তেজনা দেখা দিল এবং সকলেই একসঙ্গে মূর্ত্তির উদ্দেশ্যে ছুটিল—বিপুল তাহাদের বেগ—অসমতল মাঠ, আইল পার হইয়া তাহারা ছুটিল, নারীমূর্ত্তিও দ্রুত—অতি দ্রুত চলিতেছে—কিন্তু নিকটে ক্রমশঃই নিকটে নারীমূর্ত্তি, যেন তাহাদের সঙ্গে ছুটিয়া পরাস্ত হইবে কিন্তু সহসা বনের নিকটে যাইয়া কোথায় যেন কেমন করিয়া সে অদৃশ্য হইয়া গেল—

ভরত কহিল, এস, বন্ খুঁড়ি—দাদা—

নীলমণি হাসিয়া কহিল, না রে না, ধরা যাবেক নাই—ও ত মনিষ না রে—তোরা লারবি।

সম্ভবতঃ পেত্নী! সকলেই ফিরিয়া আসিল। অশরীরী একটা মূর্ত্তির পিছনে ঘুরিয়া লাভ কি?

ভরত বাড়ীতে আসিয়া দেখিল—ছেলেটা ঘুমাইতেছে, ওঠে নাই।

ওদিকে আদাড়ী ঠাকুরের বাঁশের বাঁশী তখনও করুণ স্বরে বাজিতেছে, বাউরী পাড়ার মৃদঙ্গ মাঝে মাঝে বেতালে বাজিতেছে, ক্লান্ত-চরণা নারীগণ হয়ত বিবশা হইয়া বিশ্রাম করিতেছে—

আকাশে পাণ্ডুর চাঁদ অস্তমিতপ্রায়—গোপালপুর গ্রামের কোলে সকলে নিদ্রাগত। জাগিয়া আছে কেবল ভরত আহুরীর প্রত্যাখ্যান বুকে করিয়া, আর আদাড়ী ঠাকুর বাঁশী বাজাইতেছে পরীসাধনের অঙ্গরূপে—

*

পরের দিন সূর্য্য উদিত হইল, যথাসময়ে—পৃথিবীর আবর্ত্তনের পরে। গত রাত্রির কোনও স্মৃতি নাই কোথায়ও, বনের পথ দিয়া যে পথিক আসিল, সে জানিল না পলাশতলার ইতিহাস, নীলকর সাহেবের দুর্ভাগ্য—রাত্রির অন্ধকারে তাহারা চলিয়া গিয়াছে কোথায়—

মতিঠাকুর প্রত্যুষে উঠিয়া ফুলের সাজি হাতে ফুল চয়ন করিতে বাহির হইয়াছিলেন—গৃহে তাহার শালগ্রাম শিলা, শিবলিঙ্গ ও নাড়ু গোপালের পিত্তল মূর্ত্তি, পুরুষানুক্রমে তাঁহারা সেবা করিয়া আসিতেছেন। সারদা মল্লিকের বাড়ীর সামনে পাটকিলে রংএর জবা গাছ, ঠাকুর ফুল তুলিতেছিলেন। সারদা জিজ্ঞাসা করিল, কি মতিদা, আদাড়ী তোমাকে নাকি পেঁত্রী দেখালে ?

—হ্যাঁ গো, সত্যিই দেখলুম, এলো আবার গেল, কি দেখলাম নারায়ণ জানেন—

ভগবতী চাটুয্যে গ্রামের জমিদার, ফতুয়া গায়ে, চটি পায়ে একখানা লাঠি হাতে গ্রাম প্রদক্ষিণ করিতে বাহির হইয়াছিলেন, তিনিও দাঁড়াইয়া বলিলেন, প্রণাম ঠাকুরমশায়—আদাড়ীর ব্যাপারটা সত্যি ?

—হ্যাঁ, দেখলুম ত।

—তা হলে, ও নিশ্চয়ই একা একা প্রেত সাধনা করে, তাই বে থা করলে না—হলও না, কি বলেন ?

—নারায়ণ জানেন।

—একদিন দেখতে হবে ব্যাপার কি! আদাড়ীকে ডাকিয়ে এনে শুন্‌বো সব দেখি—ভগবতী চলিয়া গেলেন।

গ্রামের সেদিনকার আলোচ্য বিষয় হইল আদাড়ী ঠাকুর। ঘাটে-মাঠে, গৃহে সর্ব্বত্র সকলে কৌতূহলী হইয়া উঠিল ব্যাপারটা কি ? আদাড়ী এতদিন গ্রামের প্রান্তে একাকী অখ্যাত জীবন যাপন করিত, কাল সন্ধ্যার ঘটনা হইতে সে আকস্মিক খ্যাতি পাইয়াছে—

মতি ঠাকুর মশায় ফুল তুলিতে তুলিতে বলিলেন, সারদা একটা মেয়ে দেখে দাওনা—গোপালের বয়স ত এই আঠারো পেরিয়ে গেল—

—বল কি দাদা, গোপালের বয়স আঠার হ'ল, সেদিনের ছেলে—

ঐ রকমই হয়। খুড়ো মশায় মৃত্যুশয্যায় আমার হাতে দিয়ে গেছেন ওকে। আমার কর্ত্তব্যে যেন ত্রুটি না থাকে। তা সে লেখা-পড়া কিছু শিখেছে ত, আমারই টোলে—

—গোপাল ত ভাল ছেলেই বটে, তা আমার শালীর এক মেয়ে আছে, তার বয়সও ত এই নয় হ'ল। তোমরা ত ভরদ্বাজ—তা গোত্রে বাধবে না, দেখি—

—হাঁ ছাখো, এই মাঘেই তা হ'লে সাতপাক ঘুরিয়ে দিতাম—

—হ্যাঁ হ্যাঁ, পাকা ফলার একটি ত হবেই—

ভগবতী বাহির হইয়াছিলেন গ্রাম প্রদক্ষিণ করিতে, এটি তাহার নিত্য-নৈমিত্তিক কার্য্য। সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে লাঠি হাতে বাহির হইয়া সমগ্র গ্রামখানি ঘুরিয়া আসিয়া তবে কাছারীতে বসেন, তাহার পর আহ্নিক করিয়া বিশ্রাম করেন।

গ্রামের প্রান্তে দীঘির উত্তর তীরের বটগাছের তলায় বসিয়া কালী

শণের দড়ি পাকাইতেছিল, সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া জোড় হস্তে নতশিরে প্রণাম জানাইল। ভগবতী বলিলেন, কি মামা—খবর সব ভাল, বাড়ীর সকলে ভাল ত?

—হ্যাঁ হুজুর, আপনার ধূলির কৃপায় ভালই আছেন। তা কোন দিকে—

—তোদের পাড়াটা দেখে আসি—

ভগবতী চলিলেন—কুর্মী পাড়ায় বধূগণ পূর্ণকুম্ভ কক্ষে গৃহে যাইতেছিল, তাহারা পথিপার্শ্বে দাঁড়াইয়া গেল। কে একটা বালক গরু মাঠে লইয়া যাইতে যাইতে গান করিতেছিল, তাহাকে দেখিয়া চুপ করিয়া গেল। এই সমীহ ও শ্রদ্ধা নিত্যকার ব্যাপার, এমনি ছিল তখন রীতি।

ভগবতী আরও কিছুদূর গেলেন, বাগ্দী পাড়ায় ঢুকিবার মুখেই দেখেন—পাশের বাড়ী হইতে একটি ছেলে চীৎকার করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ছুটিয়াছে এবং পিছন পিছন তাহাকে তাড়া করিয়া পাচনী হাতে ছুটিতেছে ভরত। ছেলেটি তাহার পাশ দিয়া ভোঁ করিয়া চলিয়া গেল এবং ভরত একেবারে সাম্‌নে আসিয়া পড়িতেই ভগবতী তাহার পিঠে নিজের লাঠি বসাইয়া দিয়া সম্বোধন করিলেন, হারামজাদা।

ভরত পিঠে একটু হাত বুলাইয়া করজোড়ে প্রণাম করিল।

ভগবতী ক্রুদ্ধ স্বরে বলিলেন, হারামজাদা ঐ লাঠি দিয়ে মারলে অতটুকু ছেলে কি বাঁচে—কেন মারছিস্—

—হুজুর উপায় নেই, একা মানুষ পেরে উঠিনে, তাতে ছেলেটাও হ'য়েছেন একেবারে বেহদ্দ বজ্জাত—

—তা হোক, ছেলেপুলে তাই বলে মারবি? চল দিকি কি হ'য়েছে শুনি—চল ত—

ভরত তাহাকে সঙ্গে করিয়া ঘরের দাওয়ায় মোড়া পাতিয়া বসিতে দিল। ভগবতী বসিয়া কহিলেন, কি হ'য়েছে, বল্—

BAN PUR

ভরত কহিল, পরিবার ত গত সন মড়কে মরলেক। ঘরে ত কামিন নেই। বেটাকে বল্লুম, উনুনে জ্বাল দিতে তা শূয়োর ডাণ্ডাগুলি খেল্‌তে লেগেছেন। আমি ত খেয়ে ধান কাট্‌তে যাবো হুজুর—

—ও ছেলে মানুষ, ভাত রাঁধতে পারে? তা একটা সাঙ্গা করে ফেলনা কেন?

—হুজুর, কি বল্‌বো, ঐ আহ্লাদীকে ত দু'মাস ধরে সেধেলো, তা সে ত—

—আহ্লাদী কে?

—নটবরের বেটি—সে কিছুতেই কবুল করেনা হুজুর—

—কেন?

—কে জানছে হুজুর—

—সে না হয়, আর একজনকে সাঙ্গা কর, নইলে আমার ঐ পলাশ-পুরের প্রজাদের বলি, একটা সাঙ্গার মেয়ে দেখে দেবে—এমনি করে ঘর-সংসার চাষ-আবাদ চলে?

—হুজুর, টাকা পয়সা—

—আমি দেব, তা'তে কি, পরে শুধবি। দু'বিঘে বেশী জমি করবি—

—আজ্ঞে হুজুর—ঐ—লটবর—

—ওরে হারামজাদা, আহ্লাদী ছাড়া আর সাঙ্গা করা চল্‌বে না—না? প্রেম করতে লেগেছ—ও সব করলে আর চাষ-আবাদ সংসার চলে না—আহ্লাদী ছাড়া চলে না, পাজি কোথাকার—

ভরত নালিশ করিবার ভঙ্গিতে কহিল, আহ্লাদী ত সাঙ্গা করে না হুজুর—কাউকে না—

—তা'তে তোর কি? সাঙ্গা করুক নাই করুক—প্রেম করছে হারামজাদা, পাজি—দাঁড়া তোকে—

—না, হুজুর—

—কাল কাছারীতে যাবি, পলাশপুরে খোঁজ নিচ্ছি, তার চেয়ে বড় একটা সাঙ্গা জুটিয়ে দিচ্ছি—

ভরত একটু দুঃখিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ভগবতী চলিলেন, কুলু পাড়ায় রাস্তার ধারে রেড়ীর বীজ শুকাইতে দিয়াছে, তাঁতি পাড়ায় কাপড়ের তানা দিতেছে, ঘরে চলিতেছে চরকার ঘরঘর, তাঁতের খটাখট শব্দ। কাপড়ে তানা দিতেছিল নব তাঁতি। ভগবতী কহিলেন, বৌমা এসেছে রে নব, ভাল দু'খানা শাড়ী করে দিবি শিগ্‌গির।

—কবে চাই হুজুর ?

—এই—সপ্তাহ খানেকের মধ্যে, ভাল রঙীন ডুরে—

—আজ্ঞে তা দেব—

—হ্যাঁ, বৌমা এসেছে—

—শশধরদার পরিবার, ভাল কাপড় ত দিতেই হয় হুজুর—

—হ্যাঁ—

গ্রাম প্রদক্ষিণ করিয়া ভগবতী যখন বাড়ী ফিরিলেন—তখন দণ্ড দুয়েক বেলা হইয়াছে। কাছারীতে নালিশ, আবেদন নিবেদন আসিয়া জড়ো হইয়াছে। কাছারীর কোণে একটি যুবতী দাঁড়াইয়া ছিল। তিনি কহিলেন, কি মা, তোমার কি ?

যুবতী তাহার পিঠের কাপড়টা ঈষৎ ব্যক্ত করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। তাহার পিঠের উপর লাঠির কালো কালো দাগ ফুলিয়া উঠিয়াছে—তাহাকে কে যেন নির্দ্দয় ভাবে প্রহার করিয়াছে। ভগবতী কহিলেন, কে মেরেছে এমনি করে ? ইস্—তোমার বাড়ী কোথায় ?

—শ্যামপুরের প্রজা আমরা—যুবতী কহিল।

—তোর মরদে মেরেছে—

—হ্যাঁ হুজুর।

8.7.

—তা ছাড় করে নে।

—ছাড় দিচ্চেনা, হুজুর—

—কে সে ?

—ছিদাম—

—তোমরা ?

—বাগ্দী—

ভগবতী তাঁহার দুইজন পাইঁককে কহিলেন, নীলমণি, যেখানে থাকে ধরে নিয়ে এসো শালা ছিদামকে—

যুবতী বসিয়া রহিল—ভগবতী নানারূপ কাজ করিতে লাগিলেন। সরকার গোমস্তা একে একে সব আনিয়া দিতেছিল—হঠাৎ মুখ তুলিয়া কহিলেন,—কে আছিস্ ? —ও কালী, যা ত ভরতকে ডেকে নিয়ে আয়—

কিছুক্ষণের মধ্যেই ভরত আসিল এবং পরক্ষণেই ছিদামকে সঙ্গে করিয়া পাইক নীলমণি বাউরী আসিল। ভগবতী কহিলেন, ছিদাম ওকে মেরেছিস্ কেন ?

—হুজুর, খুনই করিনি সেই ওর বরাৎ।

—কেন ?

—বাবু, কথা শোনেনা—সকালে জঙ্গলে কাঠ আন্‌তে কে বলেছিল শুনুন হুজুর—

যুবতী কহিল, কাঠ নেই, কাঠ কুড়াতে যাবে নাই !

—তোর সঙ্গে নীলে যায় কেনে রে ? বাবু আমার খাবে, আর আসনাই করবে—

ভগবতী একটু যেন বিব্রত হইয়া কহিলেন, ছাড় করে দে—চলে যাক্ যেখানে ইচ্ছে—তা ছাড় দিচ্ছিস্‌নে কেন !

আমায় টাকা দেবে নাই। ছাড় দেবো কেনে ?

[illegible]জ—দাঁড়া

—কত টাকা ?

—পাঁচ টাকা হুজুর—

ভগবতী একটু চিন্তা করিলেন—পরে যুবতীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ছাড় হ'লে কি ক'রবি ? সাঙ্গা করবি ত ?

—চল্‌বেক কেম্‌নে—

—বেশ—এই ভরত এদিকে আয়। ছিদাম ওকে ছাড় দেবে, তুই একমাস বাদে পাঁচ টাকা দিয়ে সাঙ্গা করবি ?

যুবতী বিষণ্ণ মনে কহিল, ভিনগাঁয়ে যাবো না হুজুর—গাঁয়েই সাঙ্গা আছে।

ভগবতী ভরতকে বলিলেন, কিরে ভরত তোর কি !

ভরত লুব্ধ নেত্রে যুবতীর পানে একটু চাহিয়া কহিল, হুজুর যা হুকুম করবেন—

ভগবতী আর বেশীদূর না আগাইয়া হুকুম দিলেন, যা আজ, সামনের বৃহস্পতিবার আস্‌বি, কি হ'ল শুনে তার পর যা হয় বল্‌বো—কেমন ?

সকলে চলিয়া গেল, তিনি বিষয়ান্তরে মনোনিবেশ করিলেন।

*

দ্বিপ্রহরে চণ্ডীমণ্ডপে পাশার আড্ডা বসে—ভগবতী নিজে বিশেষ বসেন না। পাশাড়ুর মধ্যে সারদা মল্লিক না আসিলে খেলা জমে না। ভগবতী চাল বলিয়া দেন—অন্য সকলে খেলে। তাহার মধ্যে সারদা ও পাঁচু মুখুজ্জে প্রধান, তাহারা সত্যিকারের খেলোয়াড়, অন্য যাহারা তাহারা দাঁড়ি মাত্র। সারদার বৈশিষ্ট্য তাহার কথায় সকলে হাসে, পাশার আড়ি মারিলে তিনি উত্তেজিত হইয়া মাঝে মাঝে নাচিয়াও থাকেন।

পাশার আড্ডা জমিয়াছে, তাহাদের পাশে প্রিয়নাথ ও হরিপদ দাবা করিয়া বসিয়াছেন। মাঝে মাঝে উচ্চকণ্ঠে হাস্য পরিহাস চলিতেছে।

সারদা হুঁকা টানিতে টানিতে উঠিয়া বসিয়া হাঁকিলেন, কচে বারো—

ওদিকে হরিপদ হাঁকিলেন, কিস্তি খুড়ো—সামলাও—দাবা গেল, দাবা গেল—

হাস্য পরিহাস ও খেলার উত্তেজনায় আসর সরগরম হইয়া উঠিয়াছে। মতি ঠাকুর বলিলেন, হুঁকো ছাড়ো সারদা, কল্‌কে পুড়ে গন্ধ বেরিয়ে গেছে—

ভগবতী তাহার চাকরের উদ্দেশ্যে কহিলেন, ওরে আর এক কলকে তামাক দে—

বাড়ীর ভিতরে ভগবতীর ভগিনী বিন্দুবাসিনী কাঁথার ধামা লইয়া বসিয়াছেন, রকের কোণে। কাঁথার কোণে একটা কলকা তুলিতেছিলেন, বনলতা বসিয়া বসিয়া দেখিতেছিল। বিন্দু বনলতাকে কহিলেন, দাঁড়াও বৌমা, তোমাকে একটা কাঁথা পেড়ে দেব। ভাল ক'রে সেলাই কর, তোমার শ্বশুর কাঁথা গায় দিতে বড্ড ভালবাসে—

বনলতা কহিল, আপনি কলকা এঁকে দেবেন, তা হ'লে হয়ত পারবো চেষ্টা ক'রলে। ভগবতীর স্ত্রী টাকুতে পৈতার সূতা কাটিতেছিলেন, তিনি কহিলেন, বৌমা কি আর এখনই কাঁথা সেলাই করতে পারে—আগে সেলাই করা শিখুক। বৈশাখ মাসে ত তিনকুড়ি পৈতে লাগ্‌বে, —তুমি টেকো কাটা আরম্ভ কর বৌমা।

বিন্দু কহিলেন, চেষ্টা করলে কি না পারবে?

আদুরী ধান ভানিতেছিল সে কহিল, চাল মেপে নেন গো, গিন্নিমা—

বিন্দুবাসিনী বৌএর দিকে চাহিলেন। শশধরের মা কহিলেন, আমি কেন? বৌমা চাল মেপে নাও, হিসেব কিতেব শিখ্‌তে হবে ত?

বনলতা ঘর হইতে সের আনিয়া মাপিতে লাগিল—কুড়ি সের পুরিলে আহুরী হি হি করিয়া হাসিয়া কহিল, বেশ ক'রলে বৌঠান্। আমার চাল কোথা? দেবে নাই—

বিন্দু কহিলেন, কুড়ি সেরে ও এক সের পাবে, কুড়ি সের তোলো—এক সের ওদিকে দাও—

বনলতা সেইভাবেই চাল মাপিতে লাগিল—কিন্তু পরে মাত্র সাত সের চাল বেশী হইল—সাত সেরে কি পরিমাণ চাউল আহুরী পাইবে তাহা হিসাব করিতে না পারিয়া বনলতা একটু বিপন্ন ভাবে বিন্দুর মুখের পানে চাহিল, বিন্দু কহিল, আন্দাজ ক'রে দাও—

বনলতা আধসের মত চাউল আহুরীকে দিলে, আহুরী একটা ব্রীড়া ভঙ্গী করিয়া হাসিয়া কহিল, তবেই হয়েছে বৌঠান—তোমার সংসারে যখন খাটবো তখন ত উপোস ক'রতে হবে—আর একমুঠি দাও—

বনলতা একটু লজ্জা পাইয়া আর একমুষ্টি চাউল দিয়া দিল। শাশুড়ী কহিলেন, এমনি করে যদি দাও তবে ত গোলায় কুলোবে না, সাত সের চাউলে ত একসেরই দিলে বৌমা—

বনলতা চুপ করিয়া রহিল—এমনি পরিস্থিতিতে কি করিবে বুঝিতে না পারিয়া জড়সড় হইয়া বসিয়া রহিল। শাশুড়ী হাসিয়া কহিলেন, যাক্ গে—হু' মুঠো না দিলে তোমার দোরে ধান ভান্‌তে আস্‌বে কেন?

বিন্দু অর্থব্যঞ্জক দৃষ্টিতে তাকাইলেন এবং বনলতার মুখের দিকে চাহিয়া যেন অনুমান করিতে লাগিলেন, ভবিষ্যতে এই কিশোরী গৃহিণীর কর্ত্তব্য পালন করিতে পারিবে কিনা। আহুরী কহিল, একটা পান দিন না মা—কতকাল যেন পান খাই না—

বনলতা ঘরে পান আনিতে গেল—হঠাৎ চণ্ডীমণ্ডপে সারদা চীৎকার করিয়া উঠিল—চক্ চক্,—দো দুয়ো চক্ পাশার বাজি শেষ হইয়া

আসিয়াছে, এই চকের আড়ির উপরে খেলার জয়-পরাজয় নির্ভর করিতেছে। এই সময়ে সারদা হাঁকিলেন—চক্ চক্—দো দুয়ো—

সঙ্গে সঙ্গে পাশায় চক্ পড়িল এবং বিপক্ষের ঘুটি মারা পড়িয়া সারদা মল্লিকের জয় নিশ্চিত হইয়া গেল। সারদা মুহূর্তে কাপড় খুলিয়া মাথায় বাঁধিয়া ফেলিলেন এবং স্থান কাল বিস্মৃত হইয়া আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে কহিতে লাগিলেন, চক্ চক্, চক্ চকাচক্ চক, হেরে গেলে—মতি পণ্ডিত হেরে গেল দুয়ো দুয়ো—

নৃত্য করিতে করিতে বাইজির ভঙ্গিতে কোমরে হাত দিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে একপাক দিয়া মতি ঠাকুরের সম্মুখে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দোলাইয়া কহিলেন, চক্—চকাচক্ চক্—

চণ্ডীমণ্ডপে একটা হাসির হুল্লোড় পড়িয়া গেল, বিরাট হৈ হৈ—ভগবতী হাসিতে হাসিতে কহিলেন—থামো সারদা, থামো—

সারদা সুরে কহিলেন, থাম্‌বো না গো—নাচবো—চক্ চকাচক্—নাচবো—

মতি ঠাকুর কহিলেন, দোহাই তোমার কাপড়খানা পরে নাচো—

সারদা পুনরায় কহিলেন, পরবো না গো—নাচবো—

চণ্ডীমণ্ডপ হাসি ও চীৎকারে ফাটিয়া পড়িতেছিল কিন্তু বিন্দু ব্যাপারটা কি দেখিবার জন্য জানালা খুলিয়া দৃশ্যটা দেখিয়া আবার ফিরিয়া গেলেন এবং আপন মনেই হাসিতে লাগিলেন—

শশধরের মা বড়বৌ প্রশ্ন করিলেন, কি ঠাকুরঝি? কি?

বিন্দু কহিলেন, কি আবার? বুড়ো মিন্‌সে ন্যাংটো হ'য়ে নাচতে লেগেছে—

—কে? কে?

—সারদা মল্লিক, তা ছাড়া আবার কে?

—নারায়ণ নারায়ণ, বুড়োকালেও ওর স্বভাব গেল না।

চণ্ডীমণ্ডপের হাস্য-কোলাহল স্তিমিত হইয়া আসিলে বড়বৌ উঁকি দিয়া দেখিলেন—সারদা মল্লিক বসিয়া আছে এবং অন্য সকলে কি যেন বলিয়া খুব হাসিতেছে।

আহ্লী পান হাতে লইয়া চলিয়া যাইতেছিল, বিন্দু কহিলেন, আহ্লী তোদের পাড়ায় সব নাকি কাল আদাড়ীর ওখানে পেত্নী দেখেছে —শুনলি সব—

—হ্যাঁগো পিসিমা—আদাড়ী ঠাকুরের বাড়ীর পিছনে ওই মাঠে আমিও দেখেছি—বিধবা একটা কামিন ঘুরে বেড়ায়, কাঁদে—

বড়বৌ নিকটে আসিয়া প্রশ্ন করিলেন, তুই দেখেছিস্?

—হ্যাঁ।

—ও মাঠে তুই কি করে দেখলি?

—হ্যাঁ, ওই আদাড়ী ঠাকুরের বাঁশী বাজানো আমাদের দাওয়া থেকে শোনা যায়। শুনতে শুনতে তাকালেই দেখা যায়—

—ভয় করে না?

ভয় করে বৈকি পিসিমা—

বিন্দু কহিলেন, আদাড়ীর একটা গান শোনা না আহ্লী—তুই ত সব জানিস্—

—শোনাবো পিসিমা—কাল, আজ বেলা পড়ে এল, জলকে যাবে—আহ্লী আঁচলে চাল বাঁধিয়া চলিয়া গেল।

*

তখন অপরাহ্ণ। উঠানের পশ্চিমের গাছগুলির ছায়া দীর্ঘতর হইয়া উঠিয়াছে। অগ্রহায়ণের রৌদ্র নিস্তেজ, তাল বৃক্ষের মাথায় শঙ্খচিল তাহার বাসায় ফিরিয়াছে—আশে-পাশে কাকেরা কলরব করিয়া কি যেন কতকগুলি পতঙ্গ ধরিতেছে।

বিন্দু কহিলেন, যামিনী, কোথারে, কেন জলগুলো গোয়ালে নিয়ে যা—এক্ষুণি গরু এসে পড়বে—

যামিনী আসিয়া তাহার কাজে লাগিয়া গেল। চণ্ডীমণ্ডপের পাশার আড্ডা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, সারদা নিবিষ্ট মনে হুকা খাইতেছেন এবং অন্য সকলে মৃদুস্বরে কি যেন বলিয়া মাঝে মাঝে হাসিয়া উঠিতেছে, এমন সময় হঠাৎ আদাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইল। ভগবতী কহিলেন, এস আদাড়ী, শুন্‌লাম পেত্নীর সঙ্গে ঘরকন্না করছো হে—ব্যাপারটা কি।

আদাড়ী একগাল হাসিয়া কহিল, ঘরকন্নাই বটে, তবে ওসব সাধন-ভজনের কথা, কি আর ব'লবো—

—সাধনাটা কিসের? ভূতের, না পেত্নীর, না কি?

আদাড়ী আবার হাসিয়া কহিল, পেত্নী কেন? পরী-সাধন।

—পরী আস্‌ছে?

—আসে যায়—এ ত সাধারণ কথা নয়—একটা জিনিষ পেলে পরী নিয়েই ঘরকন্না করতুম—

সারদা কহিল, কি জিনিষ হে! যা পেলেনা—

—কঠিন মামা, কঠিন—পাওয়া যায় না—স্বাতীনক্ষত্র মঙ্গলবার যদি এঁয়োতি স্ত্রীলোক মারা যায়, তবে তার সঙ্গে যে সিন্দূর কৌটো আর ধান থাকে তা চাই, চন্দ্রগ্রহণের সময় তোলা শ্বেত-অপরাজিতার শেকড় চাই —এমনি সব জিনিষ।

—আমাদের একটু দেখাও না, একদিন—

—দেখাবো বৈ কি? তবে ওদের সঙ্গে রোজ রোজ কারবার করাটা ভাল নয়, কখন রেগে গিয়ে ক্ষতি করে—

ভগবতী প্রশ্ন করিলেন, তা কতদূর এগোলে হে—

আদাড়ী ধীরে ধীরে পরী-সাধনের প্রক্রিয়া ও তাহার সাফল্য সম্বন্ধে রোমাঞ্চকর কাহিনী বিবৃত করিতে লাগিল—মাঠের কোলে তখন

সূর্য্য আরক্তিম হইয়া উঠিয়াছে, ঘাটের পথে বধূগণ পূর্ণকুম্ভ কক্ষে ফিরিতেছে।

*

আহুরী বাড়ী আসিয়া দেখে তাহার মায়ের জ্বর আসিয়াছে, নটবর গরু লইয়া ফিরে নাই। ভাই শীতল ও ভগিনী সোহাগী দুইজনে খেলা করিয়া বেড়াইতেছে—

মা জ্বরে কোঁকাইতে কোঁকাইতে কহিল, আহুরী, কাঠ নেই যে ঘরে, রাতে উনুন জ্বল্‌বে না—

আহুরী কহিল, চাল আড়াই পাই হল মা, মনিব বাড়ীতে। দেখি কাঠ কুড়িয়ে আনি।

ঘর হইতে একটা ঝাঁটা আনিয়া কহিল, শীতল সোহাগী—যা ঘুঁটে কুড়িয়ে লিয়ে আয়—

ভাই ও ভগিনী ঘুঁটে কুড়াইতে অদূরের ডাঙ্গায় চলিয়া গেল। আহুরী আর একটা ঝাঁকা ও দা লইয়া বাড়ীর পিছনে আদাড়ী ঠাকুরের ঘরের পিছনে মাঠের পাশের জঙ্গলে কাঠ কুড়াইতে গেল—একাকীই। এরূপ তাহারা যাইয়া থাকে, দূরে ডাঙ্গায় শালবনে যাইতে হইলে কেবল দল লইয়া যায়। সেখানে মাঝে মাঝে ভালুক আসে মহুয়া খাইতে এবং শীতে কখনও কখনও বাঘও আসে, কিন্তু এটা ত গাঁয়েরই জঙ্গল।

সন্ধ্যা হইতে বেশী দেরী নাই, শীতের অপরাহ্নের রৌদ্র নিস্তেজ য়া আসিয়াছে, দূরে ডাঙ্গায় জঙ্গলের উপরে গ্রাম হইতে উত্থিত শাদা কগুলী ভাসিয়া বেড়াইতেছে; তাহার আড়ালে সূর্য্য নিস্তেজ। মাত ঠা:নের মাঝে ঢুকিয়া কয়েকখানা শুকনা ডাল ভাঙ্গিয়া কাটিয়া টোলের ছাত্রকটা শালের কোড়া মরিয়া রহিয়াছে সেটাকেও কাটিল—অদূরে

৺কালীর থান, প্রতি বৎসর পৌষ মাসের অমাবস্থায় তাহাদের পাড়ার গাওলা ৺কালী পূজা হয়।

ভরত গরু লইয়া বাড়ী ফিরিবার পথে লক্ষ্য করিয়াছিল, আহুরী জঙ্গলে কাঠ আনিতে গিয়াছে, সে গরুগুলি তাড়াতাড়ি রাখিয়া, একখানা কাটারী হাতে জঙ্গলে উপস্থিত হইল এবং কাঠ সংগ্রহের ছুতায় ধীরে ধীরে তাহার সন্নিকটবর্ত্তী হইয়া কহিল, তু কে হোথা?

—আহুরী—

—আহুরী তু একলাটি?

—হাঁ, তু কোথা?

ভরত একখানা কাঠ কাটিতে কাটিতে আহুরীর পানে চাহিয়াছিল—সুডৌল সুন্দর তাহার দেহ, ক্ষীণ কটিতটে আঁচলের প্রান্ত জড়ানো, বিপুল নিতম্ব ঘেরিয়া লাল টুকটুকে পাছা পাড়—উন্নত উরস। শ্রমে কপালে ঘর্ম্ম-বিন্দু মুক্তার মত ঝুলিতেছে, কোন পাতার ফাঁকে যেন একটু আলো আসিয়া মুখখানিকে সুন্দর করিয়া তুলিয়াছে। তাহার অন্তরে কত কথা বেগবান হইয়া উঠিল—কিন্তু সে কিছু বলিতে পারিল না, কেবলমাত্র কহিল, তু সাঙ্গা করবি না রে আহুরী—

—করবে নাই কেনে, গাঁয়ে করবে নাই—

—কেনে? তুই ত জানিস্—তোর তরে মোর প্রাণ কত কাঁদা করলে, তু শুন্‌বি না—

—তোকে সাঙ্গা করবে নাই।

—আদাড়ী ঠাকুর তোর কে, তু ধান ভান্‌ছিস্, দাওয়া লেপছিস্—

আহুরী হিহি করিয়া ক্ষণিক হাসিয়া কহিল, মু ঠাকুরকে সাঙ্গা করবে, বামুন হবে!

ভরত কেবলমাত্র ব্যথিত হইল, হৃদয়ের কথা সে ব্যক্ত করি ন্য নম্বে না। সাশ্রু-নেত্রে সে চাহিয়া রহিল আহত শ্বাপদের মত ল তখন

হইতে স্ফুরিত হইতে লাগিল যেন কামনার বিষ বাষ্প—চারিদিকে নির্জ্জন জঙ্গল—একাকী কেবল সে আর তাহার এতদিনের আকাঙ্ক্ষিত আহুরী। সে এক পায়ে দুই পায়ে নিকটবর্ত্তী হইয়া আর একবার সস্নেহে ডাকিল, আহুরী, তু শুন্‌বি না, মোর ঘরে যাবি না?

আহুরী যেন একটু দয়ার্দ্র চিত্তে কহিল, মোর আশা ছাড়্ মু ত কারও ঘরকে যাবে না—

ভরত স্তব্ধ হইয়া একটু দাঁড়াইল, আদাড়ী ঠাকুরের প্রতি একটা অকারণ ঈর্ষাবশতঃ কহিল, ঠাকুর তোর কে?

—মোর মনিষ। আহুরী হিহি করিয়া হাসিয়া কাঠের বোঝা একটা ঝাঁকিতে মাথায় তুলিয়া রওনা দিল। ভরত ফিরিয়া গেল আপন বোঝা বাঁধিতে, জঙ্গল হইতে একটা লতা কাটিয়া বিমনাভাবে বোঝাটা বাঁধিয়া তাহার উপর বসিল। মাঠের সর্পিল আলের পথ ধরিয়া আহুরী চলিয়া যাইতেছে—তাহার দেহ সন্ধ্যার অন্ধকারে যেন কামনারাজ্যের ছায়া মূর্ত্তির মত ক্রমশঃই মিলাইয়া যাইতেছে। ভরত দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া সেখানেই বসিয়া রহিল—সূর্য্য অস্ত যাইতেছে, ধূম ও ধূলা-মলিন আকাশের প্রান্তে নিষ্প্রভ রংএর প্রলেপ—ভরত জানে না সে কি ভাবিতেছিল। পূর্ব্বাকাশে মরা চাঁদ উঠিয়াছে, সাম্‌নের প্রান্তর অস্বচ্ছ আলোকে কুয়াসাবৃত বলিয়া মনে হয়—ভরত সুদূর বনরেখার পানে চাহিয়া রহিল।

সন্ধ্যায় মন্দিরে কাঁসর ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। ভগবতী ঠাকুরের শিবমন্দিরে আরতি আরম্ভ হইয়াছে। ভরত চমকাইয়া উঠিল, চারি দিকে অন্ধকার। সে বোঝা মাথায় করিয়া রওনা দিল।

*

মতি ঠাকুর মহাশয় সন্ধ্যা-আহ্নিক শেষ করিয়া বাহিরে আসিলেন—টোলের ছাত্রগণ পাঠ আরম্ভ করিয়াছে। ছাত্রগণ বেশী নয়—জনপাঁচেক

মাত্র। পাশের দেয়ালে একটা বাঁশের চোঙ্গায় রেড়ির তেল ছিল। ঠাকুর সেটার খানিক প্রদীপে ঢালিয়া দিয়া কহিলেন, তোমরা পাঠ তৈরী কর, আমি চণ্ডীমণ্ডপে ভাগবত পাঠ করতে যাবো—পাঁচুর স্ত্রীর কাল চোঙ্গাই-কুলাই ব্রত আছে—জ্ঞান, তুমি সকাল সকাল পূজোটা করে দিয়ে এসো—গরুগুলোর জাব দিয়েছ ত?

মতি ঠাকুর ভাগবত বগলে করিয়া বাহির হইলেন। সারদা মল্লিকের বাড়ীতে বৈঠকী গানের আসর বসিয়াছে। ডুগি-তবলা ও তানপুরা সহযোগে শ্যামা সঙ্গীত চলিতেছে। তিলি-পাড়ায় কীর্ত্তন হইতেছে তাহার খোলের আওয়াজ ভাসিয়া আসিতেছে। বাগ্দী-পাড়ায় কে যেন বাঁশের বাঁশী বাজাইতেছে। মতি ঠাকুর চণ্ডীমণ্ডপে উপস্থিত হইলেন—সতরঞ্চিতে নারী পুরুষ বসিয়া আছে, মাঝে জলচৌকিতে ঠাকুরের বসিবার আসন—দুই পাশে বৃহৎ দুইটি রেড়ির তেলের প্রদীপ জলিতেছে—মতি ঠাকুর ভাগবত পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন—

*

আদাড়ী ঘরে বসিয়া বাঁশী বাজাইতেছিল, বাঁশী ফেলিয়া একতারা বাহির করিল এবং বাউল সুরে গান গাহিতে আরম্ভ করিল—শ্রীকৃষ্ণের বিরহ সঙ্গীত। ভরত দাওয়ায় শুইয়া নেশার ঘোরে বিনিদ্র রজনী যাপন করিতেছে।

ভগবতীর পুত্র শশধর বাড়ীর মাঝে একাকী ঘুরিয়া আসিল—কোথায়ও কেহ নাই—কেবল চাকর রাম ও বাসিনী বসিয়া গল্প করিতেছে। মা পিসিমা ভাগবত শুনিতে গিয়াছেন, বনলতা কোথায়ও নাই—সেও হয়ত ভাগবতের ওখানে গিয়াছে। বনলতার সহিত তাহ দেখা হয় না, কিন্তু দেখিবার একটা অদম্য প্রলোভন তাহার র

গিয়াছে। সে বনলতাকে খুঁজিয়া না পাইয়া ধীরে ধীরে সারদা মল্লিকের বাড়ীতে উপস্থিত হইল—গ্রামের অনেকেই গান শুনিতেছে—.

মতি ঠাকুরের বাড়ীতে শিষ্যগণ ও খুড়তুতো ভাই গোপাল খাইতে বসিয়াছিল। গোপাল প্রশ্ন করিল, দাদা কোথায় বৌঠান?

—ভাগবত পাঠ ক'রছেন, চাটুয্যেদের চণ্ডীমণ্ডপে—

—ও, আমি যেয়ে এগিয়ে নিয়ে আসি?

—তুমি আবার যাবে কেন?

—বেশ, বেশ—সিদেগুলো তিনি কি আন্‌তে পারেন? আমি যাই— একটা বড় গামছা দেবেন ত?

—তা হ'লে জ্ঞানও যাও, দু'জনে নিয়ে আস্‌বে।

আহারান্তে তাহারা যাইবে স্থির হইল। সিধের ঐ চাউলই চতুষ্পাঠীর উপার্জ্জন, তাহাতেই মতি ঠাকুরের সংসার চলে, শিষ্যগণ গুরুর খাইয়া পাঠাভ্যাস করিতে পারে। গোপাল ও জ্ঞান যখন চণ্ডীমণ্ডপে উপস্থিত হইল তখন ভাগবতের এক অধ্যায় শেষ হইয়াছে। নিষ্প্রভ প্রদীপের আলোয় নরনারী ভক্তিগদগদচিত্তে উন্মনা হইয়া উঠিয়াছে। তাহাদের সম্মুখে বাস্তব জীবন অবাস্তব হইয়া উঠিয়াছে এবং পরকাল যেন প্রত্যক্ষ হইয়া প্রতিভাত হইয়াছে। ইহজন্মের পাপপুণ্য যেন তাহাদের পরবর্ত্তী জীবনকে সুনিশ্চিত একটা ফল দিয়াছে—সহসা তাই মনে হয় রেড়ির তেলের প্রদীপের সম্মুখে বসিয়া আছে কতকগুলি অশরীরী মৃত আত্মা—

*

আদাড়ী সকালে উঠিয়া রান্নার যোগাড় করিতেছিল, উঠানের কোণে কতকগুলি শুক্‌না ডাল জড়ো করা ছিল; সে কাটারী দিয়া সেগুলি কাটিতেছিল—রান্নার এটা প্রাথমিক জোগাড়—তাহার মনটা

বিষণ্ণ, কেন বোঝা যায় না। পরীসাধনে হয়ত কিছু ব্যাঘাত ঘটিয়াছে—

অকস্মাৎ আহুরী আসিয়া কোঁচড় হইতে দুইটি বেগুন বাহির করিয়া কহিল—মোর গাছের বেগুন—

আদাড়ী মুখ তুলিয়া চাহিল, কোন কথা কহিল না। কি করতে হবে বল—

আদাড়ী কহিল, দাওয়াটা নিকিয়ে দাও, আর কি করবে?

আহুরী পুকুর হইতে জল আনিয়া দাওয়া লেপিতে আরম্ভ করিল। আদাড়ী কাঠ কাটিতেছিল—আহুরী সহসা ফিরিয়া কহিল, এত রাত বাঁশী বাজালে কেনে? মা'র জ্বর হ'ল—

আদাড়ী কহিল—তোর মার জ্বর?

—হ্যাঁ, ক'বরেজ বাড়ী যাবে—

—তু যা—

আহুরী তাড়াতাড়ি ঘর নিকাইয়া শেষ করিল। তাহার পর হাত ধুইয়া আদাড়ীর দিকে চাহিয়া কহিল, এত রাত তু বাঁশী বাজাস্ না—কেনে ঘুম নাই—

আদাড়ী কহিল, তোর তাতে কি, ঘুম আমার থাক্, আর নাই থাক্—

—তবে আমি আর তোর কাজ করবো না—

আদাড়ী কাঠের বোঝাটা বারান্দায় উনানের পাড়ে ফেলিয়া দিয়া ঘরে গেল, কোন উত্তর করিল না। আহুরী চলিয়া গেল—কবিরাজ বা সিড়াতে যাইতে হইবে। নটবর ধান কাটিতে গিয়াছে, সেই প্রভা বসি গাড়ী লইয়া।

লতা

গ্রামে দুই ঘর বৈদ্য—বটুক কবিরাজই তাহার মধ্যে ভ সহি আহুরী তাহার ঘরেই উপস্থিত হইল। কবিরাজ সমস্ত শুনিয়া দু ত লালবড়ি

দিয়া কহিলেন, যা শিউলি পাতার রস দিয়ে মেড়ে খাওয়াবি। আর দুইটি বড়ি পূনর্ণবার পাতা দিয়ে খাওয়াবি—

—তু একটিবারটি যাবি না—

বটুক বলিলেন, যাবো ঐ বেলা, এ বেলা ভিনগাঁয়ে যেতে হবে। আহুরী ঔষধ লইয়া ফিরিল—সোহাগী গোবর ও ঘুঁটে কুড়াইতে গিয়াছে—এই সময়ে সার সংগ্রহ না করিলে চলিবে না—এটা তাহাদের নিত্য কর্ম্ম। আহুরীর মা কহিল, রাঁধলি না? আহুরী 'যাই' বলিয়া মেটে কলসীটা কাঁকে তুলিয়া লইল। তাহার মায়ের জর ছাড়িয়া গিয়াছে—আজ মুড়ি খাইয়াই থাকিবে—

আহুরী জল লইয়া ফিরিলে তাহার মা কহিল, আহুরী ভরতকে সাঙ্গা করিস্ না কেনে? গাঁয়ে থাকবি—

—তু কিছু বল্‌বি না, ভরতকে সাঙ্গা করবে কেনে?

মায়ের মন আহুরীর জন্যে কেন যেন ব্যাকুল হইয়া উঠে, তাহার চালচলন কাজ-কর্ম্মের মাঝে কোথায় যেন একটি শঙ্কাজনক কিছু হইয়াছে, মা তাই ব্যাকুলভাবে সাঙ্গা করিতে বলেন। নারী পুরুষের আশ্রয়ে না থাকিলেই যেন কেমন বে-মানান হয়। আহুরী রাঁধিবার জোগাড় করিয়া লইল—

ভগবতী সকালে গ্রাম পরিক্রমা করিয়া ফিরিতেছিলেন, হঠাৎ একটা বাড়ীতে গোলমাল শুনিয়া রাস্তার উপর থামিয়া গেলেন। যুগল মুদী তাহার স্ত্রীর সঙ্গে চীৎকার করিয়া ঝগড়া করিতেছে। বাহিরে অপেক্ষমান গরুর গাড়ী—তাহাতে মাল বোঝাই হইতেছিল, আজ পলাসডাঙ্গায় হাট, সে হাটে সমস্ত কিছু বিক্রয় করিবার জন্য লইয়া যাইতে হয়! গাড়ীসহ যুগল যায়— সারাদিন হাটে বিক্রয় করিয়া সন্ধ্যায় ফিরে। ভ্রাতা ছিদাম মাঝে মাঝে তাহার সঙ্গে যায়।

ভগবতী দাঁড়াইয়া ঝগড়ার বিষয়-বস্তু কি বুঝিবার চেষ্টা করিতে-

ছিলেন। যুগলের পত্নীর কথা হইতেছে ; কনিষ্ঠ ছিদামের স্ত্রী কোন কাজ করে না, একলা তার পক্ষে সংসারের এই অগণ্য কাজ করা সম্ভব নয়। যুগল কিছুই বলে না কেন ?

যুগল কহিতেছে—ওরা স্বামী স্ত্রী যখন ছোট হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে তখন সংসারের খাইয়া একটু আমোদ আহ্লাদ করিবে বৈ কি ? বড় যে হয় তাহাকে সহিতেই হইবে। যুগল কহিল, আমার অন্তে আবার ওকেই জোঁয়াল বইতে হবে—

যুগল একটা সরিষার তৈলের মেটে হাঁড়ি মাথায় করিয়া বাহিরে আসিল, এবং ভগবতীকে দাঁড়াইতে দেখিয়া হাঁড়িটা তাড়াতাড়ি গাড়ীর খড়ের উপর বসাইয়া দিয়া করযোড়ে প্রণাম করিল। ভগবতী কহিলেন, সকালে চেঁচামেচি ক'রছ কেন যুগল ?

—ওই মেয়ে মানুষের সঙ্গে হুজুর। বোঝে না ত, যারা বড় হয় তাদের ত সইতেই হয়! ওরা কি তা বোঝে ? কাজ-কর্ম্ম করে সংসারের সকলকে বুকে করে পালন করাই ত মানুষের কাজ—তাই ত ধর্ম্ম ?

ভগবতী থামিয়া কহিলেন, ধর্ম্মের কথা ক'জন বোঝে ?

—হ্যাঁ, হুজুর রামচন্দ্র কত সহ্য ক'রেছেন, সীতা মা কত সহ্য ক'রলেন, সংসারে আর সুখ কি ? দশজনকে খাওয়ানো পরানই ত সুখ—আপনি যেমন কর্ত্তা, পূজার সময় যখন খলাট বোঝাই লোকে খেতে বসে, বলুন ত তখন কেমন লাগে—পুণ্যি ত কিছু করিনি যে দশজন লোক খাওয়াবো—ভাই ভাগ নে, বৌ ছেলে-পুলে খাওয়াবো তারই কত বাধা—

যুগল একটা নিঃশ্বাস ফেলিল—জীবনে কেবল খাটিয়াই সে গেল—মনের ইচ্ছা পূর্ণ হইল না। দু' দশজন লোককে যে খাওয়াইবে তাহাও তাহার হইল না।

ভগবতী হাসিয়া কহিলেন, সেবাই ত ধর্ম্ম—সবই ত সেবাকর্ম্ম—

ভগবতী আগাইয়া চলিলেন—তাঁতিপাড়ায় মিস্ত্রী বসিয়া চরকা ও তাঁতের জিনিস তৈয়ারী করিতেছে, পাড়ার ছেলেরা জড় হইয়া তাহা দেখিতেছে। রাস্তার ধারে বাহির-পুকুরে ধোপানী কাপড় কাচিতেছে, তিলি-পাড়ায় ঘর ঘর করিয়া ঘানি চলিতেছে—

নবতাঁতি প্রণাম করিয়া কহিল, বৌঠানের কাপড়ের তানা দিয়েছি, একটা লাল ও একটা নীল ডুরি হবে, আর চওড়া পাছাপাড় রাখবো ত ?

—রাখবে বৈ কি ? তার ত তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকে নি ? তিনি হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন—নবও হাসিল।

*

চণ্ডীমণ্ডপে নিয়মিত পাশার আড্ডা বসিয়াছে—মতি ঠাকুর আজ আসেন নাই, দিগরগ্রামে কি একটা বাৎসরিক শ্রাদ্ধ আছে, সশিষ্য তিনি সেখানে গিয়াছেন—সারদা পাঁচু প্রভৃতি খেলিতে বসিয়াছেন। পাঁচু কহিল, সারদা, ঐ লোকনাথের ভাই মেলা থেকে একটা পিদিম এনেছে তা ঝড়ে নেভে না। সুন্দর জিনিষ, তবে রেড়ির তেলে জ্বলে না, কেরাচিন না কি তেল দিয়ে জ্বালাতে হয়—

সারদা কহিল, কি রকম ? চুবড়ীর মাঝে পিদিম বসিয়ে নিয়েই ত আমরা ঝড়ে আম কুড়াই। সেটা আবার কি রকম ?

—না গো না, সে ও রকমই নয়, পিতলের চারকোণা একটা খাঁচার মাঝে কাঁচ দেওয়া, নীচে পিদিম, হাওয়া ঢুকতেই পাবে না, তা নিভবে কি ক'রে ?

আলোচনাটা ধীরে ধীরে গুরুত্ব লাভ করিল—ভগবতী কহিলেন, হ্যাঁ, লণ্ঠন আলো শুনেছি বটে, পাঁচু যাও'না নিয়ে এস, জ্বালিয়ে দেখা যাক—

সারদা কহিল, ঝড়ে যদি না নেভে তা হ'লে ত আম কুড়োবার বেশ মজাটি হয়। তা হ'লে আর আম কুড়োতে দিচ্ছি না কাউকে—সব আম কুড়িয়ে নিয়ে আসবো—

পাঁচু গিয়াছে লণ্ঠনটা আনিতে, কেমন দেখিবার জন্য।

ভগবতী কহিলেন, তুমি ত কেবল আম কুড়োবার কথা ভাবছো, আঁধার রাতে যাতায়াত করা, তা ছাড়া বিয়ে পৈতে ব্যাপারে কত স্থবিধে হয়।

কিরূপ সে আলোটি তাহা দেখিবার জন্য সকলেই সাগ্রহে বসিয়া আছেন—আলোচনায় জিনিষটি গুরুত্ব লাভ করিয়াছে, এমন সময় প্রশ্ন উঠিল—আলো না হয় মেলা হইতে আনা যাইতে পারে, কিন্তু কেরাচিন পাওয়া যায় কোথায় ?

সারদা কহিল, হ্যাঁ হ'য়েছে, ঐ আমদপুরের হাটে কেরাচিন বিক্রি হ'তে দেখিছি—ও লাল মত রং পাতলা, একটা কেমন যেন গন্ধ নিমতেলের চেয়েও উগ্র—

লোকনাথ লণ্ঠন লইয়া উপস্থিত হইলেন—সারদা হাতে করিয়া একটু নাড়িয়া চাড়িয়া কহিলেন, জালাও—জালাও দেখি ঝড়ে টেঁকে কিনা ?

লোকনাথ কহিল, ঝড় কোথায় যে দেখবে ? তবে নেভে না একথা সত্যি—

সারদা কহিল, রাখো, ঝড় আমি তৈরী করে দিচ্ছি মন্তর দিয়ে, পরীক্ষেটা হাতে হাতে—

ভগবতী পরিহাস করিলেন, তুমি পরীসাধন আরম্ভ করেছ নাকি ?

—হ্যাঁ খুড়ো, আমার বহু সাধন আছে।

যাহা হউক চকমকি ঠুকিয়া শোলায় আগুন ধরান হইল এবং তাহা হইতে গন্ধকের কাঠি জলিল এবং লণ্ঠন ধরান হইল। লণ্ঠন বেশ

জ্বলিতেছে, আলো কতটুকু হইতেছে তাহা বোঝা যায় না, কারণ তখনও অপরাহ্নের রৌদ্র নিষ্প্রভ হয় নাই।

সারদা উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন, দাও ত আলোটা ঝড়ে নেভে কিনা দেখে আসি—

লোকনাথ কহিল, ঝড় কোথা?

—দাও না দেখাচ্ছি—সারদা আলোটা হাতে করিয়া 'লইয়া ধরিবার স্থানটি ভাল করিয়া ধরিয়া কহিলেন, ঝড় এলো ঝড় এলো, দেখো তোমরা ঝড় এলো—

হঠাৎ সারদা লণ্ঠন লইয়া ভোঁ দৌড় দিলেন—চণ্ডীমণ্ডপের পাশের রাস্তা দিয়া রসিখানেক এক দৌড়ে গেলেন এবং আর এক দৌড়ে ফিরিয়া আসিলেন—আলো তখনও জ্বলিতেছে—আশ্চর্য্য—

সারদা হাঁপাইতে হাঁপাইতে কহিল, নিবু নিবু হ'য়েছিল তবে একেবারে নেভে নাই। আলোটা উঁচুতে উঠাইয়া কহিলেন, আ রামচন্দ্র, এ যে কালির ভূত হ'য়েছে—এতে আর কি আলো থাকবে?

লোকনাথ তাহার আদরের আলোটির সম্মানহানি হইতেছে দেখিয়া কহিলেন, ওই বুঝি ঝড়—

—ঝড় নয় ত কি? ঝড়ে বাতাস চলে, আর এতে নয় আমি চ'ললাম—এই ত তফাৎ—

সারদা মল্লিকের উপস্থিতবুদ্ধি দেখিয়া ভগবতী প্রশংসা করিলেন—সারদার কিন্তু উপস্থিত বুদ্ধি আছে, কেমন ঝড়ের বেগটা দেখিয়ে দিলে—

সারদা কহিল, বুদ্ধি ত ছিল তা আমিও জানি, কিন্তু ব্যাপারটি জানো—তোমার খুড়ির বুদ্ধির সঙ্গে হার মেনে গেলুম—

—কি রকম?

—আমি এ হেন সারদা মল্লিক, দশ গ্রামের লোক যাকে জানে কিন্তু খুড়ির কাছে একেবারে কেঁচো—

—কেন ?

—ও রে বাবা, সে রণচণ্ডী মূর্ত্তি দেখলে আগেই আত্মারাম খাঁচা-ছাড়া—

—কি রকম ঘটনাটা বলই না—

সেদিন খেতে বসে বলেছি—তরকারীতে নুণ একটু কম হ'য়েছে। তা তিনি ব'ললেন, জন্ম গেল রাঁধতে আজ নুণ কম হ'য়েছে, বুড়ো কালে আমাকে রাঁধা শিখতে হবে ? আমি বল্‌লাম, তা নয়, হয়ত ভুলে— কেন ভুল হবে কেন ? অত ভুল আমাদের হয় না, সে হয় তোমার মত মিন্‌ষেদের, যারা বাউরী কুর্ম্মী পাড়ায় কামিন খুঁজ্‌তে যায়। আমি বললুম—ধর ভুলে, অন্য কথা চিন্তা ক'রতে ক'রতে যদি একটু কম হয়ে থাকে। —তার মানে আমি রাঁধতে রাঁধতে অন্যের কথা চিন্তা করি ! রাঁধতে রাঁধতে আমি পরপুরুষের কথা চিন্তা করি ! এই বুড়ো কালে আমার ছেলে চণ্ডীর বয়স হ'ল চৌদ্দ, আমি আজ পরপুরুষের কথা ভাবি, আমায় অসতী নাম দিলে রে এই বুড়ো কালে—ঐ অলপ্পেয়ে মিন্‌ষে কি বললে রে—এ—এ—

সারদা মল্লিক স্ত্রীকণ্ঠ অনুকরণ করিয়া ভেঁউ ভেঁউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। সকলে হাসিয়া উঠিয়া কহিলেন, থামো সারদা কেঁদো না—আহা—হা—তারপর কি হ'ল—

সারদা তারস্বরে চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন—ওরে আমার কি হ'ল রে, তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে আমায় অসতী বল্‌লে রে ?

বনলতা ছুটিয়া আসিয়া শাশুড়ীকে খবর দিল—মা চণ্ডীমণ্ডপে সব [illegible]দছে। বড়বৌ ছুটিয়া গিয়া জানালা ফাঁক করিয়া দেখিলেন—সারদা [illegible] কাঁদিতেছে, আর সকলে হাসিয়া গড়াইয়া পড়িতেছে—

হইতে বনলতা একটা অজ্ঞাত আশঙ্কায় কাঠের মত দাঁড়াইয়াছিল ; শাশুড়ী

কহিলেন, কিছু না বৌমা, সারদা মল্লিক কি যেন একটা রঙ্গ ক'রছে—দেখে এসো—

বনলতা জানালার ফাঁকে দেখিল—সব হাসিতেছে শুধু সারদা কাঁদিতেছেন। সেও বুঝিল, এটা একটা রঙ্গ—সে শুনিয়াছে এই রকম রঙ্গ করিয়াই সারদা মল্লিক গ্রামটাকে সর্ব্বদা সরগরম রাখে। বনলতা একটু দেখিয়া চলিয়া গেল—

হঠাৎ সারদা চুপ করিয়া কহিলেন, তারপর আমি দণ্ডবৎ করে নাকে খত দিয়ে বললুম—দোহাই তোমায়, নুণ ঠিক হ'য়েছে—স্থন্দর হয়েছে, আর একটু দাও ত বেশ লাগছে—

সকলেই জানিত সারদার স্ত্রী অত্যন্ত ভালমানুষ, তাহার মুখে কোনদিন কেহ কঠোর কথা শুনে নাই। এবং সারদা অনেক সময় অন্য-উদ্দেশ্যে তাহার স্ত্রীকে লইয়া এইরূপ গল্প করিয়া থাকে।

লোকনাথ হঠাৎ উঠিয়া কহিলেন, দাও, আলো দাও আমার, অসভ্যটা কোথাকার, সারদা তুমি এমনি অপমান করবে না বলছি—

লোকনাথ রাগিয়া হন হন করিয়া চলিয়া গেলেন। পাঁচু জিজ্ঞাসা করিল, ব্যাপার কি, লোকনাথ চট্‌লে কেন?

সারদা কহিল, সেদিন দেখি লোকনাথদার সঙ্গে বৌঠানের বেধেছে আর বৌঠান অমনি ক'রে কাঁদছে—আর দাদা আমার বৌঠানের পায়ে দণ্ডবৎ হ'য়ে পড়ে আছেন।

কথাটা যে লোকনাথের উদ্দেশ্যে এবং তাহাকে রাগাইবার জন্যই হইয়াছে সকলে তাহা বুঝিয়া পুনরায় আর একবার হাসিয়া উঠিল—

তখন অপরাহ্ণের রৌদ্র অদূরে আম্র-বৃক্ষের মাথায় উঠিয়াছে—একখানা শুকনা ডালে নীলকণ্ঠপাখী ডিগবাজী খাইতেছে—কা' সে পিছনে কতকগুলি ফিঙ্গে লাগিয়াছে। আজকার মত চণ্ডীমণ্ডপ আসর ভঙ্গ হইল—

*

সারদা পাঁচু প্রভৃতি কয়েকজন ফিরিতেছিলেন, পথে দেখিলেন, একটি পুরুষ ও একটি স্ত্রীলোক কাহার বাড়ীতে তত্ত্ব লইয়া যাইতেছে। তাহারা প্রশ্ন করিল, হরিপদ চাটুয্যের বাড়ী কোন্‌টা ?

—কোথা থেকে আস্‌ছ তোমরা—

—ময়নাডাল থেকে ? মুখুজ্যেমশায় পাঠিয়েছেন ?

—ও বৌমার বাপের বাড়ীর তত্ত্ব, বেশ বেশ। এস—

সারদা সাদরে তাহাদিগকে নিজের বাড়ীতে লইয়া আসিলেন। পাঁচু একটু বিস্মিত হইয়া কহিল—কি খুড়ো কি ?

—এস এস খুড়ো, বৌমার বাপের বাড়ী থেকে শীতের তত্ত্ব এসেছে, মিষ্টিমুখ করে যাও—

পাঁচু বুঝিলেন—সারদার মাথায় পুনরায় দুষ্টবুদ্ধি চাপিয়াছে। পাঁচু দাঁড়াইয়া হাসিতেছিল। সারদা কহিল, যাও ভগবতী খুড়োদের যাদের পাও ডেকে আনো—

পাঁচু প্রস্থান করিল, সারদা কহিলেন, তা তোমরা আজ থাকবে ত ? না কি ফিরে যাবে ? তোমার নাম কি গো বেটি ?

—না, হুজুর ফিরে যাবো, এখনত বেলা আছে। নাম মোহিনী—

তা বিদেয় নিয়ে যাও। মোহিনী, তোমার বেটার নাম কি ?

সারদা তাহাদিগকে দুই সের চাউল ও দুই আনার পয়সা দিয়া কহিলেন, তা ব'লো, বৌমা ভালই আছেন। বৌমা ত গেছেন গা ...তে, আস্‌তে দেরী হবে—

—তা হুজুর আমরা চল্লুম—বাড়ীর সব ভালই আছেন।

হইতে—বেশ বেশ—

...ক দুইটি চলিয়া গেল—সারদা পাত্রটি খুলিয়া দেখিলেন—একখানা

শাড়ী, একখানা ধুতি ও একখানা মোটা চাদর শীতের জন্য। প্রচুর নাড়ু ও অন্যান্য মিষ্টান্ন—

পাঁচুরা কয়েকজন ফিরিয়া আসিলেন। সারদা কহিল, এস, এস, সব মিষ্টিমুখ কর!

সকলে হৈ হৈ করিয়া মিষ্টান্ন প্রায় শেষ করিয়া ফেলিল—সারদা কহিল, থাক্—হরিপদর বৌমার জন্যে দুচারখানা রাখ্‌তে হবে ত?

—হ্যাঁ, তা না হয় রাখলে, কিন্তু এখন কে দিতে যাবে!—কাপড় দু'খানা ত দিতে হবে—

—কেন—আমি যাবো। ভাবনা কি? হরিপদর বৌ আবার লজ্জাবতী, আমাকে দেখ্‌লে এক গলা ঘোমটা দেয়। তাকেও দেখে আসি—তোমরা দাঁড়াও—

সারদা তাড়াতাড়ি একখানি শাড়ী পরিয়া একগলা ঘোমটা দিয়া চুপড়ী মাথায় চলিলেন। পাঁচুরা কয়েকজন পিছন পিছন চলিলেন তামাসা দেখিতে। সারদা হরিপদর বাড়ীতে সরাসর ঢুকিয়া পড়িলেন এবং দেউড়িতে বসিয়া পড়িলেন। হরিপদর পুত্রবধূ ঘর ঝাঁট্ দিতে আসিয়া প্রশ্ন করিলেন—কেগো? কোথা থেকে এসেছ—

সারদা স্ত্রীকণ্ঠ অনুকরণ করিয়া কহিলেন, আমি মোহিনী, ময়নাডাল থেকে এসেছি, মুখুজ্জেমশায় পাঠিয়েছেন—

হরিপদর পুত্রবধূর বয়স এই পনর ষোল হইবে। বাপের বাড়ী হইতে তত্ত্ব লইয়া আসিয়াছে জানিয়া সাগ্রহে প্রশ্ন করিল, বাবা কেমন? মা কেমন আছেন?

—ভাল গো ভাল,—মাঘ মাসেই তোমাকে ঘরে নিয়ে যাবে—

বধূটি হঠাৎ দাঁড়াইয়া গেল—এবং 'বস' বলিয়া চলিয়া গেল। সে আনন্দে শাশুড়ীকে যাইয়া সংবাদ দিল—মা, বাবা তত্ত্ব পাঠিয়েছেন।

হরিপদর স্ত্রী আসিয়া প্রশ্ন করিলেন—কি পাঠিয়েছেন বেয়াই—

ওই ত হোতা আছে—

হরিপদর স্ত্রী তত্ত্বের জিনিষগুলি দেখিতে দেখিতে কহিলেন, ওমা এ কটা মিষ্টি আমি কার মুখে দেব। পাঠালে দুটো বেশী করে পাঠাতে হয়! তা তুমি বাপু মেয়েমানুষ, একগলা ঘোমটা দিয়ে কেন?

সারদা কহিলেন, ময়নাডালের মেয়েরা ঘোমটা দিয়েই ভিনগাঁয়ে যায় —ঘোমটা দিয়েই ফিরে আসে—মিষ্টি নিয়ে যায়—বিদেয় নিয়ে আসে—

বধূটি ফিস্ ফিস্ করিয়া কহিল, ও মা, ওর যে গোঁফ দেখা যাচ্ছে—

শাশুড়ী মাথায় কাপড় টানিয়া দিয়া কহিলেন, কে গা তুমি বটে—এই কটা মিষ্টি নিয়ে এসেছ—

সারদা ঘোমটা ফেলিয়া কহিলেন, আমি সারদা বটহে, মিষ্টি পাড়ায় দিতে হবে না বৌঠান, আমরা খেয়েছি—

হরিপদর স্ত্রী ঘোমটা টানিয়া কহিলেন, রামচন্দ্র—

সারদা শাড়ী গোটাইয়া লইয়া সদর রাস্তা দিয়া ছুটিয়া বাড়ীতে আসিয়া উঠিলেন। রাস্তার সকলে হো হো করিয়া হাসিয়া তাহার পিছনে পিছনে ছুটিল—কি হ'ল সারদা—কি হ'ল—

সারদা ততক্ষণে নির্বিঘ্নে বাড়ীতে আসিয়া পৌছিয়াছেন।

*

এমনি করিয়া চলে দিনের পর রাত্রি—রাত্রির পর দিন। গোপালপুর যেন একটা বৃহৎ পরিবার, ভগবতী তাহার যেন কর্তা, সারদা বিদূষক। সকলে আপন আপন কাজ করিয়া শাকান্ন সংগ্রহ করে, কেহ গানে, কেহ খেলায়, কেহ কীর্ত্তনে অবসর বিনোদন করে, তাহার মাঝে প্রতিবেশীদের লইয়া চলে হাস্য পরিহাস—নিষ্কলুষ সুবিমল আনন্দের স্রোত—সিপাহীদের যুদ্ধের সংবাদ, জয় পরাজয়ের সংবাদ, হাটের মারফতে লোক-মুখে গ্রামে গ্রামে প্রচারিত হয়।

সকলেই সকলের উপর নির্ভর করিয়া পরম আনন্দে চলে তাহারা যুগ যুগান্তর—এই দীর্ঘ যাত্রা তাহাদের বংশপরম্পরায়—বহু পুরাতন আত্মীয়তার বন্ধনে বাঁধা—

পৃথিবীর আবর্ত্তন চলে—আসে রাত্রি, আবার দিন—

*

আতুরীকে আর একটা কথা বলিবার জন্য ভরতের মনটা ছট্‌ফট্ করিতেছিল—একবার সে শেষ কথাটা তাহার নিকট শুনিয়া লইয়া তাহার পরে ভিনগাঁয়ে সাঙ্গার চেষ্টা করিবে। কিন্তু আতুরীকে সে কখনও একা পায় না। সোহাগীকে জিজ্ঞাসা করিয়া সে জানিল—আতুরী সেদিন গিয়াছে মনিব-বাড়ীতে ধান ভানিতে, সন্ধ্যার পূর্ব্বে নিশ্চয়ই আসিবে—

ভরত গরুগুলি মাঠ হইতে আনিয়া চণ্ডীতলায় স্বল্প পরিসর মাঠে চরিতে দিয়া বসিয়াছিল—আতুরী এই পথেই ফিরিবে। ভরত বসিয়া বসিয়া ক্লান্ত হইয়া উঠিয়াছিল এবং যে কথাটা বলিবে তাহা ঘুরাইয়া ফিরাইয়া নানাভাবে ঠিক করিয়া রাখিল।

সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছে, আকাশে বিরাট একখানা চাঁদ উঠিয়াছে, উত্তর হইতে একটা ঠাণ্ডা হাওয়ায় শীত করে, ভরত তবুও বসিয়া রহিল—হ্যাঁ আতুরী এতক্ষণে আসিতেছে, কোঁচড়ে চাল লইয়া দ্রুত পদক্ষেপে সিতেছে। ভরত ডাকিল—আতুরী তু শোন—

আতুরী একটু বিরক্ত হইয়া কহিল, বল্ না—রাত হতে লেগেছে।

তু সাঙ্গা করবি না—

—না তোকে করবো না—কতবার ত বল্‌তে লেগেছি, তু ছাড়্।

ভরত কহিল—তু সাঙ্গা কর, পৈচে, তাবিজ আর এক কুড়ি টাকা যতুক দেবেক, মোর ঘরকে চল—

আতুরী একটু হাসিল—ভরতের বিষণ্ণ মুখের পানে চাহিয়া একটু

করুণার সুরে কহিল—মু ত পৈচে তাবিজ আর টাকাকে সাঙ্গা করবে না, সাঙ্গা করবে মনের মনিষকে—মনের মনিষ তু হ'তে পারবি—

—কেনে লারবো—

—মোর মন ত লারবেক—

আহুরী বিলম্ব না করিয়া দ্রুত চলিয়া গেল। ভরত দুঃখিত হইয়াছিল—কিন্তু সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে গরুগুলি লইয়া তাহাকে যাইতেই হইবে। সে আনমনে ভাবিতে ভাবিতে আসিয়া গরুগুলি গোহালে তুলিল। ছেলেটা দুপুরের ভাত লইয়া বসিল—নিমতেলের প্রদীপ জ্বালাইয়া। ভরত উঠানে একটা খাটিয়া পাতিয়া পচাই পান করিতে লাগিল। বুকখানা তাহার আজ ফাটিয়া যাইতেছে—সে ভাবিয়াছিল দুইটি গরু বিক্রয় করিয়া সে পৈচে তাবিজ গড়াইয়া দিবে, আহুরী তাহার ঘরে আসিবে—কিন্তু তাহাতেও রাজি হইল না। এ যে কত বড় ত্যাগ তাহা আহুরী বুঝিল না—

শুভ্র চাঁদ, মধ্যাকাশে দীপ্তি পাইতেছে, দূরের শালবন নীল রেখার মত আকাশের পটে আঁকা—ভরতের দুঃখ নেশার ঘোরে যেন আরও উত্তেজনা লাভ করিতেছে—সে বসিয়া অগোচরে কাঁদিতে লাগিল—হয়ত এমনি করিয়া আদিম মানব প্রকাশের ব্যাকুলতায় কাঁদিয়া মরিয়াছে, গিরিগাত্রে নারীমূর্ত্তি অঙ্কন করিয়াছে, বাঁশের বাঁশী বাজাইয়া প্রথম সঙ্গীতের সুর সৃষ্টি করিয়াছে—পৃথিবীর বুকে রাখিয়া গিয়াছে তাহার অতৃপ্ত-হৃদয়-নিঃসৃত করুণ গাথা—

*

আজ বৃহস্পতিবার—

বৈঠকখানায় বসিয়া ভগবতী মতি ঠাকুরকে দিয়া একটা কার্য্যের ফর্দ্দ করিতেছিলেন। পৌষমাসের দশমীতে তাহার মাতার বার্ষিকী, এমন সময়

শ্যামপুরের ছিদাম ও তাহার স্ত্রী আসিয়া পৌছিল। মাটিতে মাথা ঠেকাইয়া তাহারা প্রণাম করিল। কহিল—হুজুর আমরা এসেছি—

—কেন? তোদের কি কাজ?—ভগবতী মুখে কথাটা বলিলেও চোখটা তাহার ফর্দ্দের দিকেই ছিল এবং মনটা ছিল হিসাবের দিকে।

ছিদাম কহিল, হুজুর—

ভগবতী ফিরিয়া তাকাইতেই তাহার সমস্ত ঘটনা মনে পড়িল—ঐ অবগুণ্ঠনা ছিদামের স্ত্রী সেদিন আসিয়াছিল ছাড় করিবার উদ্দেশ্যে। ছিদাম তাহাকে পাঁচন দিয়া মারিয়া জর্জ্জরিত করিয়া দিয়াছিল। ভগবতী কহিলেন, ছিদাম তুই বাইরে যা, শুনি ওর কাছে—

ছিদাম চলিয়া গেলে ভগবতী প্রশ্ন করিলেন, কিরে ছাড় করবি? তোর সাঙ্গা ঠিক ক'রেই রেখেছি—

যুবতী মাথা নত করিয়া ঈষৎ হাসিয়া কহিল, না হুজুর—

—কেন? সেদিন ওরকম মারলে তার ঘরে থাকবি কেন?

—আর মারবে না—ও বলেছে—

—সেদিন যে নালিশ করলি ও তোকে ভালবাসে না, মারে—

যুবতী অবনত মাথা না তুলিয়াই কহিল, মারে আবার হুজুর ভালওবাসে—

—ও মারেও বটে, আবার ভালবাসেও বটে—

মতি ঠাকুর হাসিয়া কহিলেন, বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া—দাম্পত্য-কলহে ঐই হয়—

ভগবতী মনে মনে হাসিতেছিলেন, তিনি গম্ভীর স্বরে কহিলেন, ছিদাম—

ছিদাম আসিল। তিনি কহিলেন, এই তোর বৌ, আশনাই করে বলছিলি—তারে নিয়ে ঘর করবি কেন?

—সেটা ঠিক লয় হুজুর—

—তবে সেদিন ব'ললি কেন ?

—ঘাট হইছেন হুজুর—

ভগবতী কহিলেন, ওরা যে মিথ্যা কথা বলেছে, ওদের শাস্তি কি হওয়া উচিত। ভগবতী জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে মতি ঠাকুরের দিকে চাহিলেন।

ছিদাম কহিল, যা হুকুম বাবু—

মতি ঠাকুর কহিলেন, যা এবার বৈশাখ মাসে দু'টো বট আর দু'টো আমগাছ লাগাবি রাস্তার ধারে—

যুবতী সোৎসাহে কহিল, হাঁ হুজুর—

—হ্যাঁ, ছায়ায় বস্‌লে যেমন আনন্দ, তেমনি আনন্দে তা হ'লে থাক্‌বি তোরা—যা—

তাহারা চলিয়া গেল—ভগবতী পুনরায় ফর্দ্দে মনোনিবেশ করিলেন।

*

ভরত সারাদিন ধান কাটিয়া, গরুর গাড়ী বোঝাই করিয়া মনিব-বাড়ীর খামারে লইয়াছে। সন্ধ্যার পর আসিয়া অবসন্ন দেহে হাঁড়ি চাপাইয়া দিয়াছে—কতকগুলি মুড়ি, লঙ্কা ও তেলেভাজা লইয়া খাইতে বসিয়াছিল—তাহার মনে হইল একটু পঁচুই না খাইলে আর কাল কাজ করা যাইবে না। সে ছেলেকে রাঁধিতে বলিয়া পাড়ায় পঁচুই সংগ্রহ করিতে গিয়াছিল। সেই সময়ে নটবরের বাড়ীতে যাইয়া সে আদুরীকে দেখিয়া আসিয়াছে—সন্ধ্যার সময় তেল দিয়া চুল বাঁধিয়া পরিষ্কার কাপড় পরিয়া সে বসিয়া আছে—সোহাগী আর তাহার মা রাঁধিতেছে। এই প্রসাধন যে কাহার জন্য তাহা সে বহুদিন সন্দেহ করিয়াছে। নটবরের বাড়ী হইতেই সে পঁচুই লইয়া আসিয়াছিল। রাত্রে উনুনের নিকটে অপেক্ষাকৃত গরম স্থানটায় কাপড়ের খুঁট গায়ে দিয়া সে পচুই মদ্য সহ মুড়ি খাইতেছিল।

আদুরী স্ত্রীলোলে ছেলেটাকে খাইতে দিয়া সেও খাইয়া লইল। ক্লান্ত ভিতর ঘারে একখানা কাঁথা মুড়ি দিয়া শুইয়া পড়িল। একটু ট্ শীত . ড়িয়াছে—কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ উঠিবে প্রহরেক রাত্রির পরে—মনে ভাবিতেছিল সে আদুরীর কথা, আদুরী এত আদরেও কেন তাহার র আসিতে চায় না—

গভীর রাত্রি।

চারিদিকে নিঝুম—দূরের বনশ্রেণী কৃষ্ণপক্ষের তৃতীয়ার চাঁদের আলোয় তন্দ্রালস। নিশাচর দুই একটি পাখী ডাকিয়া পৃথিবীর বুকে প্রাণের স্পন্দন জাগাইতেছে। নিদ্রাহারা চাঁদ পৃথিবীর ধূসর মৃত্তিকার পানে চাহিয়া আছে পরম বিস্ময়ে—রাত্রের নীরব নির্জ্জন কোলের মাঝে চলিতেছে জীব-জগতের হাসি, কান্না, ক্ষুধা, নিদ্রার ক্রমিক আবর্ত্তন—

ভরত সহসা জাগিয়া গেল—উঠানের অর্দ্ধেক চাঁদের আলোয় সুস্পষ্ট সুন্দর। গরু দুইটি রোমন্থন-রত, পরম আলস্যভরে পুচ্ছ তাড়না করিতেছে। দূরাগত একটা বাঁশীর সুর ভাসিয়া আসিয়া মনটাকে যেন উদাস করিয়া দিতেছে—বিরহীর বেদনা যেন বাঁশীর সুরতরঙ্গে দূর দিগন্তে ফাটিয়া পড়িতেছে—

ধীরে ধীরে বাঁশী নীরব হইল—পৃথিবী নিঝুম। ভরত বাহিরে আসিল—আকাশে অগণ্য তারা, শুভ্র ছেঁড়া মেঘের টুকরা ভাসিয়া বেড়াইতেছে। সহসা তাহার মনে হইল—এ বাঁশী আদাড়ী ঠাকুরের, সেই ত নিশীথ রাত্রে বাঁশী বাজাইয়া পরীসাধন করে। ভরতের মনে হইল—সে আজ দেখিয়াই আসিবে কেমন সে পেত্নী। জীবনে তাহার ত কিছুই নাই—আদুরী যদি ঘরে না আসিল, তবে জীবন তাহার বৃথা—

কতকটা ঈর্ষ্যায়, কতকটা সন্দেহে ও মোহে, কতকটা মদের ক্রিয়ায় সে একখানা লাঠি লইয়া বাহির হইয়া পড়িল। কাঁথাখানা মুড়ি দিয়া, মাঠের কোলে কোলে পথ ধরিয়া আদাড়ী ঠাকুরের বাড়ীতে উপস্থিত হইল।

ঘরের পিছনে একটা সরু গাছের সঙ্গে ঠেস্ দিয়া দাঁড়াইয়া রহিল—

শুনিল—ঘরের মাঝে গল্প হইতেছে—একটি কণ্ঠ আদাড়ী নারীকণ্ঠ—

—কে? পরী? পেত্নী—আদাড়ী কি সত্যই তবে পরীসাধনে সিদ্ধ হইয়াছে—

সহসা সমস্ত শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল—নিশীথ রাত্রি নীরব নিঃশব্দ···একটা অজ্ঞাত ভয়ে বুকের মাঝে ঢিপ ঢিপ করিতেছে—

ভরত ভাবিল—সবই ত গিয়াছে তবে আর কেন? সে ধীরে ধীরে জানালায় কান পাতিল।

—কার কণ্ঠস্বর! এ যে আতুরী—

সে সুস্পষ্ট শুনিল—আতুরী কহিতেছে, বেশীক্ষণ থাকবো না ঠাকুর। ভরত পিছু লেগেছে কখন কি করে—

—কি বল্‌ছে?

—সাঙ্গা ক'রবেক—মু ত সাঙ্গা ক'রবে নাই—

—সাঙ্গা করবি না?

না, তু ত মোর সাঙ্গা ঠাকুর—জাত জন্ম ত' তু খেয়েছিস্। আর সাঙ্গা মিলবে কেনে?

—তুই জাত জনম্ দিলি কেনে?

—তু যে বেবাগী হতে চলেছিস্—

ভরত ধৈর্য্য ধরিয়া আর শুনিতে পারিল না! তাহার সন্দেহ ত সত্য! আতুরী এই জন্যই সাঙ্গা করিতে চায় না। সে বনের মাঝে পায়ে-চলা-পথটার ধারে কাঁথা মুড়ি দিয়া বসিয়া রহিল।

আদাড়ী ঠাকুর আবার বাঁশী বাজাইতে আরম্ভ করিল। পরিপূর্ণ একটা প্রফুল্ল স্বর আপনমনে খেলিয়া বেড়াইতেছে, কিছুক্ষণ পরেই আতুরী ভরতের গায়ের অতি সন্নিকট দিয়া ধীরে ধীরে মাঠে আসিয়া থামিল। ভরতও নিঃশব্দ চরণে পিছু পিছু আসিতে লাগিল—আশ্চর্য্য,

আহুরী স্ত্রীলোক—সে এত দ্রুত যাইতে পারে! মাঠের পর শালবন, তাহার ভিতর দিয়াই বাগ্দী পাড়ায় যাইবার পথ—আহুরী সেই পথেই চলিতেছিল। ভরত নিঃশব্দে তাহার পিছনে যাইতে যাইতে, বনের সন্নিকটে আহুরীর নিকটবর্ত্তী হইয়া পিছু হইতে ডাকিল—আহুরী—

আহুরী চমকাইয়া ফিরিয়া চাহিয়া কহিল, তু কে? ভূরত?

হ্যাঁ—ভরত। তু দাঁড়া—

আহুরী কহিল, কেনে? সাঙ্গা করবি?

ভরত আহুরীর প্রশ্নে অবাক হইয়া গেল—এমনভাবে ধরা পড়িয়া সে যে এমন স্বচ্ছন্দে ও সরল চিত্তে ব্যঙ্গ করিতে পারে তাহা ভরত ভাবে নাই। ভরত শুধু কহিল, তু দাঁড়া, কটা কথা বল্‌বো।

—ঠাকুরের হোথা, অনেক দেরী হ'ল। কি বলবি তু বল—বাবা মা জেগে যাবেক—

ভরত কি বলিবে ঠিক বুঝিতে পারিল না, আহুরী বিন্দুমাত্র লজ্জিত বা ভীত না হওয়ায় ভরতই লজ্জিত হইয়া পড়িল। সে থামিয়া থামিয়া কহিল, তু পেত্নী হ'য়ে ভয় দেখাতে লারবি আর—

—ভয় তু পাবি কেনে? তু মরদ—

—ঠাকুর তোর কে? তু হোথা যাবি কেনে!

—ঠাকুর ত মোর সাঙ্গা, যাবেক না কেনে?

—মু, জমিদারকে বলে দেবেক—

—দে, মোরা দেশান্তরী হ'য়ে যাবে—

ভরত সবিস্ময়ে কহিল, দেশান্তরী হবি, মোকে সাঙ্গা করবি না—

—ক'রবে নাই কেনে? ঠাকুরের হোথা মু যাবেই, তু যদি সাঙ্গা করবি কর না কেনে—

ভরত না ভাবিয়াই কহিল, বেশ, মু সাঙ্গা করবে—রোজ যাবি না ত?

আহুরী কহিল, না, কাল কাঠ কাটতে যাবি হোথা সব বল্‌বে—সাঁজে যাবি—

দ্বিতীয় কিছু না বলিয়া আহুরী মুহূর্ত্তে বনের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেল। ভরত অবাক বিস্ময়ে বনশ্রেণীর কোলে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল—আশ্চর্য্য এই আহুরী, ভয় লজ্জা সংকোচ কিছুই তাহার নাই, যেন একটা নেশার ঘোরে জীবনটাকে চালাইয়া লইতেছে—

এক পায়ে দুই পায়ে ভরত বাড়ী ফিরিয়া আসিল। কিন্তু একটা অজ্ঞাত প্রদাহ মনটাকে উষ্ণ করিয়া রাখিয়াছে। আহুরী তাহাকে সাঙ্গা করিতে পারে; কিন্তু আদাড়ীকে সে ছাড়িতে পারিবে না, এই সর্ত্তে সে যদি সাঙ্গা করে তবে সে সাঙ্গা করিতে পারে। কিন্তু সে সাঙ্গা করিয়া লাভ কি? সে আপনার হইল না, গৃহে থাকিল মাত্র!

*

পরদিন ধান কাটিতে কাটিতে ভরত বার বার বেলার দিকে লক্ষ্য করিতেছিল। তাহাকে সন্ধ্যার পূর্ব্বে কাঠ সংগ্রহ করিতে বনে যাইতে হইবে—আহুরী তাহার কথা জানাইবে। ভরত ধান বোঝাই গাড়ীখানা খামারবাড়ীতে পৌছাইয়া দিয়া মনিবকে কহিল, সে বাড়ী যাইবে, কাঠ না সংগ্রহ করিলে রাঁধিবার উপায় নাই।

বাড়ীতে আসিয়া দেখে ছেলেটা গরু আনিয়া বাঁধিয়া রাখিয়াছে—ভরত তাহাদিগকে দুই আঁটি খড় দিয়া কাটারী হাতে বনের দিকে রওনা দিল। তখনও সন্ধ্যা হইতে বিলম্ব আছে। বনের কোলে স্বর্ণবর্ণ ধানের ক্ষেতে শীতের অপরাহ্ণ রৌদ্র চিক্‌মিক্‌ করিতেছে। ভরত বার বার পথের পানে চাহিয়া ক্লান্ত হইয়া উঠিল—কাটিতে কাটিতে প্রায় দুই বোঝা কাঠ সংগ্রহ হইয়া গিয়াছে। সে সময়ের অপচয় না করিয়া এক বোঝা বাড়ীতে

রাখিয়া আসিল। দ্বিতীয় বার বোঝা বাঁধিয়া সে যখন যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে তখন প্রায় সন্ধ্যা। সূর্য্যদেব লাল হইয়া পশ্চিমের উচ্চ ভূমির পলাশ গাছগুলির আড়ালে ঢলিয়া পড়িয়াছেন—ভরত দেখিল চুপড়ী মাথায় করিয়া আহুরী তাহার দিকেই আসিতেছে।

ভরত অপেক্ষা করিতেছিল—আহুরী আসিয়া কহিল, তু দাঁড়া ভরত, কাঠ কেটে লি—

—আমি দেব তু লে—

দুইজনের চেষ্টায় মুহূর্ত্তে একবোঝা কাঠ হইয়া গেল। বনের লতা কাটিয়া তাহাকে বোঝাটা বাঁধিয়া দিয়া ভরত কহিল, তু কাঠ কেটে কবে মোর ঘরকে যাবি?

আহুরী অত্যন্ত সহজ সরল ভাবে কহিল, তোর ঘরকে যাবে, কিন্তু ঠাকুরকে ছাড়বে নাই। বল—তু কিছু বলবি নাই—

ভরত এই প্রশ্নটা ভাবিয়াছে বহুবার—কিন্তু অন্তরে সাড়া দেয় নাই। তাহার পর ভাবিয়াছে—দু'চার দিন একসঙ্গে ঘর করিলে তাহার পর আপনিই তাহার মোহ কাটিয়া যাইবে। ছেলে-পুলে হইলে নিশ্চয়ই আর কোথাও যাইবে না। ভরত কহিল, তু পারবি, মোর ঘরকে যেয়ে ঠাকুরের ঘর যেতে—

আহুরী আকস্মিক এই প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত ছিল না। সে জানিত ভরত বোকা, তাহাকে যেমন করিয়া হয় বুঝাইয়া দেওয়া যায়—কিন্তু যেখানে সত্যকার আন্তরিক আবেদন সেখানে শঠতা চলে না। আহুরী থমকিয়া গেল—একটুক্ষণ ভরতের মুখের পানে চাহিয়া কহিল, তু ত সাঙ্গা করবি, মোর তরে তু ত কাঁদছিস্—মুই রাড়ী বাগ্দী, মোর তরে বামুন ঠাকুর কাঁদবে, বাঁশী বাজিয়ে বাউরী হ'য়ে যাবে—আমি কি ক'রবে বল্—

—ঠাকুর তোকে ভালবাসে—

আহুরী অবাক হইয়া ক্ষণিক চাহিয়া থাকিয়া কহিল, ভালবাসে—একদিন না গেলে কত দুঃখু পায়, মু তাই ত সাঙ্গা করতে লারি।

আহুরী হঠাৎ কেমন যেন বিমর্ষ হইয়া চোখের জল ছাড়িয়া দিল। কাঁদিতে কাঁদিতে সে কহিল, ভরত তু ছাড় মোর আশা—মু ম'রবে, ঘর মোর আর হবে নাই—

ভরত আহুরীর চোখে জল দেখিয়া বিহ্বলের মত সান্ত্বনা দিয়া কহিল, তু চল্ আহুরী, বাড়ী চল্, উঠ্—

ভরত আহুরীর বোঝাটা তাহার মাথায় তুলিয়া দিয়া, নিজের বোঝা লইয়া পুনরায় কহিল, চল্ আহুরী চল্—কাঁদিস্ না।

আহুরী চলিতে লাগিল—পিছন পিছন ভরত আসিতেছে। ভরত কহিল, কাঁদিস্ না। মোর ঘরকে চল্, দুজনে সোনার ধান ফলাবে, ঘর করবে—ঠাকুর ভুলে যাবে তোর কথা—তু ভুলবি—আশনাই চিরদিন ত থাকবে নাই—

আহুরী কহিল, নারে—ভরত। ভুলব নাই, ঠাকুর মোর সব নিয়েছে রে। আহুরী চোখের জল মুছিয়া কহিল, তু ত মোকে সাঙ্গা করবি, মোর মন ত পাবি নাই—

ভরত পরম উৎসাহে কহিল, তোর মন মু আপনার করে লেবে।

আহুরী আর কথা কহিল না। আগে আগে চলিতে চলিতে কহিল, তু যা—একসঙ্গে যাবে না—

আহুরীর ইচ্ছা নয় সে ভরতের সঙ্গে একসঙ্গে গ্রামে প্রবেশ করে, লোকে হয়ত নানা কথা বলিতে পারে। ভরত তাই কাষ্ঠভার মাথায় লইয়া দ্রুত গ্রামের প্রান্তে আসিয়া পৌঁছিল।

তাহাদের আলোচনা আজকার মত স্থগিত থাকিল। আহুরীর আকস্মিক কান্নায় কিছুই স্থির হইল না।

*

মতি ঠাকুর মহাশয় গোপালের বিবাহ স্থির করিতে যাইবেন, সঙ্গে যাইবেন সারদা মল্লিক, তাহারই শ্যালীকন্যার সহিত সম্বন্ধ। ক'নে দেখিয়া সেটা পাকা করিয়া আসিতে হইবে। রাস্তা বেশী নয়—ক্রোশ আষ্টেক। ভোরে রওনা দিলে দ্বিপ্রহরের পূর্ব্বেই পৌঁছান যাইবে। এবং বৈকালে ক'নে দেখা প্রভৃতি শেষ করিয়া পরদিন দ্বিপ্রহরে বাড়ীতে আসা যাইবে। এই দুইদিন গোপালই দেবসেবা করিবে। গৃহ, দেবসেবা ও পূজা-পার্ব্বণের সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া দিয়া যাইতে হইবে। ভগবতীকে মতি ঠাকুর তাহাই জানাইতে আসিয়াছিলেন—

ভগবতী বলিলেন, বেশ বেশ, গোপালের বিয়ে। মেয়ে-বাড়ীর অবস্থা কি রকম?

—সাধারণ, আমাদেরই মত, তা ছাড়া আর কি হবে—সারদার শ্যালীকন্যা—

—কিন্তু সে যাই হোক, বরযাত্রী দুই তিনশ যাবে এটা বলে আস্‌বেন—

—অত বরযাত্রী কোথায়? আর নিয়ে যাবই বা কি ক'রে?

—সে সব ঠিক হ'য়ে যাবে ঠাকুর মশায়, ভগবতী চাটুয্যের পুরুতের বাড়ীর বিয়ে, সেটাত শাঁক বাজিয়ে সারা যাবে না—

মতি ঠাকুর স্মিতহাস্যে কহিলেন, সে না হয় দেখা যাবে, আগে মেয়েটাকে দেখে আসি—

—হ্যাঁ সেই ভাল—কালই যাবেন তা হলে।

—হ্যাঁ, দিনটা ভাল আছে, আর এ সব কাজে দেরী ক'রতে নেই, এই হচ্ছে বিধি।

যাহা হউক পরের দিন প্রত্যূষে মতি ঠাকুর ও সারদা মল্লিক

গোপালের বিবাহ ঠিক করিতে রওনা দিলেন। দ্বিপ্রহরে পাশার আড্ডা বসিল কিন্তু আড্ডা আজ ম্রিয়মাণ, সারদা না থাকায় পাশা জমিল না— অপরাহ্ণের রৌদ্র যখন পশ্চিমের পলাশ গাছের উপর দিয়া নাটমন্দিরের পশ্চিমের অর্দ্ধেক পড়িয়াছে এবং বিচরণান্তে আশ্রিত পাখীগুলি গ্রামে ফিরিয়া আসিতেছে তখন পাশা ছাড়িয়া দিয়া প্রিয়নাথ বলিলেন, থাক্, আজ আর নয়।০

ধীরে ধীরে গল্প আরম্ভ হইল—গল্পের শেষ পরিণতি ভূতের গল্প— পরিশেষে ভূত প্রেত ও তান্ত্রিক সাধনা প্রভৃতির কথা আরম্ভ হইল। প্রিয়নাথ কহিলেন, আমার গুরুদেবের মুখে শুনেছি—তন্ত্র ছাড়া মন্ত্র নাই। তিনি একবার কাশীধামে যাচ্ছিলেন, পায়ে হাঁটিয়া, তখনও কোম্পানীর গাড়ী হয় নাই। পথে যেতে যেতে হঠাৎ এক ভৈরবীর সঙ্গে দেখা—ভৈরবী তার সঙ্গ ধরল। একদিন চল্‌তে চল্‌তে আর পথ ফুরায় না, সন্ধ্যা হ'য়েছে, কোন গ্রামের চিহ্নও নাই, গুরুদেব একটু ব্যস্ত হ'য়ে পড়লেন, তার পরে পশ্চিমে মেঘ ক'রে ঝড় উঠ্‌লো, তিনি ভয়ে ব্যাকুল হ'য়ে ব'ল্‌লেন, কি হবে মা আজ? আজ ত রক্ষা নেই—

ভৈরবী হেসে ব'ললেন, ভয় কি বাবা। এই বটতলায় দু'জন থাক্‌বো। ভিজবে না—

—ভিজলে ত না হয় চলে, কিন্তু সারাদিন হেঁটে না খেলে ত চলে না—

সে হবে, তার জন্যে কি? জগদম্বা সব ব্যবস্থা করবেন। এদিকে মেঘে আকাশ ছেয়ে ফেল্‌লো, ঝড় উঠ্‌লো, ভৈরবী বললেন, এই বটতলাতেই থাকতে হবে বাছা। ভৈরবী বটগাছটার চারিপাশে ঘুরে আসলেন—ঝড়, প্রবল বৃষ্টি, কিন্তু আশ্চর্য্য ভৈরবীর দেওয়া গণ্ডীর মাঝে একফোঁটা বৃষ্টি পড়লো না, গাছের পাতাটি পড়লো না, অথচ আশে-পাশের গাছ ভেঙ্গে উপ্‌ড়ে একাকার হ'য়ে গেল।

পথশ্রমে আমার ঠাকুর হঠাৎ ঘুমিয়ে পড়েন, জেগে দেখেন—গভীর রাত্রি, ভৈরবী ডাকৃছেন—খেয়ে নে বাবা !

দেখেন ভাত, তরকারী, ডাল গরম রয়েছে। এ সব ত কিছুই ছিল না। মাঠের মাঝে ভৈরবী কোথায় এসব পেলে, ভেবে ঠাকুর বললেন, এসব কি বিভূতি মা! পেলে কোথায়? তুমিই ত সাক্ষাৎ জগদম্বা, তুমিই চরণে স্থান দাও, কাশীতে আর কেন যাবো ?

ভৈরবী হেসে ব'ললেন, খেয়ে নে—খেয়ে নে—

ঠাকুর খেয়ে নিলেন—প্রদীপ জ্বলছিল। হঠাৎ তাকিয়ে দেখেন—ভৈরবী আর ভৈরবী নেই—পরমাসুন্দরী যুবতী হ'য়ে, অপূর্ব বেশভূষায় অনিন্দ্যসুন্দর রূপে সম্মুখে বসে আছেন। ঠাকুর ব'ললেন, মা, তুমি কে মা? আমায় ছলনা কর না, বল মা—

ভৈরবী ব'ললেন, কাল ব'লবো। খেয়ে ঘুমো—বুঝলি! ঠাকুর খেয়ে ঘুমুলেন; পরের দিন ভোরে উঠে দেখেন ভৈরবী নেই। কোথাও তার চিহ্ন নেই।

পার্ব্বতী কহিলেন, অমন হয়, তন্ত্রের শক্তি অসাধারণ, যারা অষ্টসিদ্ধি লাভ করেন তারা সবই ক'রতে পারেন। ঐ ত মদনপুরের জয়রাম পাঠক নাকি ভূতের পাল্কী চড়ে শিষ্যবাড়ী যেতেন—আজ আছেন এখানে, কাল ভোরে বিশক্রোশ দূরে দেখা যেত। রাত্রে ভূতের পাল্কী চ'ড়ে মুহূর্ত্তে চলে যেতেন।

হরিপদ কহিল, ও রকম শোনা যায় দাদা, কিন্তু স্বচক্ষে না দেখ্‌লে বিশ্বাস হয় না। এত ঘুরি ফিরি, রাত বেরাতে চলি কিছু ত দেখতে পাইনি—কোনদিন—

হ্যাঁ তবে একবার হ'য়েছিল। একবার আস্‌ছি গোবিন্দ তিলি আর আমি সুজনপুরের হাট থেকে, রাত অনেক হ'য়ে গেল পথে।

জোছনা রাত, ভেবেছিলাম তাহ্‌লে মাসিবাড়ী থাক্‌বো—পথে দেখি একটা ষাঁড় ফোঁস্ ফোঁস্ করছে—হৈ হৈ করে তাড়া দিলাম—কিন্তু নড়ে না, মুখ তুলে তাকালো—দেখি মুখ দিয়ে আগুন বেরুচ্ছে। গোবিন্দ ব'ললে, দাদা নাম জপ করো—গোদান। বললুম, না, ষাঁড় তাড়া দাও—আবার হৈ হৈ করলুম—এবার সেটা তেড়ে এলো। দু'জনে দৌড়, যতই দৌড় দি সে পেছনেই আছে। গোবিন্দ প্রাণপণে ঠাকুরের নাম ক'রছে—

আদাড়ী ঠাকুর অকস্মাৎ আসিয়া উপস্থিত হইল। ভগবতী কহিলেন, ব'সো আদাড়ী। গোদানের গল্প হচ্ছে—

গল্প চলিল—আমিও গায়ত্রী জপ ক'রতে লাগ্‌লাম। একটা জোল ছিল—জলভরা। সেটাকে লাফ দিয়ে পার হয়ে এসে দাঁড়ালুম এক গাছের তলায়; আর ছুট্‌তে পারি না। গোদানটা জলের পাড়ে দাঁড়িয়ে ফোঁস্ ফোঁস্ ক'রলে, তার পর ব'ললে, না ছেড়ে দিলুম—তার পরেই দেখি কিছু নেই—

ভগবতী কহিলেন, স্বচক্ষে দেখ্‌লে?

—দেখলাম মানে? ছুট্‌তে ছুট্‌তে প্রাণ যায়—গোবিন্দর কাছে শুন্‌বেন।

ভগবতী কহিলেন, কি বল আদাড়ী, গোদান কি আছে?

আদাড়ী সোৎসাহে কহিল, আছে বৈকি? অপঘাত মৃত্যু হ'লেই সে প্রেতযোনি প্রাপ্ত হয়—

ভগবতী প্রশ্ন করিলেন, তোমার সেই পেত্নীর ব্যাপারটা কি বল ত আদাড়ী।

—ঐ রকমই, মন্ত্র তন্ত্র কিছু শিখেছিলাম গুরুর কাছে, তাই ওসব ভয় নেই। মন্ত্রবলে ওদের আনা যায়—

—সাক্ষাৎ দেখাতে পারো?

—হ্যাঁ পারি বৈকি ? তবে বেশী লোক থাক্‌লে কাছে ত আস্‌বে না—দূরে দেখান যায়।

—আজ পারবে—

—আজ ? হাঁ মঙ্গলবার আছে, বোধহয় কৃষ্ণা চতুর্থী ভরণী নক্ষত্র। আজ হবে—

—বেশ কখন যাবো—

—এই জোছনা উঠলেই, নইলে ত দেখা যাবে না—

আলোচনায় কথাটা গুরুত্ব লাভ করিল এবং স্থির হইল, জোছনা উঠিলে সকলে আদাড়ীর বাড়ীতে যাইবেন এবং সাক্ষাৎ পেত্নীর আগমন প্রত্যক্ষ করিবেন।

আদাড়ী একটু চিন্তিত হইয়া কহিল, কিন্তু একটি কথা, আমি যেখানে বসিয়ে দেব সে আসন ত্যাগ করে উঠ্‌তে পারবেন না—যখন বল্‌বো তখন উঠ্‌বেন। নইলে আমি আপনাদের প্রাণের জন্য দায়ী নয়—আসন ছেড়ে উঠ্‌লেই ঘাড় মট্‌কে দেবে—আর যাই দেখুন কিছু বল্‌বেন না—চীৎকার করা, কথা বলা, কিছু না। তবে ভয় নেই, আমি থাকতে ক্ষতি হবে না—

প্রিয়নাথ কহিলেন, কতদূরে থাক্‌বে ?

—মাঠের মাঝেই সাধারণতঃ থাকে, তবে চেষ্টা করবো বাড়ীর উঠানের নীচে ওই জামরুল গাছতলা পর্য্যন্ত আন্‌তে পারি—পাশে ঝোপঝাড় আছে হয়ত আসতেও পারে—কারণ আশ্রয় না পেলে ওরা আসে না—

ভগবতী কহিলেন, বেশ তাই। জোছনা উঠ্‌লে যাবো সব—যাবে ত খুড়ো—

—যাব বই কি !

আদাড়ী কহিল, সাত জনের বেশী নয় এবং অশৌচ অবস্থায় যেন কেউ না থাকেন—কাপড় চোপড় ধোয়া থাকা চাই—

*

সমস্ত কথা পাকা হইয়া গেল—

রাত্রি আট দণ্ড হইয়াছে, কৃষ্ণা চতুর্থীর চাঁদ উঠিল। নির্মেঘ আকাশ, কিন্তু শীতের ধূসর পৃথিবীর উপর একটু কুয়াশার আমেজ জোছনাকে ঘোলাটে করিয়া তুলিয়াছে। প্রিয়নাথ আসিয়া সকলকে ডাকিলেন—দর্শক অনেক। ভগবতী সাতজন সাহসী পুরুষ বাছাই করিয়া লইলেন। তন্মধ্যে গোবিন্দ তিলি ও ছিদাম ময়রা স্থান পাইল —তাহারা সাহসী বলিয়া খ্যাত।

সকলে দুর্গানাম স্মরণ করিয়া রওনা দিলেন। কথাবার্ত্তা কহিতে কহিতে চণ্ডীতলার বটগাছ পর্য্যন্ত যাইতেই সহসা একটা হাসির শব্দ শোনা গেল—চণ্ডীতলার নিকটে বসিয়া কাহারা যেন গল্প করিতেছে—

নিকটবর্ত্তী হইতেই কয়েকজন লোক আসিয়া প্রণাম করিল— প্রণাম এতরাত্রে কোথায় যাওয়া হ'চ্ছেন কর্ত্তা—

—আদাড়ী ঠাকুরের বাড়ীতে ভূত দেখ্তে যাচ্ছি—

ভরত সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া কহিল, কর্ত্তা, আমরা ঝোপে-ঝাড়ে থেকে একটু দেখবেন কর্ত্তা। আর পারি ত পেত্নীটা ধরে ফেল্বো —ভরতের মুখ হইতে পঁচুই মদের বিশ্রী গন্ধ বাহির হইতেছে।

ভগবতী কহিলেন, হারামজাদা—কতখানি পঁচুই মেরেছিস্ পাজি— নেশার ঘোরে কেলেঙ্কারী করবি শেষে—

—না হুজুর, আদাড়ী ঠাকুরের সব বুজরুকি কর্ত্তা। লেলো নীলমণি আর আমি যাবেক হুজুর।

পার্ব্বতী কহিলেন, বেশ ত যাক না ওরা ভগবতী খুড়ো। জামরুলতলার ঝোপে থাকবে—দেখবে কেমন পেত্নী। দেখিস্ ভূতে ঘাড় না মট্‌কে দেয়—

নীলমণি কহিল, মরবে ত লড়াই করে মরবে।

ভগবতী আদেশ দিলেন, তবে চল্।

প্রিয়নাথ কহিলেন, এমন তেমন হ'লে আমাদের দোষ নেই কিন্তু, তখন কাঁদতে পারবি নে—

ভরত কহিল, না ঠাকুর মশাই—কাঁদবে কেনে—ভূত পেত্নি কত দেখা করলে—

ভগবতী সপারিষদ আদাড়ীর বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। আদাড়ী সাদরে নানাবিধ আসনে তাহাদিগকে বারান্দায় বসিতে দিল। কহিল, বসুন, আমি আসন শুদ্ধিটা করে দি—

আদাড়ী ঘর হইতে কুশিতে করিয়া একটু একটু জল আসনের নীচে দিয়া, মাথায় একটু জল দিয়া কহিল, ভয় নেই—এ ছাড়াও গাঠরী করে দিচ্ছি—

আদাড়ী ঘর হইতে একটা নরকপাল আনিয়া তাহাতে কি পূজাদি করিল এবং তাহা হইতে একটা একটা ফুল সকলের হাতে দিয়া কহিল, কানে ফুলটা রাখুন, কোন ভয় নেই, তবে আসন ছাড়বেন না। আপনাদের সাম্‌নে আস্‌লেও না। আমি যতদূর কাছে পারি আন্‌বো। আর ভয় হলে ৺কালীর বীজমন্ত্র জপ করবেন, তা হ'লে ভূত হোক, পেত্নী হোক, ব্রহ্মদৈত্য হোক, পরী বা জেন হোক, কিছু করতে পারবে না!

সকলে যথারীতি আসনে বসিয়া আদাড়ীর আদেশ পালন করিল। আকাশে স্তিমিত চাঁদ—স্বল্প কুয়াশার মাঝে প্রতিফলিত হইয়া যেন একটু অস্বচ্ছ হইয়া উঠিয়াছে—প্রহরেক রাত্রি হইয়াছে, গ্রামের রাত্রি। চারিদিকে নিঃশব্দ নিঝুম। দূরাগত বিনিদ্র পাখীর দুই একটা শব্দ হইতেছে—শিবাকুল এক প্রহরের সঙ্কেত জানাইয়া চুপ করিল। আকাশের কোণে কয়েকটা তারকা নিষ্প্রভভাবে পৃথিবীর পানে তাকাইয়া আছে—গাছের পাতাও নড়িতেছে না—বৃহৎ বনস্পতি যেন নিশ্বাস বায়ু সম্বরণ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে—

ঘরের মাঝে আদাড়ী বিড়বিড় করিয়া মন্ত্র পড়িতেছে এবং মাঝে মাঝে একটা বিকট স্বরে মা মা করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিতেছে। অশরীরী একটা মূর্ত্তিকে দেখিবার জন্য অনেকগুলি চোখ চারিদিকে খরদৃষ্টি দিতেছে—

আদাড়ী ঘর হইতে আসিয়া অতি মৃদুকণ্ঠে কহিল, একটু যেন মন্দ গতিক দেখ্ছি, রেগে আছে। তা হোক্—এই শিকড়টা হাতে নিন সব—দেখবেন পায়ে পড়ে না যেন—

সকলের হাতে একটু একটু শিকড় দিয়া আদাড়ী বাঁশী বাজাইতে আরম্ভ করিল। মাঝে একবার কহিল, ঐ পূবের মাঠের দিকে দেখবেন লক্ষ্য করে—

বাঁশী বাজিতেছে—

সকলে স্তম্ভিত হইয়া দেখিলেন—শ্বেতবসনা একটী ক্ষীণাঙ্গী বিধবা মূর্ত্তি ধীরে ধীরে মাঠ অতিক্রম করিতেছে। ক্রমশঃ সুস্পষ্ট বাড়ীর পূবের ঝোপঝাড়গুলির নিকটে আসিয়া মূর্ত্তিটি যেন থামিল।

সকলে রুদ্ধনিশ্বাসে দেখিতেছিলেন—মূর্ত্তি আরও নিকটে—আরও নিকটে জামরুল—গাছের নিকটে সুস্পষ্ট জ্যোৎস্নালোকে আসিয়া দাঁড়াইল। ক্ষীণা তন্বী স্ত্রী, সুঠাম সুন্দর দেহ—কেবল অবগুণ্ঠিত মুখখানি অদৃশ্য। জামরুল গাছের তলায় দাঁড়াইয়া সে এদিক ওদিক একটু ঘুরিল—একবার ঝোপের আড়ালে গেল, আবার আসিল—হাত তুলিয়া কি যেন দেখিল—তাহার পর জামরুল গাছের একটা ডালে উঠিয়া অদৃশ্য হইল—

ভগবতী প্রিয়নাথ প্রভৃতির লোমগুলি খাড়া হইয়া শরীরে ঘনঘন শিহরণ হইতেছে—বারবার চোখ কচলাইয়া দেখিতেছেন ঘটনা সত্য—প্রত্যক্ষ নারীমূর্ত্তি—

আদাড়ী কহিল, যদি এসেছ তবে কেন আরও সাম্নে উঠানে এসো—

জামরুল গাছ হইতে নাকি সুরে উত্তর আসিল, তোরা আটজন যে!

—তা হোক্—তুমি এসো—কি খেতে চাও—

—শোলমাছ পোঁড়া—আজ মঙ্গলবার—

মূর্ত্তি গাছ হইতে নামিয়া উঠানের দিকে আসিতেছিল—অকস্মাৎ বিপুল শব্দ করিয়া দুই তিনজন লোক মূর্ত্তিটিকে আসিয়া ধরিল। কে যেন কহিল, তু কে বল্? বল্—

মূর্ত্তি চীৎকার করিয়া উঠিল—উঃ মারিস্ না তু—

—বল তু শালী কে?

একটা হৈ চৈ আরম্ভ হইলে ভগবতী সদলে উঠিয়া গেলেন। প্রশ্ন করিলেন, কি কি? কে ও?

ভরত কহিল, হুজুর, মেয়েমানুষ বটে?

—কে? কে তু?

মূর্ত্তি কথা বলে না। ভরত তাহার অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিয়া একটা ধাক্কা দিয়া কহিল, বল্না শালী—তু কে!

করুণকণ্ঠে উত্তর হইল, আদুরী!

ভগবতী কহিলেন, আদুরী!

ভরত কহিল, হ্যাঁ কর্ত্তা। নটবরের মেয়ে ছাড় হ'য়ে ঘরে রয়েছেন—

আদুরী ভগবতীর পা জড়াইয়া ধরিয়া তারস্বরে কাঁদিয়া উঠিল—মু নাচার কর্ত্তা—আমি মরবো—

ভগবতী একটু বিপন্ন হইয়া কহিলেন, ব্যাপার কি?

আদুরী কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল, বামুন মানুষ—দেবতা, মোর লেগে বেবাগী হ'য়ে যায়, মু কি করবে? ছোটলোক রাঁড়ী—মোর আর ধরম কি কর্ত্তা?

ভগবতী হাঁকিলেন, আদাড়ী—আদাড়ী—

এতক্ষণে সমবেত জনতা আদাড়ীর প্রতি আকৃষ্ট হইল। বারান্দায় কেহ নাই, ঘরে ঢুকিতে যাইয়া দেখা গেল, ঘরের দরজায় কুলুপ ঝুলিতেছে। আদাড়ী হট্টগোলের মাঝে কোথায় চলিয়া গিয়াছে।

ভগবতী কহিলেন, আহ্লরী আয়, তুই কাল কাছারী যাবি। সব শুনে যা হয় ব্যবস্থা করবো—নীলমণি, যা ওকে ঘরে দিয়ে আয়—

—ওরা মারবেক হুজুর—

—না, মারবে না। তুই যা—

ভগবতীর এই আদেশই যথেষ্ট—আহ্লরী নির্বিঘ্নে ঘরে গেল। ভরত কেবল নেশার ঘোরে কহিল, কাছারীতে দেখবি তু, আশনাই বড্ড ঝাল বটেক।

*

পর দিন সকাল হইতেই কাছারীতে লোক সমাগম হইয়াছে—আহ্লরীর এই ভৌতিক ক্রিয়ার বিচার হইবে। রাত্রেই সংবাদটা দিকে দিকে প্রচারিত হইয়াছে। ভগবতীর আজ আর গ্রাম পরিক্রমায় যাওয়া হয় নাই। ভগবতী বাড়ীর ভিতর হইতে প্রস্তুত হইয়া কাছারীতে যাইতেছিলেন—আহ্লরী বাড়ীর পিছনের দরজা দিয়া আসিয়া পায়ের কাছে পড়িল। সে কাঁদিতে কাঁদিতে নিবেদন করিল যে কাছারীতে অত লোকের সাম্‌নে সে কিছু বলিতে পারিবে না।

ভগবতী বুঝাইয়া বলিলেন যে তাহা হয় না। বিচার যখন হইবে কথা হইয়াছে তখন কাছারীতে যাইতে হইবে, তবে ঘরের মাঝে তিনি লোক থাকিতে দিবেন না। সকলে বাহিরের বারান্দায় থাকিবে।

তাহাই হইল। ঘরের মাঝে ভগবতী ও দুই একজন গ্রামের প্রাচীন লোক রহিলেন, বাহিরে জনতা অপেক্ষা করিতে লাগিল।

ভগবতী কহিলেন, কতদিন তোরা এমনি করছিস্ ?

আহুরী চোখে আঁচল দিয়াই ছিল, সে আর্দ্রকণ্ঠে কহিল, দেড় বছর—

—আদাড়ী ঠাকুরের সঙ্গে আশনাই কেন হ'ল ?

—কর্ত্তা, উ বেবাগী হ'য়ে যায়, বামুন ঠাকুর মোর তরে কাঁদে, মু কি করবো বল না। দেহ ত ছাই হবেকই, তার তরে বামুনকে কাঁদাবো কেনে, তাই—

ভগবতী বুঝিলেন, ব্রাহ্মণ-তনয়কে কাঁদাইতে পারে না বলিয়াই আহুরী আপনার দেহের পবিত্রতা রক্ষা করে নাই—সে দেহ ত একদিন ভস্মীভূত হইয়া যাইবেই।

—তা না হয় হ'ল। পেত্নী সেজে ওরকম করিস্ কেন ?

আহুরী মুখ তুলিয়া কহিল, পেত্নীর ভয় হলে ওদিক পানে লোক যাবেক নাই, তাই ঠাকুর বললে। যেমনটি বললেক—মু তেমনটি করলেক—

—ও আদাড়ী শিখিয়ে, তোকে দিয়ে এসব করেছে। বাঁশী বাজালে যেতে হবে না ?

—হ্যাঁ কর্ত্তা, এক এক গানের এক এক বার্ত্তা, কর্ত্তা।

অর্থাৎ বিশেষ কোন গানের কলি বাজাইলে বিশেষ কোন কাজ করিতে হইবে, এইরূপ নির্দ্দিষ্ট ছিল।

—কতদিন তোর ছাড় হ'য়েছে ?

—দু' বছর—

—তুই সাঙ্গা করবিনে—

—আপনি হুকুম দিলে করবো—

—তোকে কেউ সাঙ্গা করতে চায় নি ?

—হ্যাঁ কর্ত্তা, ভরত ত কতদিন বল্‌ছে—

—তাকে সাঙ্গা করবি ?

—করবো।

—আর কাউকে তোর পছন্দ হয়ত বল—

—না ভরতকেই মু সাঙ্গা করবো—

ভরতকে ডাকিয়া আনিয়া সমস্ত কথা বলা হইল। ভরত কহিল, উ বলে, ঠাকুরের ওখানে যাবেই, মু কিছু ব'লবো না—

আদুরী করুণ আঁখি মেলিয়া একবার ভরতের দিকে চাহিল—যেন বলিল—লাঞ্ছনা ত যথেষ্টই হইয়াছে আর কেন ?

ভগবতী প্রশ্ন করিলেন, ভরতকে সাঙ্গা করেও কি তুই ঠাকুরকে ছাড়বি না—

আদুরী চোখে আঁচল দিয়া চুপ করিল। কোন জবাব দিল না—

—কি করবি বল—

আদুরী একবার ভরতের পানে আকুলভাবে তাকাইয়া কহিল, ঠাকুর যদি ডাকে মু কি করবো—

ভরত কিছু বলিল না এবং ভগবতীও যেন কেন একথাটার মীমাংসা করিতে চাহিলেন না। ভগবতী শুধু কহিলেন, ঠাকুর ত নিরুদ্দেশ হ'য়েছে—ফিরবে কি ফিরবে না কে জানে! তা আদুরী সাঙ্গা করতে কি চাস্ ?

আদুরী সগর্ব্বে কহিল, মু ত টাকা সাঙ্গা করবো না কর্ত্তা, মানুষ সাঙ্গা করবো।

আদুরীর কথাবার্তায় ভগবতী কেমন যেন একটু সমবেদনা বোধ করিতেছিলেন। তিনি কহিলেন—সেই ভাল। যা সাম্‌নের সোমবার দিন আছে, সাঙ্গা হবে।

ভগবতীর আজ্ঞা জনতার মাঝে প্রচারিত হইল। তাহারা সকলে ব্যবস্থা অনুমোদন করিল। নটবর ও বাগ্দীপাড়ার মোড়ল সাঙ্গা দিবার

ভার গ্রহণ করিল। ভগবতী সংক্ষেপে জনতাকে বলিলেন, সাঙ্গা অভাবে চাষ আবাদ করিতে পারিতেছে না। দুজনে মনের মিলও আছে, অতএব এই ব্যবস্থাই সমীচীন।

অতএব তাহাই স্থির হইল।

*

মতি ঠাকুর মেয়ে দেখিয়া আসিয়াছেন। গোপালের বিবাহের সব ঠিক হইয়া গিয়াছে। মাঘ মাসের প্রথমেই দিন হইয়াছে।

ভগবতী কহিলেন, বেশ বেশ, এখন জোগাড় করুন। ধরুন একশ' খানা গাড়ী যাবে, আড়াইশ বরযাত্রী। আর দুখানা গাড়ীতে থাকবে চিঁড়ে গুড় মুড়ি, আর বাজনাদার দুখানা গাড়ী, আর একখানা বরের—তা হ'লে একশ পাঁচ খানা। গাড়োয়ান একশ' পাঁচ আর বাজনাদার দশ, আর বরযাত্রী দু'শো—তিনশ' দশ—তাই হবে—

মতি ঠাকুর হাসিয়া কহিলেন, এ যে রাজসিক ব্যাপার।

ভগবতী হাসিয়া কহিলেন, বটেই ত, বিবাহ জিনিষটাই ত রাজসিক। সব হ'য়ে যাবে কোন চিন্তা নাই—

মতি ঠাকুর উৎসাহিত না হইয়া চিন্তিত হইয়াই ফিরিলেন। কন্যা উচ্চ সমাজে দিতেছে বলিয়া কন্যাপক্ষ পণ চায় নাই, কিন্তু আটভরি গহনা দিতে হইবে এবং বেনারসী সাড়ী।

বাড়ীতে আসিয়া তিনি চিন্তিত হইয়াই বসিয়াছিলেন। গৃহিণী কহিলেন, ঠাকুরপোর বিয়ে ঠিক ত করলে। ঘরে ত মা নেই, আমিই ত বৌ বরণ করে ঘরে তুল্‌বো, কিন্তু মুখ দেখ্‌বো কি দিয়ে!

ঠাকুর মশায়ের মনে এ প্রশ্ন ছিল, কিন্তু কোন জবাব দিলেন না।

গৃহিণী কহিলেন, ওর মা নেই, মার কাজ আমাকেই ক'রতে হবে ত? বাজু আর অনন্ত ভেঙ্গে একটা কড়ি-হার করে দাও।

—তোমার বাজু আর অনন্ত—

—তবে আর কার? আমিই ত মানুষ করলাম গোপালকে, কে আর আজ দেবে?

মতি ঠাকুর মশায় কহিলেন, তা দেবে বৈ কি? খেয়ে ত আনন্দ নেই, খাইয়ে আনন্দ—নিয়ে আনন্দ নেই, দিয়েই ত আনন্দ—রামচন্দ্র বড় ভাই বলেই ত এত লাঞ্ছনা।

—যাহোক্, জনার্দ্দনকে ডেকে দিয়ে যাও।

—আচ্ছা দেব—

গৃহিণী কার্য্যান্তরে চলিয়া গেলেন।

মাঘের ১৮ই বিবাহ স্থির হইয়া গিয়াছে। মতিঠাকুর একটু চিন্তান্বিত হইয়াছেন সত্য, কিন্তু তাহার বিশ্বাস আছে ভগবান যেমন করিয়াই হোক চালাইয়া দিবেন, কতবার এমনি বিপদ আসিয়াছে ভগবানই বিপদমুক্ত করিয়া দিয়াছেন।

আজ সকাল সকাল খাইয়া বিশ্রাম করিতে হইবে। পাঁচ ক্রোশ দূরে রাজনগরে কাল রাত্রে একটা বিবাহ আছে। মতি ঠাকুর স্নানের জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন, গোপাল আসিয়া কহিল, দাদা, রাজনগরে আমি গেলে হয় না—

—তুই যাবি কেন্?

—আপনি এত রাস্তা হেঁটে এলেন তাই ব'লছিলাম।

—তুই ছেলে মানুষ, তোকে পুরুত বলে মান্‌বে কেন?

গোপাল তবুও প্রতিবাদ করিল—না গেলে কাজ শিখ্‌বো কি করে? দশ জায়গা না গেলে পরিচয়ই বা হবে কি করে?

মতি ঠাকুর কহিলেন, আচ্ছা ভেবে দেখি—

গোপালের যুক্তি নেহাৎ উপেক্ষার নয়, তাহারও বয়স হইয়াছে। পরিশ্রম করিতে পারেন বটে, কিন্তু সেটা আর সহজসাধ্য নাই। তিনি ভাবিয়া চিন্তিয়া গোপালকেই অপরাহ্ণে যথাযথ উপদেশ দিয়া পাঠাইয়া দিলেন।

সারদা ডাকিয়া গেল—চণ্ডীমণ্ডপে যাইবেন এমন সময় পলাশপুরের মথুর চক্রবর্ত্তী আসিয়া উপস্থিত। বিবাহের জোটক বিচার করিতে। জোটক বিচারান্তে মথুর কহিল, গোপালের বিবাহ ঠিক করেছেন শুনলাম—

—হ্যাঁ ঠিক ত করেছি।

—দেনা পাওনা ?

ঠাকুর মহাশয় সমস্ত বিবৃত করিলে মথুর কহিলেন, এতে চিন্তিত হবেন কেন ? আমরা রয়েছি। আপনার কাজ ত আমাদেরই। আর ব্রাহ্মণের বিবাহে দান, এ ত পরম সৌভাগ্য।

মথুর অবস্থাপন্ন মৌজাদার, তাহার কথায় ঠাকুর মশায় অনেকটা আশ্বস্ত হইলেন।

এমনি করিয়া যজমান, শিষ্য সকলেই তাঁহাকে জানাইল—তাঁহার কোনও চিন্তার কারণ নাই।

রাজনগরের বিবাহান্তে মতি ঠাকুর শুনিলেন, গোপালের খুব নাম হইয়াছে। বরপক্ষের পুরোহিত গোপালকে ছেলেমানুষ ভাবিয়া নানারূপে বিব্রত করিতে চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু গোপালের নিকটে বিচারে সর্ব্বদা পরাস্ত হইয়াছে। গোপাল সেজন্য উভয় পক্ষ হইতেই দক্ষিণা পাইয়াছে। শুনিয়া মতি ঠাকুর সুখী হইলেন—ভ্রাতা ও শিষ্য হিসাবে গোপাল যে তাহার নাম রাখিয়াছে ইহা নিঃসন্দেহে আনন্দের সংবাদ।

*

দেখিতে দেখিতে বিবাহের দিন আসিয়া উপস্থিত হইল। বিবাহের পূর্ব্বদিন মতি ঠাকুর সংবাদ পাইলেন, ভগবতী একশত দশখানা গাড়ীর বন্দোবস্ত করিয়াছেন এবং দুইদল বাজনাদার ঠিক করিয়াছেন। মতি ঠাকুর ব্যস্ত হইয়া ভগবতীর নিকট যাইয়া একটু বিরক্তির সঙ্গে কহিলেন, এ সব কি করছ ভগবতী, একশ গাড়ী, দু'শ বরযাত্রী—এ কি আমি নিতে পারি। তোমরা দশজনে যা দেবে, তাই নিয়ে ত সব করা—

ভগবতী হাসিয়া কহিলেন, তা ত হ'ল, কিন্তু যখন লোকে বল্‌বে ভগবতী চাটুয্যের পুরুত-বাড়ীর বিয়ে—যাচ্ছে তিনখানা গাড়ী টঙ্গস্‌ টঙ্গস্‌ করে, তখন আমার মুখ্‌ ত ছোট হবে। সেটাই বা কেমন করে হতে পারে বলুন—আমার সব প্রজারা গাড়ী নিয়ে যাবে—যাতায়াতের খাইখরচ আমার—সেখানে ত ওরাই খাওয়াবে, কাজেই আপনার ভাবনা নেই—আপনি এখন বরযাত্রী নিমন্ত্রণ করুন।

মতি ঠাকুর কহিলেন, তুমি যাবে ত ?

—তা না হলে এদিকে কে দেখ্‌বে বলুন ? আপনার গয়না, দান-পত্র, কাপড় সব ঠিক আছে ত ?

—হাঁা—

—তবে আর ভাবনা কি ? বৌভাত ? সে পরে দেখা যাবে।

*

রাত্রি দণ্ড কয়েক থাকিতে গাড়ী রওনা দিবে, তাহা হইলে ঠিক সন্ধ্যায় কন্যার বাড়ীতে পৌছান যাইবে। গ্রামের সমস্ত বাগ্দী, বাউরী,

ধাঙ্গর, কুর্মী প্রজারা গাড়ী ও গরুর খাদ্য লইয়া দ্বিপ্রহর রাত্রে গ্রামের সড়কে দাঁড়াইয়াছে। মাঝে মাঝে রেড়ির তেলের মশাল জ্বলিতেছে। ভগবতী হাঁক দিলেন—নীলমণি গাড়ী গুণ্‌তি কর্—

নীলমণি গাড়ী গুণ্‌তি করিয়া আসিয়া কহিল, ছয় কুড়ি বার খানা—

—এত গাড়ী কি হবে রে? বরযাত্রী হল মাত্র একশ—

ভগবতী কহিলেন, যারা যেতে চাস্ না তারা বল্—

কেহই কথার জবাব দিল না। ভগবতী সাম্‌নে রতন বাগ্দীকে পাইয়া কহিলেন, রতন, তোরা আর যাস্ না—

রতন হাতজোড় করিয়া কহিল, তা কি হয় কর্ত্তা, ঠাকুরমশার বাড়ীর বিয়ে আমি যাবো না—পলাশডাঙ্গায় দশখানা গাড়ী অন্ততঃ যাবে না! তা কি হয় কর্ত্তা—

ভগবতী চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কেহই ফিরিয়া যাইতে সম্মত নয়। তাহারা কিছু পারিশ্রমিক পাইবে না তাহা তাহারা জানে, কিন্তু কর্ত্তব্য হিসাবে এটা না করিলে লোকনিন্দা হইবে। অতএব শেষ পর্য্যন্ত সকলেই যাইবে স্থির হইল।

রতন কহিল, ঠাকুরমশার বাড়ীর বিয়েতে যাবেক নেমন্তন্ন খাবেক—এতে বঞ্চিত ক'রবেক কে?

কে যেন কহিল, হ্যাঁ বটেক—গোপালদাদার বিয়ে—

শীতের প্রত্যূষে একশত বত্রিশখানি গাড়ি শোভাযাত্রা করিয়া গ্রাম হইতে বাহির হইল। পিছনে তিনখানা গাড়ীতে চিড়া মুড়ি, চাউল, গুড়, ডেগ ডেগচি চলিতেছে। সকালে মুড়ি চিড়া, দ্বিপ্রহরে রাজনগরের ডাঙ্গায় খিচুড়ী ও সন্ধ্যায় পুনরায় মুড়িগুড়—ইহাই বরযাত্রীর খাদ্য—ভদ্র ইতর নির্ব্বিশেষে। মাঝে মাঝে একটা হৈ চৈ শব্দ তুলিয়া তাহারা চলিয়াছে—দুইখানা গাড়ীতে বসিয়া বাজনদারগণ শানাইসহ ঢোলের কসরত করিতেছে। গ্রাম্য বধূগণ সলজ্জ দৃষ্টিতে এই দীর্ঘ গো শকটের

শোভাযাত্রা দেখিয়া বিস্মিত হইতেছে—বর দেখিবার জন্য উন্মুখ হইয়া বরের গাড়ী খুঁজিতেছে।

*

বিবাহান্তে সকলে ফিরিল—লোকের মুখে মুখে সারদার কীর্ত্তি, কি করিয়া বরের টোপর পরিয়া গ্রাম্যবধূগণকে ডাকিয়া নিজেকে বর বলিয়া পরিচয় দিয়াছে, মুড়ি খাইবার জন্য নূন লঙ্কা সংগ্রহ করিয়াছে, খিচূড়ী রাঁধিবার কাঠ ভাঙ্গিতে যাইয়া সকলকে ভালুকের ভয় দেখাইয়াছে, কন্যার বাড়ীতে স্ত্রীলোক সাজিয়া বাসর ঘরে ঢুকিয়া মার খাইতে খাইতে বাঁচিয়া গিয়াছে। লোকে সারদার কীর্ত্তি কাহিনী শুনিয়া হাসিয়া গড়াইয়া পড়িয়াছে। কন্যাপক্ষ খুব খাওয়াইয়াছে—লোকও খাইয়াছে সহস্রাধিক।

বৌভাতও সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে—গোপালপুর ও পলাশডাঙ্গায় সমস্ত ইতরভদ্র মতি ঠাকুর মশায়ের বাড়ীতে খাইয়াছে—মোটা তরকারী ডাল, মাছ ও চাটনি দিয়া। পায়স হয় নাই, তবুও ভুরি-ভোজনই হইয়াছে। ভগবতী নিজে খাইতে বসিয়া রান্নার তারিফ করিয়াছেন।

বিবাহের ভোজন ও সারদার কীর্ত্তি গোপালপুরের ইতিহাসে অক্ষয় হইয়া আছে।

*

মাঘী পূর্ণিমা।

খয়রাশোলে বড় মেলা হয়। ভরত ও আদুরী মেলায় যাইবে ঠিক করিয়াছিল। ভরত ও আদুরীর সাঙ্গার পরে ভৌতিক ব্যাপারটা লইয়া বিশেষ কেহ আর আলোচনা করে না। আদুরী সংসারের কাজ করে,

ভরত চাষ-আবাদের জন্য আর চিন্তিত নাই—ঘরে বৎসরের খাদ্য মজুত, মাঝে মাঝে পঁচুই না হয় মহুয়ার মদ খাইয়া দুইজনে গান করে—ভরত সেইজন্য একতারা তৈয়ারী করিয়াছে। আদাড়ী ঠাকুর সেইদিন রাত্রে সেই যে নিরুদ্দেশ হইয়াছে আর আসে নাই। আদুরী মাঝে মাঝে তাহার কথা না ভাবে এমন নয়—আদাড়ীকে তাহার জন্যই দেশান্তরী হইতে হইয়াছে। কিন্তু ভরতের অপরিসীম স্নেহ ও যত্ন যেন সে ক্ষতস্থানটাকে নিরন্তর হাত দিয়া ঢাকিয়া রাখে—

মেলায় কয়েকটা সাংসারিক জিনিষ কিনিবার প্রয়োজন ছিল—যথা, খই মুড়ি ভাজিবার খোলা হাঁড়ি, লোহার হাতা-খুন্তি, কয়েকটা জিনিষ রাখিবার হাঁড়ি, কুলো প্রভৃতি। ভরতের মনে মনে ইচ্ছা ছিল একখানা রঙীন ডুরে শাড়ী আদুরীকে কিনিয়া দিবে। দুইজনে সকালে খাইয়া ছেলেটিকে সঙ্গে লইয়া মেলায় রওনা দিল—.

খয়রাশোল ক্রোশ দেড়েক রাস্তা—যাইতে সামান্য সময়—মেলায় মিষ্টির দোকান, তাঁতিদের দোকান, কামার কুমোরের দোকান সারি সারি রহিয়াছে—

মেলায় পৌছিতেই ছেলেটা একখানা বড় পাঁপর ভাজা পাইয়া খাইতে আরম্ভ করিয়াছে এবং বিস্মিত দৃষ্টিতে চারিপাশে চাহিতেছে। বাদ্য সহকারে মেলাস্থলে ৺গোবিন্দজীউ আসিলেন, কুলবধূগণ শাঁখ বাজাইয়া পিছন পিছন আসিলেন—তাহার পিছনে আম্রবনের মাঝে ঝুমুর গান গাহিতেছে মেয়েরা। তন্বী শ্যামা স্বাস্থ্যবতী বাউরী ও সাঁওতাল মেয়েরা—সেখানে যুবকগণের ভীড়। তাহার পিছনে কতকগুলি ছোট ছোট কুঁড়ে ঘর—সারি সারি। সেখানে ভীড় নাই কিন্তু গোপনীয় একটা নিঃশব্দতা রহিয়াছে। আদুরী কহিল—উ কি ভরত?

ভরত একগাল হাসিয়া কহিল, তু, জানিস্ না?

—না।

—মেয়েমানুষ—ব্যবসা করবে তাই মেলায় এসেছে। ভরত আর একবার হাসিল। আতুড়ী থু করিয়া খানিক থুথু ফেলিয়া কহিল, গলায় দড়ি দেয় না কেনে ?

ভরত রসিকতা করিল—তু চল, দেখবি—

—ছিঃ—মু যাবো কেনে ?

মেলায় দ্রষ্টব্য দেখিয়া তাহারা মিষ্টির দোকানে কিছু খাইয়া একটু জিরাইয়া সওদা করিতে বাহির হইল—প্রথমেই দেখে একটী দোকানে বড় ভিড়—কোন মতে মাথা গলাইয়া দেখিল—লণ্ঠন বিক্রয় হইতেছে। চারকোণা কাচে ঢাকা—ঝড়ে নেভে না বলিয়া দোকানদার ক্রেতাদিগকে আহ্বান করিতেছে—

ভরত কহিল, বড় ভাল জিনিষ বটে আতুরী—রাতে মাছ ধরবেক আম কুড়াবেক—কেরাচিন্ তেল্ ত হাটে হাটে মিল্‌বেকই—

আতুরী কহিল, হাঁ হাঁ, কেন কেনে—

ভরত কোন কিছু চিন্তা না করিয়া লণ্ঠন কিনিয়া ফেলিল—তুইজনে লণ্ঠনটা নাড়িয়া-চাড়িয়া তারিফ করিয়া আবার চলিল—কাপড়ের দোকানের দিকে—তাঁতির দোকানে তেমন ভীড় নাই কিন্তু একটী দোকানে খুব ভীড়—সুন্দর মিহি কাপড় নক্‌সা-পাড় বেশ সস্তা বিক্রয় হইতেছে, বিলাতী কাপড় সুন্দর মসৃণ। ভরত বিস্ময়ে কহিল, কি সুন্দর রে আতুরী—লিবি ?

—লুবো—নকসা পাড় লে একটী—

ভরত নক্‌সা-পাড় একখানা পাছা-পাড় কাপড় কিনিয়া আতুরীর হাতে দিল—সুন্দর মিহি কাপড়—আতুরী হাতে করিয়া খুশী হইল—ভরতের কাঁধে হাত দিয়া ক্রীড়াভঙ্গি সহকারে কহিল, তু দিলি ?

—হ্যাঁ—তু মোর সাঙ্গা—

আহুরী হিহি করিয়া অনেকক্ষণ হাসিল—কৃতজ্ঞতায় এবং ভরতের স্নেহের মর্য্যাদা রক্ষার্থে। তু মোকে ভালবাসিস্—

—হ্যাঁরে—

মেলায় ঘুরিতে ঘুরিতে বেলা পড়িয়া আসিল—সন্ধ্যার শীতের আমেজ দিতেছে। ভরত কহিল, পয়সা ত আর নেই রে আহুরী, হাঁড়ি ও হবেক না—

—খোলা হাঁড়ি—আর হাতা ত লাগবেকই রে! মুড়ি ভাজবেক কিসে? ভাত রাঁধবেক কেমনে—

—চল—

মেলা খুঁজিয়া কোন মতে একটি খোলা হাঁড়ি ও হাতা কিনিতেই ভরতের অর্থ নিঃশেষ হইয়া গেল। মেলার প্রান্তে মহুয়ার মদের দোকান, ভরত তৃষ্ণার্ত্তভাবে তাহার দিকে তাকাইল—আহুরী তাহার দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া বুঝিল ভরত বড়ই ব্যথিত হইয়াছে; মেলায় আসিয়া সে পান করিতে নাই। আহুরী কহিল, কিছু নেই রে ভরত!

—না, সব ত খরচ হ'য়ে গেল—চল্—কুলো হাঁড়ি পরে কিনবেক বক্রেশ্বরের মেলায়, চল্—

আহুরী ও ভরত সন্ধ্যায় বাড়ীতে আসিয়া পৌছিল কিন্তু মেলার পরে ফিরিয়া যেমন আনন্দ হয় তেমন কিছু হইল না—ভরত বিষণ্ণভাবেই দাওয়ায় বসিয়া রহিল—আহুরী নতুন শাড়ীর কথা ভুলিয়া গিয়া গৃহের পানে চাহিয়া দেখিল সংসারের প্রয়োজনীয় কিছুই আসে নাই।

*

সাম্‌নে দোল—ভগবতীর পৈতৃক দোলের উৎসব আছে তাহাতে একটা ছোটখাটো মেলা হয়—ভোজনাদি ব্যাপারেও ব্যয় আছে—

ভগবতী ও মতি ঠাকুর সকালে বসিয়া দোলের ফর্দ্দ ও করণীয় ঠিক করিতেছিলেন। প্রিয়নাথ এককোণে বসিয়া গড়গড়া টানিতে টানিতে নানারূপ প্রস্তাব দিতেছিলেন। হঠাৎ তাহারা লক্ষ্য করিলেন—বৈঠকখানার আলিশায় বসিয়া আছে নব তাঁতিসহ আরও কয়েকজন, শীতল কুমার, গোবিন্দ তিলি। তাহাদের মুখ বিষণ্ণ, একটা কিছু হইয়াছে—

ভগবতী তাহাদের দিকে চাহিয়া কহিলেন, কি নব, গোবিন্দদা কি ? তোমাদের মুখের চেহারা যেন কেমন মনে হ'চ্ছে—

নব কহিল, হঁ্যা কর্ত্তা। শীতকালের মেলায়ই আমরা যা হয় দু'পয়সা বেচে পেটের ভাত পাই, কিন্তু মেলায় নতুন বিলাতি কাপড় আমদানী হ'য়েছে—আমাদের বিক্রি বন্ধ, সবই প্রায় ঘরে ফিরে এসেছে, এখন আপনি একটা ব্যবস্থা না করলে অনাহারে মরতে হয়—কর্ত্তা আপনার দুয়োর ধরে চৌদ্দপুরুষ কাটিয়েছি—

শীতল কুম্ভকার কহিল, মেলায় লণ্ঠন, কাপড় আর বিলিতি সব বাসন কিন্‌ছে লোকে—এনামেল না কি ? হাঁড়ি ত কেউ কেনে না— আমরা কি করে বাঁচবো কর্ত্তা—

গোবিন্দ তিলি কহিল, রেড়ির তেলের ঘানিটা ত বন্ধ হ'তে চলেছে কর্ত্তা—কেরাচিন দিয়ে সব লণ্ঠন ল্যাম্পো জ্বলেছে, আমরাই বা কি করি কর্ত্তা ?

ভগবতী সমস্ত শুনিয়া চুপ করিয়া রহিলেন—মানুষে আকস্মিকভাবে যদি দেখে বিরাট প্লাবন আসিতেছে, ঘরদুয়ার মানুষজন ভাসাইয়া লইয়া যাইবে তখন মুখখানার চেহারা যেমন হয় ভগবতীর মুখখানাও তেমনি বিশুষ্ক হইয়া গেল। তাঁহার মনে হইল—এই প্লাবনে তিনি ডুবিবেন— দেশ ভাসিয়া যাইবে। দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ ভগবতী আকস্মিকভাবে নিজেকে যেন অত্যন্ত অসহায় মনে করিলেন। তিনি জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে মতি ঠাকুরের দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিলেন, ঠাকুর মশায়—

মতি ঠাকুর দিব্যচক্ষে অনেকখানি দেখিয়া ফেলিয়াছেন। কল্পনায় অনুভব করিয়াছেন, কুলুর ঘানি বন্ধ হইয়াছে, তাঁত বন্ধ হইয়াছে, কুম্ভকারের চাকা অচল হইয়াছে—দেশে বুভুক্ষিত জনগণ ভিক্ষাপাত্র হস্তে দ্বারে দ্বারে ঘুরিতেছে। মতি ঠাকুর দীর্ঘশ্বাস নিষ্ক্রান্ত করিয়া কহিলেন, কি ভগবতী!

—কি করা যায়?

মতি ঠাকুর ক্ষণিক চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন, কি করা যায়? আমি ভেবে পাচ্ছি না ভগবতী। সকলেরই যদি এই হয় তবে তুমি একা —একা তুমি ক'জনকে রক্ষা করবে। আমার মনে হচ্ছে—ভাঙ্গন ধরলো, এ ভাঙ্গন কতদূর যাবে কে জানে—সুখের সংসারে আগুন লাগলো—নীলকুঠীতে ধানচাষ বন্ধ হয়ে দুর্ভিক্ষ হ'তে চলেছিল, আর এখন সব শিল্পই ত ভেসে যাবে নতুন ভাঙ্গনে—

ভগবতী কহিলেন, কিন্তু গোবিন্দদা, নৈব এরা না খেয়ে মরবে আমরা বেঁচে থাকৃতে তাই বা হয় কি করে? তবে আর আমার জমিদারী করে লাভ কি? আচ্ছা গোবিন্দদা, দোলের মেলায় কোন বিলিতি জিনিষের দোকান বস্‌তে দেব না—তোমাদের দোকানই থাকবে—লণ্ঠনও বেচতে' দেব না—

মতি ঠাকুর হাসিয়া কহিলেন, তুমি না হয় দোলের মেলায় ঠেকালে, কিন্তু তোমাদেরই সকলে অন্য মেলা থেকে কিনে আন্‌বে তুমি কি করবে —ভয়ে ডরে না হয় দু'দিন শুন্‌লো তার পর?

—তার পর? ততদিন ত বেঁচে থাকবো না, যা হয় হবে!

মতি ঠাকুর কহিলেন, সে ত হ'ল, আমিও ত বলে দিয়েছি, বিলাতী কাপড় গামছায় কোন দেবকার্য্য বা প্রেতকার্য্য হবে না। স্বাধভক্ষণ, এঁয়োতি কোন কাজেই লাগ্‌বে না,—কারণ ম্লেচ্ছ কৃত কাপড় দৈবকার্য্যের অনুপযুক্ত কিন্তু ক'দিন ভগবতী?

উভয়েই সহসা নীরব হইয়া গেলেন—তাহাদের চেষ্টা যে ব্যর্থ হইবেই সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। মতি ঠাকুর ভবিষ্যতের দৃশ্য ভাবিয়া অত্যন্ত বিষন্ন হইলেন, এবং প্রায় অশ্রুপ্লুত চোখে কহিলেন, ভগবতী আর রক্ষা নেই, ভাঙ্গন ধ'রেছে এখন প্লাবনে সকলের প্রাণই যাবে? তবুও তৃণটিকেও সম্বল ক'রতে হবে, উপায় কি?

গোবিন্দ ত্রিলি কহিল, কোম্পানী রেলগাড়ী খুলেছে, বর্দ্ধমানের কাছে আমার ভায়রা বাড়ী—গাড়ীতে সব মালই চলে যাচ্ছে কলকাতা—দাম সব ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে—

নব কহিল, রেলগাড়ী দেখেছ গোবিন্দদা?

—না, শুনেছি। এবার গেলে দেখে আস্‌বো—সে নাকি বিরাট দৈত্যের মত, হুস্ হুস্ করে চলে—হাজার মণ মাল নিয়ে অক্লেশে চলাফেরা করে—

—বল কি? হাজার মণ?

—হ্যাঁ, হাজার হাজার মণ মাল, অন্ততঃ দু'শো গরুর গাড়ীর মাল ত নেবেই—

কথাটায় বিশেষ কেহ কান দিলেন না। ভগবতী গম্ভীর হইয়া রহিলেন, কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া কহিলেন, আচ্ছা যাও গোবিন্দদা, দোলের মেলাটা দেখ—আমি থাকৃতে না খেয়ে মরবে না—যাও—

একটা ভরসা পাইয়া সকলে চলিয়া গেল। মতি ঠাকুর বলিলেন, ওরা ত তোমার ভরসা পেয়ে চলে গেল কিন্তু আমি ত কোন ভরসাই দেখছি না ভগবতী। কি হবে? দেশের কি অবস্থা হবে? বল্‌তে পারো—

ভগবতী কহিলেন, জানি না, তবে চাঁদুকে ইংরাজি পড়াব ভাবছি। নতুন বিদ্যা নিয়ে হয়ত সে কিছু সমাধান করতে পারবে।

—হ্যাঁ চাঁদু বেশ ছেলে—পণ্ডিতের মুখে শুনেছি খুব বুদ্ধিমান আর

স্মরণ শক্তিও যথেষ্ট। শশধর ত যা হোক জমিদারী দেখা-শোনাটা শিখে নিয়েছে প্রায়—চাঁদু যদি নতুন বিদ্যায় দেশকে রক্ষা ক'রতে পারে—

—হ্যাঁ, দেখি। গোপালপুরে মাইনর স্কুলে পাশ করলে সদরের জেলা স্কুলেই পাঠাবো ভাবছি।

প্রিয়নাথ গড়গড়া হস্তান্তরিত করিতেই ভগবতী উহাতে মনোযোগ দিলেন। মতি ঠাকুর উঠিয়া পড়িলেন—তাহার নিত্য দেবসেবার সময় হইয়া আসিয়াছে।

*

দোলের মেলায় ভগবতী বিদেশী কোন দ্রব্য বিক্রয় হইতে দেন নাই সত্য কিন্তু নতুন নতুন জিনিষের দোকান না থাকায় মেলাও জমে নাই। ভিন্ন গ্রাম হইতে সামান্য লোক আসিয়াছে, যাত্রা কথকথা ও রামায়ণ শুনিয়া চলিয়া গিয়াছে। ক্রয়-বিক্রয় উল্লেখযোগ্য কিছু হয় নাই তবে আপাততঃ অন্যান্য মেলা হইতে বিক্রয় ভালই হইয়াছে এবং মতি ঠাকুর মশায়ের আদেশ অনুসারে গ্রামে বিলাতি কাপড়ে কোন দৈব্যকার্য্য হইতে পারিবে না শুনিয়া লোকে অন্ততঃ ধর্ম্মকার্য্যের জন্যও তাঁতের কাপড় কিনিয়াছে। আপাততঃ নব গোবিন্দ শীতল প্রভৃতি কিছুটা আশ্বস্ত হইয়াছে।

মতি ঠাকুর একদিন ভগবতীকে কহিলেন, ভগবতী একটা কাজ করা দরকার, দিগর গ্রামের পণ্ডিতদের একদিন ডাকো—তাঁতিদের বাঁচাতে হ'লে সব পণ্ডিত একমত হ'য়ে একটা ব্যবস্থা দেওয়া দরকার, —অন্ততঃ পূজায় মাটির জিনিষ ও রেড়ির তেল প্রভৃতির ব্যবস্থা চাই—

ভগবতী দেখিলেন কথাটা সমীচীন, তিনি কহিলেন, ভালই ত

মায়ের বার্ষিক শ্রাদ্ধের তিথিটা ত চৈত্রের প্রথমে। ঐদিনই সব নিমন্ত্রণ করি, কি বলেন?

—হ্যাঁ, সেই ভাল।

যথাসময়ে ভগবতী নিমন্ত্রণের ব্যবস্থা করিলেন—দশ ক্রোশের মধ্যে যে সমস্ত নামকরা পণ্ডিত আছেন সকলকেই নিমন্ত্রণ লিপি পাঠান হইল এবং সেই সঙ্গে ব্রাহ্মণ বিদায়ের ব্যবস্থা আছে তাহাও জানান হইল—বস্ত্র, উত্তরীয়, একটি ধাতু নির্ম্মিত জলপাত্র ও একটি টাকা বিদায় দেওয়া হইবে।

শ্রাদ্ধ উপলক্ষে তাঁতি পাড়ায় তখন দিবারাত্রি তাঁত চলিতেছে। চৈত্রের শুক্লা সপ্তমীর পূর্ব্বেই একশত বস্ত্র ও একশত উড়ুনী দিতে হইবে,—কাঁসারীপাড়ায় প্রভাত হইতে গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত টুং টাং শব্দ হইতেছে, পিতলের ঘটি একশত চাই। সাড়ম্বরে কাজ চলিতেছে। ভগবতী আগাম ধান ও টাকা দিয়াছেন—

নব তাঁতি সেইদিন তাহার বৈবাহিকের নিকট পুকুরঘাটে সেই কথাই বলিতেছিল—আমাদের কর্ত্তা দেবতুল্য ব্যক্তি, ব্যবসা ত আমাদের গিয়েছিল কেবল কর্ত্তার জন্য কাজ চল্‌ছে—

তাহার বেয়াইএর বাড়ী বর্দ্ধমানে, সে কহিল, হাস্‌ছো বেয়াই তাঁত চ'লছে দেখে—কিন্তু তোমাদের কর্ত্তার মাতৃ-শ্রাদ্ধ ত বারোমাস হবে না, বন্ধ ত আজ হ'লেও হবে কাল হ'লেও হবে। আমাদের গাঁয়ের তিরিশখানা তাঁত বন্ধ হয়ে গেছে। কেউ কেউ লাঙ্গল ধরেছে, কেউ বিলেতি কাপড়ের ব্যবসা করছে—না খেয়ে ত চলে না—একটা কিছু করতে ত হবে?

নব সরল সহজ মানুষ, সে সবিস্ময়ে কহিল, জাত ব্যবসা ছেড়ে লাঙ্গল ধরেছে,—আর সেই ম্লেচ্ছর তৈরী কাপড় মাথায় করে হাটে হাটে বেচে বেড়াচ্ছে, তাঁতির তাঁত বন্ধ ক'রতে?

—করবে কি ? বাঁচতে ত হবে ?

—কেন তোমাদের জমিদার নেই—

বেয়াই হাসিয়া কহিলেন, জমিদারে কি করবে বেয়াই ? আমার রুচি মত পছন্দ মত কাপড় ত আমি পরবো—সস্তা কাপড়, ভাল কাপড় লোকে কেন কিনবে না ? তাই বল্‌ছি এই সময় একটা কিছু ধর।

নব বিস্মিত হইয়া কহিল, বল কি বেয়াই, জাত-ব্যবসা ছাড়া মহাপাপ, আর জাত-ব্যবসা ছেড়ে কি করবো ? লাঙ্গল ত ধরতে পারবো না।

বেয়াই বিজ্ঞের মত হাসিলেন—তাঁহার বাড়ী শহরের কাছাকাছি। তিনি অনেক কিছুই জানেন এমনি একটা মুখশ্রী করিয়া কহিলেন, দেখি, দেখবো আরো কত কি ?

*

ভগবতীর বাৎসরিক মাতৃশ্রাদ্ধে শতাধিক ব্রাহ্মণ সমবেত হইয়াছেন। অনেকেই প্রখ্যাত পণ্ডিত—তাঁহাদের অভ্যর্থনান্তর বৃহৎ সদর-দালানে বসিতে দেওয়া হইয়াছে। পণ্ডিতগণ নানারূপ শাস্ত্রালোচনা করিতেছেন—কুশল প্রশ্ন করিতেছেন। ভগবতী এতক্ষণ মন্ত্রপাঠে ব্যস্ত ছিলেন, তিনি আসিয়া সভাস্থ ব্রাহ্মণগণকে প্রণাম করিয়া সবিনয়ে কহিলেন, আপনাদের পদধূলিতে আজ আমার কুটীর পবিত্র হ'ল। আমার মাতার স্বর্গার্থে আপনাদের আশীর্ব্বাদ আমি প্রার্থনা করি।

বৃদ্ধ বাচস্পতি কহিলেন, জয়োস্তু, দানই পরম ধর্ম্ম, তোমার দান ও কর্ম্ম দেশ-বিশ্রুত, তোমার মনস্কামনা সিদ্ধ হোক্। ধর্ম্মরক্ষার্থ-ই রাজার ধন ও শক্তি—

অন্যান্য পণ্ডিতগণ কথাটা সমর্থন করিলেন। মতি ঠাকুর মহাশয়

এতক্ষণে শ্রাদ্ধকার্য্য সম্পন্ন করিয়া সভায় আসিয়া কহিলেন, ব্রাহ্মণেভ্যঃ নমঃ!

সকলে সাদরে তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন। মতি ঠাকুর কহিলেন, আপনাদের মত পণ্ডিতগণের দেখা পাওয়া ভাগ্য, আজ আমাদের পরম সৌভাগ্য। আপনাদের কাছে আমার একটা বিনীত নিবেদন আছে—আশা করি আপনারা আমার কথা বিবেচনা করবেন, প্রণিধান করে মীমাংসা করবেন—

মতি ঠাকুর সংক্ষেপে জানাইলেন দেশে বিলাতী কাপড় প্রভৃতি আমদানী হওয়ায় দেশের শিল্পবাণিজ্য ধ্বংস হইতে চলিয়াছে, সমাজ রক্ষার্থে সমাজ কল্যাণে দৈবকার্য্য বা প্রেতকার্য্যে বিদেশী কাপড় বর্জ্জন করাই আজ একান্ত প্রয়োজন—

জনৈক শাস্ত্রজ্ঞ শাস্ত্রের তর্ক তুলিয়া কহিলেন, শাস্ত্রে এমন কোন বিধি নেই—যাতে যজমানকে এমন ব্যবস্থা বলা যায়। তিনি পণ্ডিত মণ্ডলীর দিকে চাহিয়া কহিলেন, কেমন আপনারা বলুন—শাস্ত্রে এমন কোন বিধি আছে—

শাস্ত্রে এরূপ বিধি আছে কি না এই লইয়া পণ্ডিতগণের মধ্যে একটা বিরাট কোলাহলের সৃষ্টি হইল এবং বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে তর্ক আরম্ভ হইয়া গেল—কোলাহল যখন প্রায় চরমে উঠিয়াছে এবং মতি ঠাকুর মহাশয় একটু বিপন্নভাবে সমবেত জনতাকে থামাইতে চেষ্টা করিতেছেন তখন হঠাৎ গোপাল উঠিয়া উদাত্তকণ্ঠে সম্বোধন করিল, সমবেত বিদ্বৎমণ্ডলি—

গোপালের কণ্ঠের গাম্ভীর্য্য ও উত্তেজিত উদাত্ততায় কোলাহল প্রশমিত হইয়া আসিলে গোপাল বলিতে আরম্ভ করিল—

আজকার সভায় বিদেশীবর্জ্জনের প্রস্তাব যিনি করেছেন তিনি আমার শ্রদ্ধেয় অগ্রজ এবং শিক্ষাগুরু। তাঁর প্রস্তাব শাস্ত্রসম্মত কিনা সে

সিদ্ধান্ত করার পূর্ব্বে আমার কিছু নিবেদন আছে, আপনারা অনুমতি ক'রলে আমি নিবেদন করতে পারি—

বালক গোপালের কথা শুনিয়া কেহ হাসিল, কেহ কহিল, বলুক—বলুক, শুনি না, ছেলেমানুষ ব'লতে দাও—

গোপাল পুনরায় আরম্ভ করিল, আমরা ব্রাহ্মণ, বর্ণশ্রেষ্ঠ, সমাজের সকলের দানগ্রহণ করেই আমরা বেঁচে থাকি। সমাজ আমাদের এই দান করে কারণ ব্রাহ্মণগণই ... জ্ঞানের অধিকারী। তার পরিবর্ত্তে আমাদের কর্ত্তব্য আ... জ্ঞানবুদ্ধি মত সমাজকে সেবা করা, যাতে দেশের সমাজের ...ণ হয়—আমাদের প্রাথমিক ভাবে সেই কথাটাই বিচার করা ... জমিদার যেমন তাঁর খাজনা এবং সেলামী নেন কেবল ... জন্য নয়, সমাজকে বাঁচিয়ে রেখে তাকে শাসন করে ...য়ে যাওয়াই তার কর্ম্ম। দানই তাই তার ধর্ম্ম। আমাদের মঙ্গল ... সমাজ মঙ্গলের গুরুকর্ত্তব্য রয়েছে, আমরা যদি সমাজের দান তেমনি গ্রহণ ... ব সেও আমাদের করা কর্ত্তব্য, তা না হ'লে আমরা বর্ণশ্রেষ্ঠ ... গ্রহণের অধিকারী নই, আমরা পতিত। আর শাস্ত্র পরিবর্ত্তন- হিন্দু ... র স্মৃতি প্রয়োজনবোধে স্মার্ত্ত রঘুনন্দন পরিবর্ত্তন করেছিলে হইয়া শীল ... প্রয়োজনে ও কল্যাণে। কাজেই আমরা আজ দেখবো, ... নিমেষে সমাজে ... কানটি। বিলাতী কাপড়, হাঁড়িকলসী কেরোসিনের তে... কল ... তবে আমাদের প্রত্যেক গ্রামের তাঁতি, কুমার, কলুর ... কিলেন— আর ... অন্ন সংস্থান কঠিন হবে। দেশে নতুন রাজা হ'য়ে আসিল যা... নি ম্লেচ্ছ যবন, তাদের এই কৌশলকে আমাদের বাধা দিতে হবে ... কথিত তাহা বিদেশ... সেই শা... ই শাস্ত্র—যা আজ আমাদের এই শিল্পীগণকে রক্ষা করবে।

...স্থিত ব্রাহ্মণগণ গোপালের কথা কয়েকটির তারিফ করি... ভূত করিয়া লি... বলিলেন, শাস্ত্রের মূলভাষ্যই গোপাল করিয়াছে ; অতএব ...য়াছে, সক... দৈব বা প্রেতকার্য্য কোনটিতেই বিদেশী বস্ত্র ব্যবহৃত হইবে না। ...ইয়া হই... তেছে—

ভগবতীর চণ্ডীমণ্ডপ হইতে দেখিতে দেখিতে দিকে দিকে এই কথা রাষ্ট্র হইয়া গেল—ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত সকলে একমত হইয়া বলিয়াছেন পূজাদি কার্য্যে বিদেশা বস্ত্র চলিবে না—

নব তাঁতি উল্লাসে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া কহিল, আপনারাই বর্ণশ্রেষ্ঠ, সাক্ষাৎ দেবতা। আশীর্ব্বাদ করুন আমরা যেন আপনাদের পায়ের ধূলোর আশীর্ব্বাদে বেঁচে থাকতে পারি।

*

কিন্তু তথাপি এ প্লাবন রুদ্ধ হইল না—

ভগবতী সেদিন দ্বিতলের ঘরে বসিয়া ভাবিতেছিলেন—চৈত্রের মাঝামাঝি, গ্রামে চৈত্র-সংক্রান্তি উৎসবে গাজনের তোড়জোড় চলিতেছে। একটানা একটা দক্ষিণা হাওয়া সারাদিন চলিয়া সন্ধ্যায় [illegible] আবার সন্ধ্যার পরে পশ্চিমের একটা হাওয়া দুরন্ত বেগে ধূলা উড়াইয়া, গাছের শুষ্কপত্র উড়াইয়া বহিয়া যায়—দিনে প্রখর সূর্য্যতাপে [illegible] ও গরম হইয়া যায়—ধূসর মৃত্তিকা ফাটিয়া ফুটি ফাটা হইয়াছে

কোন [illegible]টি কূপ ইতিমধ্যে শূন্যোদক হইয়াছে। খড়ের ঘরের [illegible]ড়গুলি

শাকে [illegible] এমন হইয়াছে যে ধরিলে ভাঙ্গিয়া গুঁড়া হইয়া যায়। [illegible]

বিরাট কো[illegible]ষ্ণ মৃত্তিকা হইতে একটা তাপ বিচ্ছুরিত হইয়া বায়ুমণ্ডল [illegible]

হইয়া গে[illegible] তুলে—তাই গভীর রাত্রের পূর্ব্বে নিদ্রা আসেনা—

মহাশয় [illegible] জ্যোৎস্না রাত্রি—দ্বিতল হইতে দেখা যায় দূরে ডোমপাড়া, [illegible]মেদের

তখন [illegible]ম্মী, বাগ্দী, বাউরীপাড়া সারি সারি একটানা ঘর চলিয়াছে।

বিদ্বৎম[illegible] [illegible]ওয়াজ ভাসিয়া আসে। ভগবতী ভাবিতেছিলেন

গোপালে [illegible] লাহল

প্রশমিত [illegible] তাঁতির তাঁত বন্ধ হইতে চলিয়াছে, কলুর ঘানি বন্ধ হই[illegible]

[illegible]হয় না হয় ধান ধার দিয়া বা দান করিয়া তাহাদিগকে বাঁচান [illegible]মার

[illegible]কন্তু চিরদিন বৎসরের পর বৎসর তাহাদিগকে প্রতিপালন করিবার [illegible] সে

ত তাঁহার নাই—কি হইবে? এই সমাজকে তিনি কেমন করিয়া রক্ষা করিবেন—প্রতাপশালী ভগবতী মনে করিলেন, তিনি সত্যই দুর্ব্বল, সত্যই অসহায়—

নিবিষ্ট মনে বসিয়া ভাবিতেছিলেন—অস্পষ্ট একটা ধারণা হইতেছিল, তাঁহার নব, গোবিন্দ প্রভৃতি প্রজা ও বন্ধুগণ ধীরে ধীরে সপরিবারে অনাহারে মরিতেছে, কিন্তু তিনি কেবল দর্শক হিসাবে দেখিতেছেন।

ঝড়ের মত এক ঝলক হাওয়া আসিয়া জানালাটাকে ঝড়াং করিয়া আছাড় দিয়া গেল—দূর-দিগন্তে একাদশীর চাঁদ ধূসর বিবর্ণ—তালগাছের বাতাস খড় খড় শড় শড় শব্দ করিয়া উঠিল—

সঙ্গে সঙ্গে বিরাট একটা সোরগোল—চিৎকার—ভগবতী চাহিয়া দেখিলেন—ডোমপাড়ায় একখানা ঘরে আগুন লাগিয়াছে এবং বারুদের মত চালের খড় দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া তুবড়ীর মত মধ্য আকাশে উঠিয়াছে—চারিধারে হৈ-হৈ শব্দ হইতেছে—আগুন—আগুন—

গৃহে গৃহে শঙ্খ বাজিয়া উঠিল, গৃহবধূগণ তাড়াতাড়ি বাস্তুতে জল দিলেন। ভগবতী ছুটিয়া নামিয়া আসিলেন— হায় হায় সর্ব্বনাশ হইয়া গেল। সারাবৎসরের শ্রমলব্ধ ধান, সারাবৎসরের আহার্য্য নিমেষে ভস্মীভূত হইয়া সমস্ত প্রজাকে পথের ভিখারী করিয়া দিবে—

ভগবতী চণ্ডীমণ্ডপের সামনে দাঁড়াইয়া উন্মাদের মত হাঁকিলেন—আগুন, আগুন—চলে আয় সব—চলে আয়—কে আসিল কে না আসিল তিনি ফিরিয়াও দেখিলেন না, ঊর্দ্ধশ্বাসে তিনি ছুটিলেন তথাকথিত ছোটলোকের পাড়ায়।

আগুনের লেলিহান জিহ্বা একটির পর একটি গৃহকে ভস্মীভূত করিয়া চলিয়াছে—সঙ্গে ঝড়ের মত হাওয়া আগুনের ফুলকি বহন করিয়া চলিয়াছে, দূরে মাঝে মাঝে বাঁশের গিট ফাটিয়া প্রচণ্ড শব্দে আগুন ছিটকাইয়া দিতেছে—

ভগবতী ছুটিয়া আসিয়া উপস্থিত হইলেন—সামনে কম্পমান ক্রন্দনরত শিশু ও নারীর দল তাঁহাকে চিনিয়া কাঁদিয়া উঠিল, কি হ'ল কর্ত্তা, কি হ'ল রে—

ভগবতী কহিলেন, কাঁদিস্ না—জল, জল আন তাড়াতাড়ি, জল আন—কাঁদবার সময় নেই—

সামনে ভরত প্রভৃতি কয়েকজন বাগ্দী ছিল, তাহাদিগকে ধমক দিয়া কহিলেন, শিগ্‌গির কাঁথা ভিজিয়ে মই নিয়ে চালে ওঠ—শিগ্‌গির—

মতি ঠাকুর মহাশয় পিছন হইতে কহিলেন, গোহাল থেকে গরু ছেড়ে দে, গরু ছেড়ে দে—

আগুনের শব্দে সকলেই বিভ্রান্ত হইয়া কি করিবে তাহাই ঠিক করিতে পারে নাই, হঠাৎ একটা আদেশ পাইয়া তাহারা সেই কাজে ছুটিল। ভগবতী তারস্বরে কহিলেন, নীলমণি যা—শিগ্‌গির যা—কামিনদের জল আন্‌তে বল দিঘি থেকে—

মুহূর্ত্তে নারীকুল কলসী লইয়া ছুটিল দিঘিতে জল আনিতে, কাঁথা ভিজাইয়া অনেকেই উঠিল ঘরের চালে। বাঁশের গিট ফাটিয়া ফুলকী উড়িয়া আসিতেছে, ভিজা কাঁথা দিয়া চালের উপর তাহাকে নিভাইয়া দিতেছে।

ভগবতী আরও আগাইলেন—ডোমদের বড় ঘরখানি তখন জ্বলিতেছে। তিনি সেখানে যাইয়া হাঁকিলেন, এই ঘর ঠেক্‌াতে হবে নইলে সব যাবে, ওঠ্ সকলে ওঠ্—

কয়েকজন যুবক মুহূর্ত্তে ভিজা কাঁথা লইয়া চালে উঠিল—বৃহৎ ঘর, সমগ্র পাড়ার মধ্যে অন্তত তিন হাত মাথা উঁচু করিয়া এতদিন গৃহস্থের আভিজাত্য সপ্রমাণ করিয়াছে—

ভগবতী কহিলেন, এ ঘরে আগুন লাগলে রক্ষে নেই, পাড়া সাফ হয়ে যাবে। যেমন করে হোক্ ঠেকাতেই হবে—

অসহ্য গরম, পাশের ঘরখানি পুড়িয়া মাটিতে পড়িয়া ধিকিধিকি জলিতেছে, আগুনের আঁচে নিকটবর্ত্তী হওয়া যায় না। বড় ঘরখানির চালের উপরও থাকা যাইতেছে না। কামিনগণ প্রায় পঞ্চাশ কলসী জল লইয়া আসিয়াছে।

ভগবতী কহিলেন, বড়ঘরের চাল থেকে জল ঢেলে দে এইদিকে, দক্ষিণে—যাতে হাওয়ায় আগুন না নিতে পারে—ঢাল জল—ঢাল—

মুহুর্মুহুঃ জল ঢালিয়া দক্ষিণ দিকের আগুনটা প্রায় নির্ব্বাপিত হইয়া আসিয়াছে এমন সময় হঠাৎ একটা ঘূর্ণি হাওয়ায় আগুন আবার জ্বলিয়া উঠিল এবং পশ্চিমদিক হইতে আগুনের হল্কা এমন জোরে আসিতে লাগিল যে চাল হইতে যুদ্ধরত যুবকগণ "পুড়ে গেলাম" বলিয়া লাফাইয়া নামিয়া পড়িল এবং সঙ্গে সঙ্গে অরক্ষিত পাড়ার বৃহত্তম ঘরে আগুন লাগিয়া গেল এবং শুষ্ক ঘরের চাল বারুদের মত জ্বলিয়া উঠিল—আকাশ জুড়িয়া তাহার লেলিহান শিখা—গ্রামান্তর হইতে ছুটিয়া আসিল কত লোক কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে চলিল বাতাসের মাতামাতি—

লাফাইয়া লাফাইয়া আগুন চলিল—ঘরের পর ঘর জ্বালাইয়া—মানুষের গৃহ, বৎসরের খাদ্য, বৎসরের রোদে-জলে পোড়া সমস্ত শ্রমকে ভস্মীভূত করিয়া—চারিপাশে আর্ত্তকণ্ঠে চীৎকার চলিল—নারী ও শিশুগণ কাঁদিয়া গগন বিদীর্ণ করিয়া দিল—মানুষের চোখের জল, আর্ত্তকণ্ঠের আকুল আবেদনকে উপেক্ষা করিয়া ক্রুদ্ধ অগ্নিশিখা পাড়ার প্রায় সবকয়খানি ঘর নিমেষে নিঃশেষ করিয়া দিল। মানুষের শ্রম, দিঘির জল, করুণ আর্ত্তনাদ, ক্রুদ্ধ লেলিহান শিখাকে প্রতিরোধ করিতে পারিল না—তাহারা দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিল—জীবনের সমস্ত সঞ্চয়, আপনার গৃহ, জন্মজন্মান্তরের অতি পরিচিত গৃহ আগুনে পুড়িয়া ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে।

*

সমস্ত পাড়াখানিকে নিঃশেষ করিয়া অগ্নি স্তিমিত হইয়া আসিল— গৃহের কাষ্ঠ বাঁশ আসবাব ধিকি ধিকি জ্বলিতেছে আর তাহার ফাঁকে ফাঁকে অশ্রুপূর্ণ চোখে প্রেতের মত ঘুরিয়া বেড়াইতেছে অসহায় লোকগুলি—

ভগবতী কহিলেন, জল—জল— আন্। এখনও যদি ধানের গোলা রক্ষা করা যায়—

ভীত ব্যাকুল অসহায় লোকগুলি আবার ছুটিল জল আনিতে। আগুনের মাঝে মাঝে জল ঢালিয়া পথ করিয়া ধানের গোলায় বহ্নিমান ধানের উপর জল ছিটাইতে আরম্ভ করিল, কিন্তু কোথায় প্রচুর জল ? দিঘি বহুদূর—কূপ তিনটি ইতিমধ্যেই বিশুষ্ক হইয়া উঠিয়াছে—

ভগবতী, মতি ঠাকুর, গোপাল, সারদা প্রভৃতি গ্রামের সকল লোকের চেষ্টায় এবং নারীপুরুষের সমবেত চেষ্টায় সারারাত্রি ধরিয়া জল আনিয়া দগ্ধ ধানের গোলায় ঢালা হইল, কিন্তু সে চেষ্টা বিরাট এই নৈসর্গিক দুর্ভাগ্যের নিকট অতি তুচ্ছ—

ধীরে ধীরে আগুন নিভিয়া আসিল—কেবলমাত্র কুণ্ডলীকৃত ধূম বাহির হইতেছে—দগ্ধ ধান ও কাষ্ঠের নির্গত ধূম হইতে কেমন একটা বিশ্রী দুর্গন্ধ নির্গত হইতেছে। জনকোলাহলমুখরিত পাড়াটা মুহূর্ত্তে ভস্মে পরিণত হইয়াছে।

সারারাত্রি অমানুষিক পরিশ্রমে সামান্য ধানই রক্ষা পাইল—

তাহার পর ধীরে ধীরে পূবের আকাশ ফরসা হইল—দিনের সূর্য্য উঠিতে না উঠিতে প্রচণ্ড হইয়া উঠিল।

ভগবতী সারারাত্রি কর্ম্মাবসানে ফিরিতেছিলেন—তাঁহার সাম্নে পাড়ার নারীপুরুষ কাঁদিতে কাঁদিতে বসিয়া পড়িল। আর্ত্তকণ্ঠে প্রশ্ন

করিল—কি হবে আমাদের—শিশু কোলে করিয়া নারী কাঁদিতেছে, যুবকগণ কালি ও ছাই মাখিয়া সাশ্রুনেত্রে দাঁড়াইয়া আছে। শিশুগণ কাঁদিতেছে—হয়ত ক্ষুধায়, তৃষ্ণায়, বা না বুঝিয়াই—

ভগবতী মুখ তুলিয়া চাহিলেন—সাম্‌নে দাঁড়াইয়া আছে তাঁহারই প্রজাকুল—নীলমণি, ভরত, নটবর, তাহাদের স্ত্রী-পুত্র—পিছনে মতি ঠাকুর—গ্রামের ইতর ভদ্র—

নটবর হাউমাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল—সেই সঙ্গে রোরুদ্যমান নারীকুল আর একবার আর্ত্তকণ্ঠে কাঁদিয়া উঠিল।

নটবর কহিল, ছেলেমেয়েকে কেমন করে বাঁচাবো কর্ত্তা—

ভগবতী মুখ তুলিয়া দেখিলেন—এই নিদারুণ বিষণ্ণ মুখগুলির দিকে চাহিয়া তাঁহার হৃদয় মুচড়াইয়া উঠিল। তাঁহার শশধর চাঁদুকে লইয়া আজ যদি এমনি গৃহহীন হইতে হইত! তাঁহার চক্ষু দুইটি সজল হইয়া উঠিল, তিনি বলিলেন, কোন ভয় নেই, কোন ভয় নেই নটবর। ভগবান দিয়েছিলেন তিনি নিয়েছেন—আবার দেবেন—

ভগবতীর সান্ত্বনা বাক্যে কেহই আশ্বস্ত হইল না—আজ তাহারা স্ত্রী-পুত্রের হাত ধরিয়া কোথায় দাঁড়াইবে, কি খাইবে?

নীলমণির স্ত্রী কহিল, কি খাবো বটে। কোথায় দাঁড়াবো, আজ ওদের মুখে কি দেওয়া ক'রবো?

ভগবতী কহিলেন, কোন ভয় নেই, আমি আছি। আমার ধানের গোলা, আমার বাড়ী সব তোদের জন্যে, কোন ভয় নেই—তোরা চণ্ডীমণ্ডপে যা—

ভগবতী চলিয়া আসিলেন। ভগবতীর কথায় সকলে আশ্বস্ত হইল—নারীকুল ক্রন্দন ছাড়িয়া চুপ করিল।

*

ভগবতী সারারাত্রি পরিশ্রম করিয়াছেন, রাত্রি জাগরণে শরীর ক্লান্ত —তিনি গোমস্তাকে কহিলেন—চালের গোলা খুলে আজ সকলের দুবেলার মত চাল আর নুন দিয়ে দাও—

গোলার দ্বার উন্মুক্ত হইল—সব গৃহস্থই সেদিনের মত চাউল লইয়া চলিয়া গেল।

বিশ্রাম করিবার উদ্দেশ্যে ভগবতী সকাল সকাল খাইয়া শুইয়াছিলেন কিন্তু কিছুতেই ঘুম আসিল না—বিপদ চারিপাশ হইতে ঘনাইয়া আসিয়াছে। কেমন করিয়া তিনি আজ এই দুর্য্যোগে তাঁহার গ্রামকে রক্ষা করিবেন। চিন্তা করিতে করিতে মনের মাঝে একটা ভয়াবহ নৈরাশ্য বোধ করিতেছিলেন। একবার ভাবেন—ওদের দেওয়া ধান, অর্থ ও শ্রমেই তাঁহার জমিদারী—না হয় তাহাদের কল্যাণেই যাইবে কিন্তু সকলের জন্যে তাহা ত পর্য্যাপ্ত নয়। তিনি নানা কথা ভাবিতে ভাবিতে উত্তেজিত হইয়া গোমস্তাকে ডাকিলেন এবং চণ্ডীমণ্ডপে আসিয়া কহিলেন, ঠাকুর মশায়কে ডেকে আন্ শিগ্ গির—

মতি ঠাকুর মহাশয় তাঁহার পুরোহিত, শুভাকাঙ্ক্ষী, কর্ত্তব্য-নির্দ্ধারণে তাঁহার উপদেশ একান্তই প্রয়োজন—ভগবতী উত্তেজনায় অধীর হইয়া পড়িয়াছিলেন—

মতি ঠাকুর অনতিবিলম্বেই আসিয়া পড়িলেন। ভগবতী কোনরূপ ভূমিকা না করিয়া অত্যন্ত বিপন্নের মত প্রশ্ন করিলেন, কি করি, ঠাকুর মশায়—চারি পাশে বিপদ ঘনিয়ে এসেছে—

মতি ঠাকুর সহাস্য মুখে কহিলেন, শাস্ত্রের প্রথম উপদেশ—বিপদে ধৈর্য্য ধারণ করতে হবে। তুমি অধীর হ'য়ো না—

—কিন্তু একটা কর্ত্তব্য স্থির ক'রতে হবে ত ?

—হ্যাঁ শাস্ত্রে কর্ত্তব্যেরও নির্দ্দেশ আছে। রাজার জীবন প্রজানু-রঞ্জনের জন্য। রাজভাণ্ডারের ধন প্রজার জন্য। রামচন্দ্র প্রজাদের জন্য সতী সীতাকে বনবাস দিয়েছিলেন, সেই ধর্ম্ম—তোমার অর্থবিত্ত প্রজাদের জন্য। প্রজা না বাঁচলে রাজার রাজত্ব থাকে না—কাজেই রাজারা পুণ্য কার্য্য করলে তাতে দেশের প্রজা বাঁচতো। শাস্ত্রকার বলেছেন—ব্রতপ্রতিষ্ঠা, উৎসব, ভোজন প্রভৃতি পুণ্য কার্য্য, কারণ তদ্বারা দরিদ্র প্রতিপালিত হয়—

ভগবতী জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাহিলেন। মতি ঠাকুর কহিলেন, আমারও নিদ্রা হয় নি। তোমার মায়ের একটা দীঘি প্রতিষ্ঠার ইচ্ছা ছিল কিন্তু তা হয় নি—আমার ইচ্ছা তোমার মায়ের নামে তুমি বসন্ত সায়র আরম্ভ কর। আর গৃহহীন তোমার সমস্ত প্রজা তা'তে কাজ করুক! তোমার মায়ের দীঘি খনন করতে করতে ওরা জীবিকা অর্জ্জন করুক। তারপরেই আষাঢ়ে বৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে ধান দাদন নিয়ে ওরা চাষ করুক। আর সমস্ত প্রজাকে বল, যাতে তারা উদ্বৃত্ত খড় ও বাঁশ দিয়ে ওদের সাহায্য করে। তাহ'লে হয়ত এ বিপদ কেটে যেতে পারে—

ভগবতী কহিলেন, হ্যাঁ ঠিক তাই। যে কাজ করবে সে দেড় সের করে চাল পাবে। ঠিক হ'য়েছে। আপনি দিন দেখুন—এমনি না করলে ওরা কাজই বা পাবে কোথায়? আর বেঁচে থাকবেই বা কি ক'রে—

—দিন আমি দেখেছি। পরশু প্রভাতের পরে প্রথম দুই দণ্ডের মধ্যে খনন কার্য্য আরম্ভ করতে হবে। শুভ দিন—তোমার মায়ের নামে, ওই পাড়ারই পূবে ডাঙ্গার নীচে একটা বিরাট জলাশয় কর—যাতে ভবিষ্যতে আগুন লাগলে জলাভাব না হয়।

ভগবতী মতি ঠাকুরের কথায় অনেকটা যেন আশ্বস্ত হইলেন—একসঙ্গে পুণ্যকার্য্য ও প্রজাপালন হইবে, মায়ের শেষ ইচ্ছাও পূর্ণ হইবে।

*

বসন্তসায়রের খননকার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। মতি ঠাকুর মশায় প্রভাতে আসিয়া পূজার্চ্চনা ও মাঙ্গলিক কার্য্য করিয়া খননকার্য্য আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন।

ভরতের গৃহও ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছিল—পোড়া দেওয়ালের উপর, বাঁশের পাতা ও খড়ের ছাউনি দিয়া কোনমতে একটা আচ্ছাদন দিয়াছে! ছেলেটা গরু চরাইয়া ঘুঁটে কুড়াইয়া রাখে। আতুরী ও ভরত যায় মাটি কাটিতে। প্রভাতে যায়—দুপুরে আসিয়া রাঁধিয়া খায়—আবার সূর্য্যাস্তে আসে, সারাদিনের খাটুনির পর বাহিরে খেজুরের পাটি পাতিয়া শুইয়া ঘুমায়—আবার সূর্য্যোদয়ে কাজ আরম্ভ করে। ভরত কোদাল দিয়া মাটি কাটিয়া ঝুড়ি বোঝাই করিয়া দেয়—আতুরী ঝুড়ি বহন করিয়া পাড়ে ফেলিয়া আসে—এমনি করিয়া দুই শতাধিক নারী পুরুষ নিত্য নিয়মিত কাজ করে। মধ্যাহ্নের প্রখর রৌদ্রে কাজ চলিতেছিল। আতুরী কয়েক বোঝা মাটি বহিয়া তৃষ্ণার্ত্ত ভাবে বসিয়া পড়িল। আতুরী কহিল, আর পারবেক নাই—তেষ্টা পেয়েছে বটেক—

তেষ্টা পেয়েছে ; তা জল খা কেনে—

—কোথা জল—গাঁয়ে যাবেক জল খেতে—

ভরত হাসিয়া কহিল, মোরা জল খাবো, তাই ত কর্ত্তা সায়র কাট্‌ছে আতুরী। বসন্তসায়রে কত জল হবে, খাবেক, হাঁস পুষবেক—

আতুরী কহিল, হু, জল খাবেক, হাঁস পুষবেক—

ভরত কহিল, তবে, কর্ত্তাই বুঝি সব জল খাবেক ওপাড়া থেকে এসে—তু কি রে! কিছু বুঝতে নারলি? মাটি কেটে চালও আমরাই লেবো, জলওঁ আমরাই খাবো, মাছও আমরাই লেবো—

নীলমণি ও তাহার স্ত্রী ভরতের কাছেই কাজ করিতেছিল।

তাহাদের কোদালে, একখানা বৃহৎ পাথর বাধিয়াছে—তাহারা ডাকিল, ভরত, আহুরী—এদিকে আয়। পাথর লাগলেক বটে—

—পাথর কোথা ?

—হেথা—

—গাইতি চালা—

—তু আয়, বড় পাথর—মোরা লারবেক—

ভরত ও নীলমণি তুইজনে পাথরখানাকে মুক্ত করিতে চেষ্টা করিতেছিল তখন নীলমণির স্ত্রী কহিল—নীলকুঠির সাহেবের গাড়ী মারলেক—বলনু কিছু পুঁতে রাখ, তা সব সেলামী দিলে কর্ত্তাকে—আজ আমি মাটি বইতে নারবেক—

নীলমণি মুখ খিঁচাইয়া উঠিল—শালী—দেবেক না ? দেবেক না ত কি ? সেলামীর পোঁতা টাকায় ত বসন্তসায়র হইছে শালী—টাকা ত ফেরৎ লিচ্ছিস রোজ—কর্ত্তার খাচ্ছিস্—সেলামী না পেলে কোথায় যেতিস ? মেলায় যেয়ে রোজগার কর্‌তিস্ শালী ?

—তু মেলায় যা না কেনে—তোর বোনকে—

—বটে। নীলমণি কোদাল উদ্যত করিয়া আসিল। ভরত নীলমণিকে ধরিয়া ফেলিয়া কহিল, তু বুঝিস্ না মাসি! মোদের টাকা ত কর্ত্তার কাছে গচ্ছিত ছিল—মাটি কেটে এখুন লিয়ে লেবে তু—বুঝলি ? দিঘির জল ত খাবি, তোর বেটা খাবে। কর্ত্তা ত খাবেক নাই মাসি। যা ধর ঝুড়ি ধর—পাথর তুল তু—আহুরী আয় পাথর তু'জনে লিবি—আয় তু—

নীলমণির স্ত্রী কথাটা সম্যক বুঝিতে পারিয়াছে এই ভাবে উঠিয়া আসিল এবং আহুরী ওই বৃহৎ পাথরখানা মাথায় তুলিয়া সুউচ্চ পাহাড়ে উঠিতে লাগিল।

*

ভগবতীর মাতা বসন্তকুমারীর নাম অনুসারে নূতন পুকুরের নামকরণ হইয়াছে বসন্তসায়র—

জ্যৈষ্ঠের শেষাশেষি সায়রের কার্য্য শেষ হইয়াছে, ঝর্ণার জলে খনন কার্য্যের সময়ই একহাঁটু জল হইয়াছিল—দীঘি উৎসর্গ হইবে, দিনস্থির হইয়া গিয়াছে, সেদিন সমস্ত কর্ম্মী ভগবতীর বাড়ীতে খাইবে। সেজন্যে ভগবতীর বাড়ীতে উদ্যোগ আয়োজন চলিতেছে।

যেদিন সায়র উৎসর্গ হইবে তাহার পূর্ব্বদিনে সন্ধ্যার প্রাক্কালে প্রবল কালবৈশাখী আরম্ভ হইল—দুরন্ত ঝড় সেই সঙ্গে বৃষ্টি। ডাঙ্গার উপর হইতে হাঁটু সমান জল গড়াইয়া পুকুরে নামিতে লাগিল। ভগবতী দ্বিতলের ঘর হইতে দেখিলেন শালবনকে দোলাইয়া, শুষ্ক তালপত্রকে উড়াইয়া লইয়া চলিয়াছে প্রবল বায়ু—একবার শঙ্কা হইল—হয়ত যাহাদের ঘর আগুনে পুড়িয়াছিল তাহাদেরই ঘর আবার উড়িয়া যাইবে, কিন্তু তাহার সম্ভাবনা কম—ঐ পাড়ার উত্তর পশ্চিমে ডাঙ্গার উপর শালবন, ঝড় সেরূপ জোরে লাগেনা—

পরদিন সকালে ভগবতী বাহির হইলেন—ছোটলোকের পাড়া দেখিয়া সায়র দেখিয়া আসিবেন এবং যেখানে পূজা ও যাগযজ্ঞ হইবে সেস্থান পরিস্কার করাইয়া একটা চালা নির্ম্মাণ করাইতে হইবে। সৌভাগ্যবশতঃ কাহারও কোন ক্ষতি হয় নাই। ভগবতী যাহাকে পাইলেন তাহাকেই বলিলেন, এবার নাঙ্গল-জোয়াল সব ঠিক করে নে। সময়ে বৃষ্টি হ'য়েছে, ভাল করে চাষ কর, দুঃখ দূর হয়ে যাবে—

যাহাদের নাঙ্গল-জোয়াল পুড়িয়া গিয়াছিল তাহারা ছুতার মিস্ত্রির নিকট তাহা বাকী পাইয়াছে। পৌষমাসে ধান দিয়া শোধ করিতে হইবে। ভগবতী আসিয়া সায়রের কূলে দাঁড়াইলেন—জল থৈ থৈ

করিতেছে, সুন্দর জল, এক গলা জল হইয়াছে পুকুরে। কতকগুলি দিগম্বর বালক জল ছিটাইয়া খেলা করিতেছে। পূর্ণকুম্ভকক্ষে বাউরী বাগ্দী পাড়ার ঝি বৌরা ফিরিতেছে—

তাঁহাকে দেখিয়া সকলে সম্ভ্রম সহকারে পথের ধারে পথ ছাড়িয়া দাঁড়াইল। ভগবতী চিনিলেন আহ্লাদীকে—প্রশ্ন করিলেন, কিরে আহ্লাদী, কি রকম দীঘিটা হ'ল—জল ভাল হ'য়েছে ত? আজই উৎসর্গ হবে—কাল থেকে জল খাওয়া চল্‌বে—

আহ্লাদী কলসী নামাইয়া কহিল, আপনার দয়া কর্ত্তা—আপনারই ত খাবো—আপনি ত মা বাপ—

—তোরাই ত পুকুর খুঁড়েছিস, তোরাই জল খাবি। আমি ত নিমিত্ত মাত্র। যা হোক্—পুকুরে কাপড় কেচে, গরু নাইয়ে জল নোংরা করিস্ নি—

সকলেই সমবেতভাবে কহিল, না হুজুর—আপনার হুকুম হলে কেউ জলে নাম্‌বে না—

—হ্যাঁ, ভাল করে চাষ আবাদ করবি—ঘরগুলো সব ত আবার করতে হবে?

তাহারা চলিয়া গেল। ভগবতী পুকুরের ধারে দাঁড়াইয়া আত্মপ্রসাদ বোধ করিতেছিলেন। চমৎকার পুকুর হইয়াছে, পশ্চিম পাড়ে যে পাথর উঠিয়াছে তাহাতে সেদিকটা প্রায় পাকা ঘাট হইয়া গিয়াছে। ভগবতী হিসাব করিলেন—পাড়ে তালগাছ দিতে হইবে অন্ততঃ হাজার দেড়, আর জেলেদের পাঠাইয়া মাছের চারা আনিতে হইবে। ভাদ্রের বর্ষায় যখন খাদ্যের অভাব হইবে তখন তাল খাইয়া বহুলোক বাঁচিতে পারিবে—

মতি ঠাকুর মশায় আসিয়া কহিলেন, শিগ্‌গির জোগাড় কর ভগবতী, এর পরে আবার কাল-বেলা পড়ে যাবে—

—এই ত ওরা এসে গেছে। কয়েকজন বাগ্দী কোদাল লইয়া

আসিয়া দেখিতে দেখিতে সমস্ত প্রস্তত করিয়া ফেলিল। দ্বিপ্রহরের পরে পূজাদি কার্য্য সুসম্পন্ন হইয়া গেল এবং তাহার পরে সমস্ত মজুর কর্ম্মী ও ব্রাহ্মণ ভগবতীর বাড়ীতে পেট ভরিয়া ভাত ডাল তরকারী খাইয়া ভগবতীর গুণগান করিতে করিতে বাড়ীতে ফিরিল।

*

বর্ষা আসিয়াছে—

চাষ-আবাদ চলিতেছে দ্রুত। বাগ্দী ডোম কুর্ম্মী প্রজারা দ্বিগুণ উৎসাহে চাষ আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। আদুরী ও ভরত তাহাদের নূতন গৃহকে সুন্দরতর করিতে চাষের কাজে মন দিয়াছে। ভরত চাষ করিয়া ফিরে—আদুরী তাহাকে রাঁধিয়া খাওয়ায়, আদুরী মাঝে মাঝে গান করে, ভরত শুনিতে শুনিতে বাহবা দেয়—

সেদিন কুলুরা হঠাৎ আসিয়া জানাইল, তাহাদের যে পাঁচ বিঘা জমি আছে তাহা তাহারা নিজেরাই চাষ করিবে। ভরতকে আর ভাগ চাষ করিতে হইবে না—

ভরতের মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল, সে মাত্র বার বিঘা জমি চাষ করে, তাহাতে তাহার সংসার একরূপ চলে—পাঁচ বিঘা চলিয়া গেলে—সে কি খাইবে? এবং কি দিয়াই বা সে নূতন ঘর বাঁধিবে। ভরত বিমূঢ় হইয়া পড়িল—

ভরত একদিন ধরিয়া ভাবিল কিন্তু কোনই সমাধান করিতে পারিল না; অবশেষে দীনের শরণ ও পরমহিতৈষী ভগবতীর কাছে গিয়া তাহার আবেদন জানাইল—

ভগবতী কাছারীতে বসিয়াছিলেন। তিনি জানিতেন এবং মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিতেছিলেন যে শান্ত সুন্দর গ্রামে তাহার ভাঙ্গন ধরিয়াছে।

দূরাগত একটা জলপ্লাবন ধীরে ধীরে নগর প্রাচীরের তলায় খনন কার্য্য করিতেছে এবং এ প্রাচীর ভাঙ্গিয়া পড়িবে। তবে তাঁহার জীবদ্দশায় তিনি যদি তাহাকে কোন মতে বাঁচাইতে পারেন এই ছিল তাঁহার আকাঙ্ক্ষা—

তিনি মৃদুকণ্ঠে কহিলেন, ভরত, তোমরা লণ্ঠন কিনেছ, কেরোসিন তেল জালছ—কুলুদের রেড়ির তেলের ঘানি বন্ধ হ'য়ে গেছে। দুটো গরু বসে আছে—তারাই বা কি কর্‌বে? জমি চাষ না ক'রলে খাবে কি?

ভরত অসহায়ের মত কহিল, আমি কি করবো হুজুর। সাত বিঘা জমি ভাগচাষ, তিনটা পেট, খাবো কি? তেল নুন কিন্‌বেক কেমনে? ঘর বাঁধবেক কি দিয়ে—

ভগবতী নির্ব্বাক হইলেন, এ প্রশ্নের কি উত্তর তিনি দিতে পারেন—অসহায় গৃহহীন ভরত তাঁহারই মুখের পানে চাহিয়া আছে। তিনি কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া কহিলেন, হিঙ্গুলবনের নীচে পশ্চিমে পতিত আছে, সেখানে দু বিঘে জমি তুলে দে। তিন বছর খাজনা দিতে হবে না—

ভরত কহিল, এখন পতিত তুল্‌লে পুঁতবো কবে?

ভগবতী কহিল, তুই মরদ, যা কামিনটাকে নিয়ে আজ থেকে লেগে যা। ভাল না উঠুক—যা হবে তাতেই দু আড়ি ধান ত হবে—যা গাঁইতি চালা—সরকার যেয়ে মেপে দেবে—

আসন্ন বিপদের সমূহ সমাধান না হউক, অন্তত আংশিক সমাধান ত হইয়াছে। ভরত কতকটা আশ্বস্ত হইয়া চলিয়া আসিল।

ভগবতী কি যেন ভাবিয়া একটা দীর্ঘশ্বাস মুক্ত করিয়া দিলেন। খানিক পরে সরকারকে কহিলেন, হ্যাঁ, তার পরে—

*

আষাঢ়ের বর্ষণে ভরত জমি চাষ করে, উত্তপ্ত উষ্ণ দিবসে ভরত আর আহুরী যায় হিঙ্গুলবনের ধারে পতিত উঠাইতে। ভরত তাহার বলবান দেহ লইয়া গাঁইতি চালায়, শক্ত করিয়া গাঁইতির বাট ধরিয়া 'হাঁই' করিয়া বন্ধ্যা মৃত্তিকার বুকে আঘাত করে—মাটি পাথর ভাঙ্গিয়া ছিন্নভিন্ন হয়—আহুরী পিছনে পিছনে পাথর ও নুড়ি কুড়াইয়া ঝুড়ি বোঝাই করে, ভরত ঘর্ম্মাক্ত দেহটাকে ঋজু করিয়া উঠিয়া দাঁড়ায়, দুজনে হাতে-হাতে পাথরের ঝুড়ি আহুরীর মাথায় তুলিয়া দেয়—আহুরী আইলের উপর রাখিয়া বাঁধ দেয়।

দ্বিপ্রহরে দুজনে ক্লান্ত দেহে পাথরের স্তূপের উপর বসিয়া নূন মুড়ি লঙ্কা খায়, সন্ধ্যার পূর্ব্বে ভরত গাঁইতি কাঁধে ফেলিয়া গান ধরে, আহুরী ঝুড়ি কোদাল মাথায় করিয়া পিছন পিছন আসে, গানের ধুয়া টানিতে টানিতে—তাহার পর রাত্রে ভাত রাঁধিয়া খায়—গরু দুইটিকে জাব মাখিয়া দিয়া অঘোরে ঘুমায়—

বন্ধ্যা মৃত্তিকা ধীরে ধীরে তাহার উষর আবরণ উন্মোচিত করিয়া স্বর্ণপ্রসূ হৃদয় উদ্ঘাটিত করিয়া দেয়। তার পরে ভাদ্রের প্রথমে এক বর্ষণে তাহার উপরে জল জমে, ভরত জমি চাষ দিয়া গরু দুইটিকে হিঙ্গুলবনে ছাড়িয়া দেয়—সে আনিয়া দেয় ধানের চারা, আহুরী উবু হইয়া পুঁতিয়া দেয় শ্রেণীবদ্ধভাবে। কৃশ বিবর্ণ গাছগুলি দেখিতে দেখিতে সবুজ হইয়া উঠে—ভরত ও আহুরী আইলের প্রান্তে দাঁড়াইয়া দেখে, স্মিতহাস্যে বলে—ফল্‌বেক, আহুরী ফল্‌বেক—দশ বারো সলি ফল্‌বেক—

আহুরী বলে, দাঁড়া দেখি থোড়াবেক ত?

*

কিন্তু ভরত যে ধান দাদন লইয়াছে তাহা যদি পরিশোধ করিতে হয়, তবে বৎসরের ধান থাকিবে না। মনিব তাহাদের জন্য বহু দিয়াছেন, দাদনের ধান অবশ্যই দিতে হইবে—তাহা দিলে যদিও চাউলের ধান থাকে, মুড়ি চিড়ার ধান থাকে না। ভরত তাহার সংসার জীবনে আর একবার চিন্তিত হইয়া উঠিল।

আশ্বিনের মাঝামাঝি। ধান রোপণ নিড়ানো সব হইয়া গিয়াছে—এখন কেবল বসিয়া খাওয়া। ভরত একদিন আহুরীকে কহিল, চল্ আহুরী, বসে বসে দাদনের ধান খাবেক কেনে! চল্, খাদে কাজ করি—উ খয়রা-শোলের বাউরীরা যায়—কত টাকা কামিয়ে আনে—টাকা লিয়ে খাবেক, অঘ্রাণে ফিরে ধান কাটবো, ঘর বাঁধবো—

কয়েক দিন ধরিয়া সলাপরামর্শ চলিল, কি করা যায়! ছেলেটাই বা কোথায় থাকে, গরুকটাই বা কে দেখিবে। ভরত আহুরীর বাবার সহিত পরামর্শ করিল—অবশেষে একদিন স্থির হইল—ভরতের ছেলে সেখানেই থাকিয়া উভয়ের গরু চরাইবে এবং গোবর কুড়াইবে। আর দুই মাস পরে তাহারা ফিরিয়া আসিলে আবার ছেলে ঘরে আসিবে। গরু চরাইবার পরিবর্ত্তে ছেলেটা খাইতে পাইবে। এমনি করিয়া কেবলমাত্র দুই মাস সে থাকিবে।

তাহার পর একদিন প্রত্যুষে আহুরী ও ভরত গুরুজনদিগকে প্রণাম করিয়া রওনা দিল ভাহুলিয়া কলিয়ারীতে—গোপালপুর হইতে সাত ক্রোশ পথ। সঙ্গে দুজনে তাই সেরখানেক মুড়ি লইয়া গেল।

*

শ্রাবণের শেষে পাঁচ ক্রোশ দূরে রাজনগরের মুখুজ্জেদের মাতৃবিয়োগ হইয়াছিল এবং খুব ধূমধামের সঙ্গে তাহার শ্রাদ্ধকার্য্য সম্পন্ন হইল না?

সেই শ্রাদ্ধে যে পণ্ডিত বিদায় হইয়াছে তাহা লোকবিশ্রুত হইয়া রহিয়াছে। প্রত্যেক পণ্ডিত একখানা থালা, একটা ঘটি, বস্ত্র ও উত্তরীয়-সহ একখানা মোহর পাইয়াছেন এবং সেদিন শাস্ত্রীয় বিচারে শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতকে আরও দুইটি মোহর দেওয়া হইয়াছে। মতি ঠাকুর মশায়ের নিমন্ত্রণ ছিল, কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে গোপালই গিয়াছিল এবং শ্রেষ্ঠ পুরস্কার দুইটি মোহর সেই পাইয়াছিল। গোপালের খ্যাতি সেদিন হইতে লোকবিশ্রুত হইয়া আছে।

বিজয়ার পরদিন গোপাল সকালে আসিয়া ডাকিল, বৌঠান, বেরিয়ে এস—

মতি ঠাকুরের স্ত্রী হেঁসেলে কি যেন করিতেছিলেন, গোপালের স্ত্রী ঘরের দাওয়া নিকাইতেছিল। তিনি জবাব দিলেন—কি বল্ না গোপাল—

গোপাল এত ছোট যে তিনি দেবরকে নাম ধরিয়াই সম্বোধন করেন। গোপাল কহিল, এস না বাইরে, শোনো—

অগত্যা তিনি বাহিরে আসিলেন, গোপাল তাহার পায়ের নিকট একছড়া কড়িহার রাখিয়া প্রণাম করিয়া কহিল, বিজয়ার প্রণাম ক'রলাম।

সবিস্ময়ে বৌঠাকরুণ কহিলেন, কোথায় পেলি তুই? এ হার পরবার বয়স আছে নাকি? বৌকে দিলি না কেন?

—সে তোমরা দিও। রাজনগরে দু'খানা মোহর বিদায় পেয়ে-ছিলাম তাই দিয়ে করলুম—

—তা আমাকে কেন? গৌরীকে দিলেই পারতিস্।

—বললুম ত তোমরা দিও।

ফল্৹ দুইজনে যখন বাদানুবাদ করিতেছিলেন সেই সময় মতি ঠাকুর আহুরা হাতে করিয়া অন্দরে ঢুকিলেন। মতি ঠাকুরকে দেখিয়া তা

স্ত্রী কহিলেন, এই ত্যাখো গো গোপালের কাণ্ড—হার তৈরী করেছে আমার জন্যে, আমার বয়স কম্‌ছে যেন।

মতি ঠাকুর বিস্ময় প্রকাশ করিয়া কহিলেন, কোথায় পেলি ?

—রাজনগরের পণ্ডিত-বিচারে ছুটো মোহর পেয়েছিলাম তাই দিয়ে—

—তা হার গড়াতে গেলি কেন ?

—বৌঠানের ত কিছুই নেই, সব দিয়ে ত বিয়ের সময় গহনা গড়েছেন—তাই—

মতি ঠাকুর পরিহাস করিলেন, ধার শোধ দিচ্ছিস্ বুঝি ? সংসারবুদ্ধি তোমার কত ! হরিহরের উপনয়ন আছে, তারপর তোর ছেলের অন্নপ্রাসন আছে, সোনা ঘরে থাক্‌লেই কাজ দেয়—

গোপালের স্ত্রী গৌরী ভাস্থরকে দেখিয়া দাওয়ার এক-কোণে দাঁড়াইয়াছিল এবং এখন অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া ঘরের মধ্যে আত্মগোপন করিল। গোপাল কহিল, সোনা ত ঘরেই রইল।

—বাণীর টাকাটা ত গেল—

—আর বুঝি পণ্ডিত-বিদায় হবে না ? হরির উপনয়নের আংটির সোনা পাব না—

মতি ঠাকুর হাসিয়া কহিলেন, কোন বুদ্ধি হল না—পণ্ডিত-বিদায় ত উঠে গেল বলে, সে কথা কি বুঝিস্ ! তা বৌমাকে কি দিলি শুনি ? ও ত ছেলেমানুষ—সখের সময়—

গোপাল লজ্জিত হইয়া চুপ করিয়া রহিল। মতি ঠাকুর মহাশয় ঠাকুর ঘরের দিকে যাইতে যাইতে বলিলেন, ওসব ছেলেমানুষী ক'রবি নে। আমি আর ক'দিন, এমনি করলে সংসার ক'রতে পারবি ?

গোপাল কোনমতেই বুঝিল না এটা অপচয় হইল কি করিয়া ! হইমন্তী মৃদুকণ্ঠে কহিল, একটু গলায় দাও না দেখি—ছোট হল কি না ?

বৌঠান সহাস্যে হার গলায় পরিয়া কহিলেন, যাক্ একদিন কত কোল ভাসিয়েছিস্, তোর দেওয়া হার যে গলায় পরবো তা কি ভেবেছি কোন দিন ?

গোপাল পরম উল্লাসে কহিল, ঠিক হয়েছে—ঠিক হয়েছে—আন্দাজে মাপ দিয়েছিলাম ত ? এখন হরির একটা আংটির জোগাড় ক'রতে হবে—

গোপাল কহিল, আশীর্ব্বাদ ক'রো বৌঠান, দাদার শেখানো বিদ্যেয় অনেক আন্‌বো—

রাত্রিতে গোপাল দেখিল—নতুন হারটা গৌরীর গলায় ঝুলিতেছে। গৌরী অপরাধীর মত কহিল, আমাকে পরিয়ে দিলেন আমি কি ক'রবো ?

গোপাল ব্যথিত হইয়া কহিল, ওরা শুধু দিলেনই আমাকে সারাজীবন, কিছুই নিলেন না—

গৌরী বেদনার্ত্ত স্বামীর মুখের পানে চাহিয়া কহিল, হরি ত রইল—তাকে আমরা সব ফিরিয়ে দেব—

গোপাল সপ্রশংস দৃষ্টিতে স্ত্রীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল—আত্মপ্রসাদের সঙ্গে একটু হাসিল—তাহার শিক্ষা বৃথা হয় নাই। সে সংক্ষেপে শুধু কহিল, ওদের সেবা ক'রো—দাদার শরীর আর তেমন পটু নেই—

*

ভাতুলিয়া কলিয়ারীর কুলির ধাওড়া।

প্রত্যূষে উঠিয়া আহুরী ও ভরত ধরণীর অন্ধকার গর্ভে অবতরণ করে। নীচেয় যাইয়া লণ্ঠন ও গাঁইতি লইয়া দুই জনে ভূগর্ভের

নিবিড় অন্ধকার সর্পিল পথ বাহিয়া যথাস্থানে যায়—ভরত চালায় গাঁইতি, কালো কয়লার স্তূপ খান্ খান্ করিয়া ভাঙ্গিয়া যায়, আহুরী চুপড়ি বোঝাই করিয়া টব ভর্ত্তি করে, তাহার পর দুইজনে সেটাকে ঠেলিয়া লইয়া যায় উপরের দিকে—সেখান হইতে কলে টানিয়া ভূগর্ভের জ্বালানিকে পৃথিবীর উপরে লইয়া আসে। এমনি করিয়া এক সপ্তাহ তাহারা কাজ করে—শনিবারে মুজুরী পায়। খোরাকী খরচ করিয়া সযত্নে তাহারা সঞ্চয় করে তাহাদের গৃহনির্ম্মাণের অর্থ।

মাঝে মাঝে সিফ্টবাবু আসেন দেখিতে—কাজ কিরূপ হইতেছে। মাঝে মাঝে আহুরীর মুখের উপর লণ্ঠন উঁচু করিয়া ধরিয়া হয়ত কেহ প্রশ্ন করেন, ঐ তোর মুনিষ—

আহুরী বলে, হ্যাঁ মোর মুনিষ—

—সাঙ্গার, না বিয়ের ?

—মোর সাঙ্গার মুনিষ।

একদিন বাবু আগাইয়া আসিয়া প্রশ্ন করিলেন, তোর নাম কি ?

ভরত জবাব দিল—ভরত—

—কতদিন এসেছিস ?

—এক মাস হ'ল—

—কত করে হপ্তা পাস্—

—দু'জনে বার টাকা পাই—বাবু—

বাবু সমবেদনার স্বরে কহিলেন, এতে তোদের চলে ?

—চলে বাবু, কোনমতে—

—শোন—আমার বাসায় তোর কামিন যদি কাজ করে আরও এক টাকা পাবি। কিছুই না, একা থাকি, বাসন ধুয়ে দিবি, কাপড় কেচে দিবি, আর চানের জল তুলবি—এক ঘণ্টা কাজ।

আহুরী জবাব দিল, কখন করবো? খাদে কাজ করে তার পরে কখন করবো?

বাবু হাসিয়া কহিলেন, সে ব্যবস্থা আমি করে দেব। তোর চিন্তার দরকার নেই। বুঝলি? তোর নাম কি?

আহুরী কহিল, মোর নাম আহুরী—

—তা আহুরী শোন, এদিকে কয়লা আছে, টব ভর্ত্তি ক'রতে হবে। আয় আমার সাথে—

আহুরী ও ভরত নূতন কলিয়ারীতে আসিয়াছে, তাহারা এত কিছু বুঝে না—চিরদিনের জন্যও আসে নাই। নূতন গৃহনির্ম্মাণের খরচাটা রোজগার করিবার জন্য আসিয়াছে মাত্র। শিল্পাঞ্চলের কলুষ ও গ্লানির সঙ্গে এই প্রকৃতির শিশুর কোন পরিচয় নাই। আহুরী বাবুর পিছনে পিছনে চলিল—দুই তিনটা অপরিসর গলি পার হইয়া অন্ধকার নির্জ্জন একটা কোণে দাঁড়াইয়া বাবু কহিলেন—শোন্, নতুন এসেছিস্ কোন কিছুই জানিস্ না। এ সব আমার হাতে, আমার ওখানে কাজ সেরে একঘণ্টা পরে খাদে নামবি, আবার একঘণ্টা আগে ছুটি পাবি। এদিকে হপ্তার মুজুরী পাবি, ওদিকে কিছু পাবি—বুঝলি—

আহুরী তাহার স্বার্থটা দেখিয়াছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু কহিল, উঃ ভরত একলাটি—কাজ করবেক কেমনে? ওকে ছাড়তে মু লারবো—

—একলাটি কোথা? তুই ত আস্‌বি? আর দেখ এসেছিস্ ত টাকা রোজগার করতে? টাকা পাবি—তাতে তোর ক্ষতি কি?

আহুরী চিন্তিত হইয়া কহিল, দেখি, উঃ যদি বলে তবে করবো।

—হ্যাঁ রে করবি, আরও টাকা পাবি। আমার কথা শুন্‌লে অনেক টাকা রোজগার করতে পারবি। টাকা এখানে ছড়ানো, কেবল

খুঁটে নেওয়া চাই—এখন বয়স আছে টাকা রোজগার করে নে। বুড়ো হ'লে ত পারবি না ?

আহুরী কহিল, হ্যাঁ, দেখি ভরত কি বলে—

বাবু কহিলেন, কুছ্ পরোয়া নেই, ভরতকে ভাল মদ খেতে দেব। বলবি, বাবু সব স্থবিধে করে দেবে—

বাবু আহুরীর কয়লার কালিতে মলিন কাঁধের উপর একটা চাপ দিয়া কদর্য্য ভঙ্গিতে কি যেন একটা কহিলেন—তাহার অর্থ আহুরী বুঝিল না, কিন্তু মনে মনে কেমন যেন সন্দেহ হইতে লাগিল।

আহুরী ফিরিয়া আসিয়া ভরতকে সবই কহিল, ভরত সহজ সরল মানুষ। সে কহিল, ভালই হবেক আহুরী, ছুটিও পাবি, টাকাও রোজগার করবি—ভালো বটেক—

আহুরী কহিল, কি জানি কেমন মানুষ। তু ছাড়া মু কোথাও যাবো নাই—

ভরত হাসিয়া কহিল, ডর কিসের আহুরী। ওরা বাবু লোক, ভদ্দরলোক, মোরা ত ছোটলোক কামিন কুলি—তোকে সাঙ্গা করবেক না আশনাই করবেক ? ঘরকে কেউ নেই—তাই ঝি চাকর খোজা করলেক্—

আহুরী কহিল, তু ত মরদ, তোর ডর কি ? মোর ত ডর লাগবেই—

কথাটা তখন মীমাংসা হইল না। কে একজন কর্ত্তাব্যক্তি আসিয়াছে অনুমান করিয়া ভরত ঘন ঘন গাঁইতি চালাইতে লাগিল।

*

আহুরী ছোটলোকের ঘরের বৌ, কিন্তু তাহার দেহের মধ্যে কোথায় যেন একটা কোমলতা ও সৌন্দর্য্য ছিল যাহা পুরুষের চিত্তকে উদ্বেলিত

করিতে পারে। তাহার দেহের সপিল ভঙ্গি, মুখে একটা কমনীয়তা সহজেই লোকচক্ষুকে আকর্ষণ করিতে পারিত। তাহার উপরে এই অঞ্চলের কুলি-কামিনগণের মধ্যে যে একটা পুরুষালি কঠোরতা ও খাদের পরিশ্রম-প্রসূত রুক্ষতা থাকে সেটা তাহার মধ্যে নাই—সহজ সরল গ্রাম্য জীবন ও মুক্ত উদার মাঠের দেওয়া কোমলতা ও শুচিতা তাহার চেহারার মধ্যে পরিস্ফুট। এইটাই বোধ হয় বাবুর চক্ষুকে আকর্ষণ করিয়া তাহার উচ্ছৃঙ্খল ইন্দ্রিয়বৃত্তিকে প্রলুব্ধ করিয়া থাকিবে।

পরের দিনেও খাদের মাঝে বাবু আবার আহুরীকে ডাকিয়া প্রশ্ন করিলেন, কিরে আহুরী, কাজ করবি না কি ?

যাহার অধীনে কাজ করিতে হইবে তাহাকে বার বার প্রত্যাখ্যান শোভন নয়, তাই আহুরী কহিল, তু কি বলিস্ বটে ভরত ? কাজ করবেক ?

—তু যা না—মোর কি ?

বাবু কহিলেন, হ্যাঁ তাই যাবি। ছুটি চাস্, না ছুটির পর যাবি !

আহুরী কহিল, ছুটির পর যাবো—

—হ্যাঁ আমি হাজরীবাবুর ঘরে থাক্‌বো, তোকে সঙ্গে নিয়ে ঘর দেখিয়ে দেব।

আহুরী কহিল, যাবেক হুজুর—

বাবু চলিয়া গেলেন, কিন্তু আহুরীর বুকের মাঝে একটা অজ্ঞাত আশঙ্কা ঢিপ্ ঢিপ্ করিতে লাগিল। আহুরী কয়লা বোঝাই টবটা ঠেলিতে ঠেলিতে কহিল, শুন্ ভরত, তু উনুনে আঁচ দিবি, আঁচ উঠতে না উঠতে মু যাবো ঘরকে—

ভরত টবটাকে প্রবল একটা ধাক্কা দিয়া নীচু দিকে ঠেলিয়া দিয়া কহিল, হ্যাঁ যাবি—দেরী হবেক ত ভাত তুলে দেবেক—তু তরকারী বানাবি—

আহুরী কহিল, দুমাসে দু'কুড়ি টাকা ত আস্‌বেক। কেনে আর বাবুর বাড়ী এঁটো মল্‌বো?

—যা কেনে, বাবু এত করে বল্‌লেক।

দুইটার ঘণ্টা পড়িলে ছুটি হয়—ঘণ্টার সঙ্গে সঙ্গে কাজ ছাড়িয়া তাহারা উপরে উঠিল। হাজরীবাবুর ঘরে বসিয়া বাবু সিগারেট খাইতেছিলেন, তিনি কহিলেন, চল্‌ আহুরী—চল্‌—

হাজারীবাবু একটু বক্র নয়নে তাকাইয়া মৃদু হাসিলেন—ইংরাজিতে কি যেন কহিলেন, উপস্থিত জনতার কেহই তাহা বুঝিল না আহুরী বাবুর সঙ্গে চলিল—

কুলিদের ধাওড়ার পূবে বাবুদের কোয়াটার। বাবু ঘর খুলিয়া কহিলেন, নে আহুরী বাসন দুটো ধুয়ে দে, একটু জল তুলে এই বালতিতে রাখ, এই ত কাজ।

আহুরী দেখিতে দেখিতে আদিষ্ট কাজগুলি শেষ করিয়া ফেলিল। বাবু হাতপা ধুইয়া বারান্দায় একটা আসন পাতিয়া বসিলেন এবং আহুরীকে কহিলেন, বৌ ছেলেপুলে এই দিন পনর চলে গেছে বাপের বাড়ী বুঝলি, একা রেঁধে খেতে কষ্ট হয়, তারপর কাজ রয়েছে। নে একটু তামাক সাজ—তুই তামাক খাস্‌ ত?

আহুরী তামাক সাজিয়া দিল। বাবু তামাক টানিতে টানিতে কহিলেন, দাঁড়া, তামাক খাবি—

তামাক নিঃসৃত একটা সুগন্ধ স্থানটাকে সুগন্ধী করিয়া ফেলিল। আহুরী তামাক খায়, সে এই তামাকু কিরূপ তাহা দেখিবার জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল—বাবুর ধুমপানান্তে কলিকায় তামাক টানিতে টানিতে আহুরী মনে মনে প্রশংসা করিল—চমৎকার তামাকু, কিন্তু তাহাতে ঠিক গলায় আঁচ দেয় না।

বাবু কহিলেন, ওবেলার ক'খানা লুচি রয়েছে নিয়ে যা খাবি। এবেলা দুটো ভাতই রাঁধবো—

আহুরী আঁচলে লুচি কয়খানি বাঁধিয়া যাইতে উদ্যত হইল। বাবু কহিলেন, কাল আসবি। আর পরের সপ্তাহে তোর সময় বদলী করে দেব বুঝলি। বেলা দু'টোয় নাববি খাদে—আর দশটায় ছুটি—সেই ত ভাল—

—না বাবু, এই ভাল—রাঁধতে বাড়তে সুবিধে হয়—

বাবু কহিলেন, তোকে খুব ভাল লাগে বুঝলি, নইলে যার তার দেওয়া জল আমার পছন্দ নয়! যা দরকার বল্‌বি—

*

কয়েকদিন এই ভাবেই চলিল—

শনিবারের দিনে সপ্তাহের টাকা দেওয়া হইতেছে, হঠাৎ সেখানে দেখা গেল ম্যানেজার সাহেব স্বয়ং উপস্থিত হইয়াছেন এবং সপ্তাহের মুজুরী দিবার সময় আহুরীকে দেখাইয়া কি যেন একটা কহিলেন, আহুরী তাহার কিছুই বুঝিল না, কিন্তু বাবু যেন কি একটা জবাব দিলেন। সাহেব আহুরীর দিকে চাহিয়া একটু দেখিলেন এবং স্মিত হাস্যে কহিলেন, এ বাবু, এটো কব আয়া?

—এই এক মাস আয়া হুজুর—

—বহুত আচ্ছা, বহুত আচ্ছা, বক্‌শিস্ কর দেগা—

আহুরী সপ্তাহের টাকা ভরতের হাতে দিয়া বাবুর ওখানে কাজ করিতে আসিল। বাবু তখনও আসেন নাই, একটু অপেক্ষা করিতেই তিনি আসিয়া দরজা খুলিয়া দিয়া কহিলেন, তোর কপাল ভাল আহুরী। সাহেবের নজর পড়েছে, টাকা রোজগার করবি কত! তবে আমি এঁটো ছাড়া সায়েবকে খাওয়াইনে, এই যা পুণ্য কাজ একটা করি—

বাবুর কথা বলিবার রকম দেখিয়া আহুরী কহিল, কি বলছিস্ বাবু— তু রস খেয়েছিস্—

বাবু হাসিতে ফাটিয়া পড়িয়া কহিলেন, হ্যাঁরে শনিবারে রস্ খায়না কোন শালা ? চল তু রস্ খাবি, ভরপেট চল—চাট্ খাবি—

আহুরী কহিল, মু রস্ খাই না—চল তাড়াতাড়ি কাজ করা লাগবেক্ —ঘরকে যাবেক—

—হ্যাঁ যাবি, যাবি, একবার শয্যা গ্রহণ করে, রস্ পান করে, পাঁঠার ঝাল খেয়ে যাবি বই কি ? তোর মরদের কাছে যাবি বই কি ? সে বেটা রস্ খেয়ে একলাটি কি করবে।

বাবু বারান্দায় বসিয়া পড়িয়া টানিয়া টানিয়া কত কি বলিতে লাগিলেন। আহুরী দ্রুত কাজ শেষ করিয়া কহিল, কাজ হল—যাবেক এখন—

বাবু কহিলেন, শুন্ শুন্ আহুরী, মাথা খাস্ শুন্। এই নে দু'টাকা। এদিকে আর একটা কথা শোন্—

—টাকা কেনে রে ?

—আমি দিলুম নিয়ে যা, তোদেরই ঘাড়ভাঙ্গা টাকা তোদেরই দেব। এদিকে শোন্—

বাবুর মাতলামি দেখিয়া আহুরী খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল—রহস্যচ্ছলে আগাইয়া আসিয়া কহিল, কি বলছিস্ বাবু বল না কেনে ?

—লে টাকা লে, নথ্নী গড়িবি, মল গড়িবি, আয় এদিকে আয়, ঘরকে চল্, রস্ খাবি, চল্—

—ঘরকে যাবে কেনে বল্ না ?

—ওরে সতী সাবিত্রী তুমি জানো না কিছু ? শালী তোর মত কত আহুরীকে দেখলাম, টাকায় কিনা হয়, না হয় আর দু'টাকা, না হয় আরও দু'টাকা এইত—চল্।

বাবু আহুরীর হাতখানা ধরিয়া ফেলিয়া তাহার মাঝে দু'টি টাকা

গুঁজিয়া দিয়া কহিলেন, চল্ সতী-লক্ষ্মী, চল্ একবার দ্রৌপদী হবি, চল্—

আহুরী হাত ছাড়াইয়া লইয়া টাকা দুইটি বাবুর মুখের উপর ছুঁড়িয়া দিল। প্রদীপ্ত বহ্নির মত প্রজ্জলিত হইয়া কহিল, তু ভদ্রলোক, টাকার জন্য ধরম খোয়াবী, তোর মা-বোন টাকায় জাত দেবেক—টাকার জন্য মু ধরম খোয়াবো কেনে?

আহুরী মুহূর্ত্ত অপেক্ষা না করিয়া হন্‌হন্ করিয়া চলিয়া আসিল।

আসিতে আসিতে শুনিল, বাবু দ্রব্যগুণে চীৎকার করিতেছেন, ধরম খোয়াবেক কেনে? শালী তেরী জান মার দেগা—জানিস্ আমি যুধিষ্ঠিরের ভায়রা ভাই, তবুও শালী চলে গেল—তাজা খুন পিয়েগা—তোর নাড়ী টেনে বের করেগা—

বাবুর বীরত্ব-ব্যঞ্জক বক্তৃতা চলিতে লাগিল—আহুরী কোন দিকে কোন লক্ষ্য না করিয়া ধাওড়ায় ফিরিয়া আসিল।

পরদিন সে শুধু বলিল, বাবুর বাড়ী কাজ সে আর করিবে না।

*

বাবুর বাসার কাজ আহুরী ছাড়িয়া দিয়াছে, কিন্তু বাবু তাহাকে ছাড়েন নাই। বাবু সেদিন আহুরীকে নির্জ্জনে পাইয়া কহিল, আহুরী আর কাজ করবি না কেন?

—তু ভদ্দরলোক না, মু কাজ করবো না।

—টাকা পাবি—

—টাকা মু মাগবে না, ধরম মাগবে। ভগবান টাকা দেবেক, ধরম দেবেক—

—রস খেয়ে বেসামাল হ'য়ে গেলাম, তাই বুঝলি? তাতে দোষ

কি ? আর ধর সাহেব তোর দিকে নজর দিয়েছে, রাত্রে তার বাংলায় গেলে নতুন কাপড় পাবি—আর দশ টাকা পাবি—বুঝলি। খাদে নাম্‌তে হবে না, হাজরী পাবি—

আতুরী কহিল, আবার ওসব বলবি ত মরদকে বলে দেবো, একচড়ে দাঁত ভেঙ্গে দেবেক—

—তুই মরদকে বল গিয়ে আমিও সাহেবকে বলবো গিয়ে, দেখবি ঠেলাটা কি ? কলিয়ারীতে এসেছ সতীগিরি ফলাতে—তাই যদি হয় তবে এলি কেন ?

আতুরী কহিল, ঘর পুড়লেক কেনে ? ঘর বাঁধবেক তাইত খাদে কাজ করলে, নইলে তোর খাদকে কোন কামিন আস্‌বেক—ক্ষেতে কাজ করবেক—

—আচ্ছা সবই বুঝলুম, শিগ্‌গিরই বুঝাবো—তু'মাসে তু'শো টাকা রোজগার করতে পারতিস্, যা কপালে নেই, খাদে গাঁইতি চালিয়ে মর্—

—কাজ করবো টাকা লেবো, মরবো কেনে ? ধরম দেবেক কেনে ? তু দে, তোর কামিনকে দে—

বাবু অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া চলিয়া গেলেন।

পরের শনিবার ভরত একটু পচুই খাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিল কিন্তু আতুরী খাইতে দেয় নাই। সে বলিয়াছিল আর ওসবে দরকার নাই, এখন বাড়ীতে ফেরা যাক। এখানে থাকিতে তাহার ভাল লাগিতেছে না, কিন্তু ভরত আরও দশটি টাকা সংগ্রহ করিয়া যাইতে চায়।

শনিবারের রাত্রি প্রহরের সময় আহারাদি শেষ করিয়া আতুরী ধাওড়ার সামনে অল্প পরিসর উঠানটায় বসিয়া কহিল, চল্ ঘরকে যাই—

—এ ঠাঁই ভাল নাই—

ভরত কহিল, আর এক হপ্তা কাজ করবেক, ব্যাস্ দু'-কুড়ি টাকা লিয়ে ঘরকে যাবেক—

—না রে, তু চল্। হেথা ধরম নেই ভরত, ধরম নেই—

—কি বলছিস্—

—হু, বাবু টাকা দিয়ে ধরম লিতে চাইবেক, সাহেব ধরম লিতে চাইবেক, তু চল্—

ভরত আয়েস করিয়া বারান্দার দেয়ালে ঠেস্ দিয়া বসিয়া ছিল ; সে কহিল, কি বলছিস্ আদুরী—

—ঠিক বলছি ভরত, তু চল। পাথরে গাঁইতি চালাবি, মু পাথর কুড়াবো, এই কালো কয়লা আর কুড়াবেক নাই—

—কোন শালা কি বল্‌লেক বল না—মু খুন করবো—

আদুরী কহিল, খুন ক'রবেক, খুন হবেক—তবু ঘর যাবি না? মোর ধান এত বড় হবেক, থোড়াইছে, পাক্‌বেক, কাটা করবেক, ঘরকে লেবেক, তু চল্—সাহেব মোকে ধরে লেবেক কুঠিতে—ধরম যাবেক—

ভরত উত্তেজিত হইয়া কহিল, সাহেব লেবেক—আমি জান দেবে, লেবেক কেমনে—

—তু একলাটি ভরত, তু কি করবি? ওরা টাকা দেবে কত লোক আস্‌বেক, সেপাই আস্‌বেক—চল্ ভোর রাতে ঘরকে যাই—

আদুরীর মনে একটা আশঙ্কা দুলিতেছিল—কোন সময়ে যেন সাহেবের লোক তাহাকে জোর করিয়া ধরিয়া লইয়া যাইবে। সেদিন সাহেব যে ভাবে তাহার দিকে, তাহার দেহের দিকে লুব্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়াছে, অবোধ্য ভাষায় কি যেন বলিয়াছে, তাহাতে তাহার মনে নিরন্তর একটি আশঙ্কা দোলা দিয়াছে। ভরতকে ভয়ে সে-কথা সে জানায় নাই, কিন্তু আজ পাণ্ডুর জ্যোৎস্নালোকে সে কথাটি না বলিয়া পারিল না। তাহার মনে হইতেছে—বিপদ আসন্ন হইয়া আসিয়াছে—

আহুরী পুনরায় কি যেন কহিতে যাইতেছিল এমন সময় সেপাই সমেত কয়েকটি লোক আসিয়া কহিল, আহুরীর কোন ঘর—

আহুরী মুহূর্ত্তে চিৎকার করিয়া উঠিল, কাট্‌লেক কাট্‌লেক্—সাঁপে কাঁটলেক্ রে? এই হে হেথা সাপ গেল—

ভরত লাফাইয়া আসিয়া কহিল, কোথা, কোথা সাপ?

আহুরী উঠানে চীৎকার করিয়া ছট্‌ফট্ করিতে আরম্ভ করিল। ভরত তাহাকে ধরিয়া কহিল, কোথা কাটলেক?

—পায়ে কাটলেক—সঙ্গে সঙ্গে ভরতের হাতে একটী টিপ দিয়া জানাইল এইটি অভিনয় মাত্র।

ভরত আহুরীর পায়ে দড়ি বাঁধিতে বাঁধিতে প্রশ্ন করিল—ব্যথা লাগ্‌লে আহুরী—বুঝতে লারছিস্—

—বুঝতে লারছি ভরত—লারছি—মু মরবো—

আর দুই একটি কথা বলিয়া আহুরী অজ্ঞান হইয়া গেল। ভরত কাঁদিয়া উঠিল—

সেপাই প্রশ্ন কা আহুরী ভাবি

... সে কহিল, ঐ কোন্ হায়—

—হা বটে, ওঁমোর কামিন বটে!

কো—হোথা ওইহিল, আহুরী হায়? সঙ্গের একজন কহিল, হ্যাঁ সাপে

—হা হা,...ড়েজি; তাই সায়েবকে বলি। ওকি আর বাঁচবে? চল—

আহুরী...জি ব্যথিতভাবে কহিল, একদম কাট্ দিয়া—রামজি খতম কর

...হাদের সায়েবকো নেই মান্‌তা—চল—সায়েবকো বাংলায়েঙ্গে—

...রিপূর্ণ সাহেবের লোকেরা আহুরীকে ধরিয়া লইয়া যাইতে আসিয়াছিল—মিলি...বের ব্যসন-বহ্নিতে তাহাকে উৎসর্গ করিতে পারিলে কিছু বকসিস্ করিল...ত, কিন্তু আহুরীকে মৃতপ্রায় দেখিয়া তাহারা ব্যথিত চিত্তে প্রস্থান ক...ছে—।

...রিপাশে নির্জ্জন দেখিয়া আহুরী কহিল, ভরত, চল, ঘরকে যাই।

টাকা তু কাপড়ে বাঁধ, আর মোর আর তোর কাপড় বাঁধ, চল্‌ পালাবেক—

ভরত আহুরীর ইঙ্গিত বুঝিল এবং শ্রমার্জ্জিত টাকা কয়েকটিকে কোমরে বাঁধিয়া এবং ছিন্নবস্ত্রের সম্বল একটি পুঁটুলিতে ভরিয়া কহিল, চল আহুরী—

সর্পাঘাতের সংবাদ প্রচারিত হয় নাই—আশে পাশে ধাওড়ায় যাহারা ছিল তাহাদের শ্রবণশক্তির বিলোপ ঘটিয়াছিল; কারণ আজ শনিবারের রাত্রি, আর যাহারা দেখিয়াছিল তাহাদের আহুরীর জীবন রক্ষার জন্য ব্যস্ততার কোন কারণ ছিল না।

নিশীথের নির্জ্জনতার মধ্যে আহুরী ও ভরত গোপালপুরের রাস্তা ধরিল। পাণ্ডুর চাঁদ ধীরে ধীরে অস্তমিত হইল—আকাশ-ভরা অসংখ্য হাটা করত্বের হইয়া উঠিয়াছে। আহুরী কহিল, ভরত, ক ক্রোশ

—তিন ক্রোশ হ৺

—তু চল্‌—ঐ মউলবনকে ঘুম [illegible]—[illegible] লারবে—

উন্মুক্ত আকাশের নীচে, মহুয়াবনের ছায়ায় ভরতের [illegible] রাখিয়া আহুরী পরম নিশ্চিন্তে পরম তৃপ্তির সঙ্গে ঘুমাইয়া লই লোক উদার আকাশ তাহাদের মাথার উপরে তাহার দৈনন্দিন আবর্ত্ত করিতে লাগিল।

*

প্রভাতের স্বর্ণরশ্মি স্বর্ণবর্ণ ধানের ক্ষেতের শিশির বিন্দুতে ঝ[illegible] করিতেছে। মাঠের মাঝ দিয়া সরু পায়ে-চলা পথে ভরত ও [illegible] চলিয়াছে—তাহাদের দেহের স্পর্শে শিশির বিন্দু মাটিতে

পড়িতেছে—হঠাৎ মঞ্জরী পরিপূর্ণ একটা ক্ষেতের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আহুরী কহিল, মোর ক্ষেতে কি এমনি মঞ্জরী হলেক রে ভরত—

ভরত কহিল, হা ডাঙ্গাটোতে অঘাণে পাকবেক—কলম কাঠি বটে।

আহুরী সস্নেহে শিশির স্নাত একটী মঞ্জরীর গায়ে পরশ বুলাইয়া পরম আদরে কহিল, সুন্দর ফলন দেবেক রে, দুধভর ধান্ বটেক—লে মাথায় লে—

আহুরী একটী মঞ্জরী ছিঁড়িয়া ভগবানের দেওয়া আশীর্ব্বাদের মত আপনার স্থলিত চুলের মাঝে পরাইয়া দিল। কহিল, মোরা দুটি ধান কাট্‌বেক—

—যা বটে, ধান ত হবেক রে—

তাহাদের ধানও এত বড়ই হইয়াছে, এমনি দুধভরা মঞ্জরীতে স্বর্ণ-ক্ষেত্র সমাকুল হইয়াছে এই চিন্তায় দুইটি হৃদয় নাচিয়া উঠিয়াছে। আর একখানি মাঠ পার হইলেই, চিরপরিচিত গোপালপুরের সেই মাঠ—তাহাতে তাহাদের শ্রমযত্ন-রচিত ধান্যক্ষেত্র পরিপূর্ণ সুধাভাণ্ড লইয়া অপেক্ষা করিতেছে। আহুরী ভাবিতে ভাবিতে আত্মহারা হইয়া উঠিয়াছিল। সে কহিল, ঐটো হিঙ্গুলবন ভরত—

—হা বটে, ওটো শালবন, পশ্চিম বগলে গাঁ বটে—

—হোথা ওই—হোথা ঘর মোদের—না ভরত—

—হা হা, হোথা মোদের ঘর।

আহুরীর চোখ ছাপাইয়া জল আসিতে লাগিল—হ্যাঁ ঐখানেই তাহাদে ঘর, প্রতিবেশী, দিঘি, মাঠ, আমবন চিরসুন্দর—চিরপরিচিত। রিপূর্ণ কৃতজ্ঞতায় আহুরী চোখ মুছিল—এই প্রিয়জন রাখিয়া তাহারা থায় গিয়াছিল ?

াহুরী ও ভরত যখন বাড়ী ফিরিয়া আসিল তখন খানিকটা বেলা ছ—তাহারা সঙ্গের বোঝা দাওয়ায় নামাইয়া চারিদিকে চাহিয়া

দেখিল—তালপাতার ঘরে গরুগুলি তখনও দাঁড়াইয়া আছে, খাইবার কিছু নাই তাই এদিক ওদিক চাহিতেছে, ঘরে কুলুপ দেওয়া, দাওয়ায় ইঁদুরে মাটি তুলিয়াছে, উঠানে আগাছা জন্মিয়াছে। ঘরের চারিপাশে পড়োবাড়ীর আবর্জ্জনা ও বিষণ্ণতা লক্ষ্য করিয়া কহিল, কি হইছে রে আহুরী! ঘরখানাকে ইঁদুরে ফাঁপরা করলেক রে?

ভরত চারিপাশে চাহিয়া গরুগুলির নিকটবর্ত্তী হইল, গাভীটির গায়ে হাত দিতেই সে ভরতের হাতখানা চাটিয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিল—আহুরী তু দেখ হেথা। মুংলী কেমন চিন্‌লেক—খড় নাই রে?

গরুগুলির গায়ে সস্নেহে হাত বুলাইয়া ভরত ফিরিয়া আসিল। তাহার বাড়ীর এই জীর্ণ-ভগ্নদশা, সর্ব্বাঙ্গের বিষণ্ণতা ও রিক্ততা তাহার অন্তরকে ব্যথিত করিয়া তুলিল। সে দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কহিল, ঘর ছেড়ে আর যাবেক নাই—কি হইছে রে? কি হইছে—দেখছিস্—

আহুরীও ব্যথিত হইয়াছিল, কত শ্রমে যত্নে সে ঘর নিকাইয়া, উঠান নিকাইয়া পরিষ্কার করিয়া রাখিত তাহা এত শ্রীহীন হইয়া গিয়াছে। সেও প্রতিধ্বনি করিল, কোথা আর যাবেক—ঘর ছাড়বেক নাই আর—

তু যা, বেটাকে ডাক্। বাবার সাথে দেখা করবি না?

আহুরী নটবরের বাড়ী তথা পিত্রালয়ের উদ্দেশ্যে রওনা দিল। ভরত উঠানের আগাছাগুলি টানিয়া তুলিতে তুলিতে দেখিল, গরুগুলি সতৃষ্ণ নয়নে তাহার দিকে তাকাইতেছে। সে বুঝিল তাহারা আহার্য্য চাহিতেছে কিন্তু কি সে দিবে। গরুগুলি কঙ্কালসার হইয়াছে। ভরত ঘরের চালা হইতে খড় টানিয়া তাহাদিগের সম্মুখে ফেলিয়া দিল—জলে ভিজিয়া খড়গুলি লবণাক্ত হইয়াছে, গরুগুলি কাড়াকাড়ি করিয়া খাইতে লাগিল—

ভরত উঠানে দাঁড়াইয়া ভাবিতেছিল, এই তাহার স্নেহকোমল গৃহ—প্রতি ধূলিকণা তাহার কত পরিচিত, বাল্য কৈশোর যৌবনের কত স্মৃতি

বিজড়িত হইয়া আছে এই গৃহের সঙ্গে, এই জননী-স্বরূপিণী গৃহকে ত্যাগ করিয়া সে কোথায় গিয়াছিল? যেখানে গিয়াছিল সেখানে দয়া নাই, মমতা নাই, ভূগর্ভের তিমির সঞ্চিত হইয়া আছে। আর আছে অর্থের মোহ ও তাহার উলঙ্গ দম্ভ। দারিদ্র্য যতই কঠোর হোক্, তবুও সে আর এই সাতপুরুষের ভিটা ত্যাগ করিয়া যাইবে না—

ভরত অশ্রুপূর্ণ চোখ তুলিয়া চাহিয়া দেখিল—বসন্তসায়র জলে টলমল করিতেছে, সাদা বক কুলে বসিয়া আছে খাদ্যের আশায়। কঠিন মৃত্তিকার গর্ভে তাহারাই ত সৃষ্টি করিয়াছিল ঐ জলাশয়। কর্ত্তার দয়ায় তাহারা বাঁচিয়া ছিল, গৃহদাহে সর্ব্বস্বান্ত হইবার পর। ভরত মনে মনে আর একবার কহিল, এমনি পিতৃতুল্য কর্ত্তাকে রাখিয়া আর সে কোথায়ও যাইবে না।

*

নূতন করিয়া সংসার পাতিতে বেলা অনেক হইল।

বৈকালে ভরত কহিল, তু যাবি আহ্লরী, হিঙ্গুলবনের ধারে জমিটা একবার দেখবি না?

আহ্লরী কহিল, চল—

গ্রীষ্মের প্রচণ্ড রৌদ্রে গাঁইতি চালাইয়া পাথর কুড়াইয়া তবে তাহারা এই জমি চায করিয়াছিল—কত শ্রমে কত যত্নে। তাহারা মাঠ পার হইয়া [illegible]লবনের ধারে জমিটার আইলে আসিয়া দাঁড়াইল।

ক[illegible] হইয়াছে, মঞ্জরীগুলি ধানের ভারে অবনতশীর্ষ। ভরত সো[illegible]। বলিয়া চলিল, দেখছিস্ আহ্লরী দেখছিস্—সোনা ফলতে লে[illegible] রে—

সা[illegible] বটে, নতুন জমি জোর করতে লেগেছে ত?

হইয়া[illegible]

—হা—হা—

একপাশের সামান্য কিছু ধান গরুতে খাইয়া গিয়াছে। ভরত সেইদিকে ছুটিয়া গিয়া একটা অশ্লীল গালাগালি করিয়া কহিল, দেখছিস্ আদুরী গরুতে খাওয়া করালেক—শালারা—

আদুরী কোন জবাব দিল না—সে ভাবিতেছিল অন্য কথা যদি পৃথিবীর বুকে গাঁইতি চালাইতে হয়, তবে ভূগর্ভের তিমিরে গাঁইতি চালাইয়া কালি মাখিয়া কি লাভ। সে কহিল, গাঁইতি চালাবি ত, হেথা চালা—কয়লার কালি আর মাখবেক নাই।

ভরত কহিল, হাঁ বটে, আর ত কোথা যাওয়া করবেক না। হেথা সোনার ডাঙ্গালে সোনা ফলবেক—

প্রচুর ধান হইয়াছে, আর কয়েকদিন পরেই ধান কাটা চলিবে। তাহারা হৃষ্ট মনে ফিরিয়া আসিল। যে টাকা আছে তাহার সাহায্যে তাড়াতাড়ি ঘরখানি ভাল করিয়া তৈয়ারী করিতে হইবে—ধানকাটা আরম্ভ হইলে আর কিছু হইবে না।

*

সারদা মল্লিক রেলগাড়ী দেখিয়া আসিয়াছে—

চণ্ডীমণ্ডপে পাশা খেলার পরে সারদা তাহার বর্ণনা দিতেছিল। সারদা কহিল, প্রথমে বুঝলে মতি খুড়ো, প্রকাণ্ড একটা হাতির মত, ধোঁয়া উড়ছে। তার পিছনে বাঁধা অনেক গাড়ী, লোহার পাটির উপর দিয়ে গড় গড় করে যায়—

একজন প্রশ্ন করিল, তা হলে মাটির উপর দিয়ে চলে না? সেখান দিয়েও গরুর গাড়ীর মত যেতে পারে না?

—না, তাহ'লে চাকা বসে যাবে। পাথরের পথ, কাঠের পাটি বসানো—সায়েব বাঁশী বাজায়, তার পর গাড়ী ছাড়ে—

সারদা উঠিয়া দাঁড়াইয়া রেলগাড়ীর ভঙ্গি অবলম্বনে বলিতে লাগিল—শোনো, প্রথমে করলে—হি-স্-স্,...হুপ হুপ-প্ প্—তার পর হুপ্-হুপ্ হুপ্—হুপ্ পপ্ এই চল্‌লো গাড়ী।

সারদা চণ্ডীমণ্ডপটা নাচিতে নাচিতে ঘুরিয়া আসিয়া কহিল, গাড়ী কি বলে জানো?

সকলে হাসিতেছিল। সারদা কহিল, চলে আর বলে—দাদা কোথা, দিদি কোথা, ভালবাসা যেথা সেথা।

সারদার উল্লম্ফন নৃত্য ও তৎসহ রেল গাড়ীর গান সভাস্থলকে মাত্ করিয়া দিয়াছিল—সকলেই হাসিতেছিল। সারদা বসিয়া পড়িয়া কহিল, হেসো না খুড়ো হেসো না, মাঠের মাঝে নগর সৃষ্টি হয়েছে, দোকান পসার লোকজন, কিন্তু খাবার দফা শেষ—

ভগবতী কহিলেন, তার মানে?

—দুধ, তরকারী মাখন ঘি সব রেলে উঠে চলে যাচ্ছে, পাইকেড় এসে নিয়ে যাচ্ছে, দেখতে দেখতে দাম চড়ে যাচ্ছে। বাজারে তাদের ঠ্যালায় জিনিষ কেনাই ভার।

ভগবতী কহিলেন, বাবা, এত সর্ব্বনেশে ব্যাপার; রেলগাড়ী না এলেই ত ভাল। না হয় গরুর গাড়ী করেই যাবো—

সারদা কহিল, একদিন হাটে আনাজ-পাতি কেনাই গেল না। পাইকেড় সব এসে একধার থেকে কিনে নিয়ে গাড়ীতে উঠল। গ্রামের লোকে হাঁ করে দাঁড়িয়ে দেখলে। এক সঙ্গে যদি দু'মণ পাঁচ মণ বিক্রি হয়, তবে কে আর বসে বসে এক সের আধ সের বিক্রি করে—বল?

—দুধ কোথায় যাচ্ছে?

—ওই বর্দ্ধমান, কলকাতা। ছানা করে নিয়ে যাচ্ছে—শুনলাম সায়েবরা আজকাল খুব সন্দেশ খাচ্ছে—

হইয়া

ভরত আসিয়া দূর হইতে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিল। ভগবতী কহিলেন, কবে এলি রে ভরত—

—আজ্ঞে কাল।

—কি করে এলি—

—কয়লার খাদে দু-মাস কয়লা কাটা করলেক ঘরখানা বাঁধা করাবেক ত?

—ঘর হবে ত?

—হ্যাঁ কর্ত্তা, হবেক বৈ কি?

সারদা কহিল, আর কি দেখে এলি—

—সে অনেক হুজুর, রেল গাড়ী। কয়লা খাদ থেকে যেমনি ওঠা করে অমনি হুস্ হুস্ করে গাড়ীতে চলে যাওয়া করলেক—

—কোথায় যায়?

—সে মু কেমনে জান্‌বেক কর্ত্তা—

ভগবতী প্রশ্ন করিলেন, আবার যাবি নাকি?

—না, কর্ত্তা, হোথা আর যাবেক নাই; হেথা উপোস ক'রবেক, ভিটেয় মরবেক—হোথা আর যাবেক নাই—

—কেন রে? টাকা কামিয়ে এলি?

—হোথা ধরম ইজ্জত নেই কর্ত্তা, হোথা ধরম নেই—টাকা ত পরকালকে যাবেক নাই—

ভগবতী কহিলেন, ধর্ম্ম কি আর বেশীদিন থাকবে ভরত; যে রকম দেখছি চারিদিকে। চারিদিকে যদি হাহাকার পড়ে, তবে ধর্ম্ম আর কতদিন টিকবে। তোর কামিন কি বলে?

—সেটিও আর যাবেক নাই কর্ত্তা—

—বেশ, বেশ—এবার মন দিয়ে চাষ-আবাদ কর। হিঙ্গুল বনের সে জমিতে ত ভাল ধানই হয়েছে। এবার আর এক বিঘে তুলে নে।

—সেইটাই ক'রবেন এবছর—

—হ্যাঁ, তাই কর—

ভরত প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল—

*

সকালে ভগবতীর বৈঠকখানায় বসিয়া মতি ঠাকুর মহাশয় আলাপ করিতেছিলেন। মতি ঠাকুর কহিলেন, চাঁদু ত ইংরিজি পড়ছে, কেমন করছে?

—মাষ্টার মশায়রা ত ভালই বললেন। এখন ভাগ্যে যা থাকে তাই হবে। বামুনের ছেলে ইংরিজি পড়ে ম্লেচ্ছ না হ'য়ে যায়।

—শিক্ষা যে রকমই হোক, সেই ভাল। কোন শিক্ষাই বোধ হয় জগতে কোনো অন্যায় কাজ করতে বলে না। আর যদি তাই হয় তবে ইংরেজরা কি আর এতবড় দেশটা দখল করে রাজত্ব করতে পারতো। কিছু গুণ আছেই—

ভগবতী কহিলেন, তা হতেও পারে। হলেই মঙ্গল—

মতি ঠাকুর কহিলেন, গোপাল বল্‌ছিল ছেলেটাকে ইংরিজি পড়াতে। তার নাকি বুদ্ধি ও ধীশক্তি আছে। কিন্তু ইংরিজি শিক্ষা ত খুবই ব্যয়-সাপেক্ষ। এখন কি করি বলত ভগবতী। ইংরিজি পড়ালে নাকি ধনাগমের স্থবিধা হয়, কিন্তু ভাবছি ধনাগমের সঙ্গে ধর্ম্মের নিগম না হয়।

—সেটা ভাগ্য বলেই মনে হয়। যদি পড়ে ভালই হবে, দুজনে এক সঙ্গে থেকে লেখাপড়া করতে পারবে। এই ত চাঁদু শিগ্‌গিরই আস্‌বে। এক সঙ্গে পাঠিয়ে দেব সদরে। চাঁদু আর হরি এক সঙ্গেই পড়্‌বে—

কথাটা প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে এবং একটা শুভদিন মাত্র ঠিক করিতে বাকী আছে এমন সময় নবতাঁতি ও তাঁতি পাড়ার কয়েকজন

আসিয়া উপস্থিত হইল। প্রণামান্তে আলিসায় বসিল। ভগবতী প্রশ্ন করিলেন, কি নবদা? কি খবর?

নব হতাশার সঙ্গে কহিল, তাঁত ত সব বন্ধ হ'তে চলেছে—

ভগবতী এইরূপই একটা সংবাদ আশা করিতেছিলেন, তবুও তিনি প্রশ্ন করিলেন, কেন?

—ধুতি শাড়ী বিক্রী ত বন্ধ হ'য়েছে, গামছা আর মশারীর থান একটু আধটু বিক্রি হচ্ছে। ঘরে ঘরে একখানা তাঁতের বেশী আর চল্‌বে না—এখন খাবো কি করে? বেয়াইদের গ্রামে ত সব দেখলাম দু'চার জন কাপড়ের ব্যবসা আরম্ভ করেছে, আমরাও কি তাই করবো?

ভগবতী একটু চিন্তান্বিত হইয়া কহিলেন, তোমরা সকলেই যদি ব্যবসা কর তবে এত খদ্দের পাবে কোথায়?

—তবে?

ভগবতী নিরুত্তর হইয়া বসিয়া রহিলেন, কিছুক্ষণ বাদে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে মতি ঠাকুর মহাশয়ের মুখের দিকে চাহিলেন; কিন্তু মতি ঠাকুরও কোন জবাব দিতে পারিলেন না।

নব পুনরায় কহিল, বেয়াই বলছিল—কলে কাপড় বোনা হয়, একটা লোকে ২০।২৫ খানা কাপড় একদিনে বুন্‌ছে—এক সঙ্গে ৫০ খানা ধুতির তানা দেওয়া চল্‌ছে। কলে সূতা কাট্‌ছে—তা হ'লে আমরা কি করে পারবো? এখন জাত ব্যবসা ছেড়ে কি করে খাবো?

মতি ঠাকুর কহিলেন, সমাজে ভাঙ্গন ধরেছে নব, কি করে যে বাঁধ দেওয়া যায় তা ত বুদ্ধির অগম্য। আমিই বা কি ব'লবো, আর ভগবতীই বা কি বল্‌তে পারে। ওর কি সাধ্যি আছে যে তোমাদের সকলকে খাইয়ে বাঁচিয়ে রাখে?

—সে ত বুঝি ঠাকুরমশায়, কিন্তু ছেলে-পুলের হাত ধরে আমরা দাঁড়াই কোথা? তাই ভাবছি, এখন হালই ধরতে হবে। দু-চার বিঘা

যা আছে তাই এখন চাষ-আবাদ করে খাই, তার পরে দেখা যাবে—গোবিন্দ ত কেরোসিনের ব্যবসা করতে লেগেছে, ছোট ভাই জলধরকে বলি কাপড়ের ব্যবসা করতে—বেঁচে থাক্‌তে হবে ত ?

ভগবতী দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, হ্যাঁ বেঁচে থাকবার জন্যে সংগ্রাম আরম্ভ হল। বেশ সুখে জাতব্যবসা নিয়ে সকলে ছিলাম কিন্তু একি হ'ল ? নতুন কি ব্যবস্থা হবে সমাজের, কেমন করে সকলে আমরা বাঁচবো কিছুই বুঝছি না। তবে নবদা জেনো, যতক্ষণ আমার কিছু থাকবে ততদিন তোমরা মরবে না। তার পরে কি হবে জানি না—দেশের যে অবস্থা হ'ল এতে প্রজা খাজনা দেবে কি করে, আমিই বা কিসের বলে তোমাদের ভরসা দেব। তবে আপাততঃ ঐ কর নবদা—

নব ও তাহার সঙ্গীবৃন্দ উঠিয়া গেল। ভগবতী মতি ঠাকুরকে প্রশ্ন করিলেন, কেমন করে ভাঙ্গনটা এল ? কেমন করেই বা এই প্লাবনটা রক্ষা করা যায়—

মতি ঠাকুর হাসিয়া কহিলেন, এর মীমাংসা আমাদের শাস্ত্রে নেই, তবে তোমার চাঁদু যদি নতুন শিক্ষা পেয়ে কিছু করতে পারে। তবে কলে যদি দশজনের কাজ একজনে করতে পারে তবে বাকী নয় জনের অন্ন মারা যাবেই। তারা বেকার হ'য়ে দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করবেই এটা সাধারণ জ্ঞানে বুঝতে পারি। আর ন'জনের রুজি মেরে কল ফেঁপে উঠবে, মালিক বড় হবে—

ভগবতী কহিলেন, কল কি চল্‌বে—

—চল্‌ছে ভগবতী, চল্‌ছে। কলকাতায় নাকি কত কল এখনি বসে গেছে, আরও বস্‌বে। কত কলিয়ারী হ'য়েছে কয়লা উঠেছে কত—

ভগবতী কহিলেন, যারা বেকার তারা ত না খেয়ে মরবে না, আপ্রাণ

চেষ্টা করবে বেঁচে থাকতে যেমন করেই হোক, চুরি ডাকাতি অধর্ম্ম যেমন করেই হোক না কেন?

মতি ঠাকুর কহিলেন, হ্যাঁ, দেশময় একটা অরাজক দুর্ভিক্ষ চলবে। শাস্ত্রে আছে দুর্ভিক্ষে বিপ্লবে ধর্ম্ম থাকে না। অভাবই ত মানুষকে ধর্ম্মপথ থেকে বিচ্যুত করে বিপথে চালিত করে।

ভগবতী কহিলেন, তাঁতি, কুলু, কামার, কুমার সকলেরই যদি জাতব্যবসা যায় তবে তারা কি করবে? তারা কি সকলেই সৎপথে উদরান্ন সংস্থান করতে পারবে? সমাজের সর্ব্বত্র এই প্লাবন ধাক্কা দিয়েছে—একটা ওলটপালট হবে বলেই মনে হ'চ্ছে—

মতি ঠাকুর কহিলেন, হবে নয় ভগবতী—হ'চ্ছে। ভরত আড়ুরী ত খাদে কাজ করতে গিয়েছিল কিন্তু এ সব গাঁ থেকে কেউ কোন দিন ত যায় নি। সবই দয়াময়ের ইচ্ছা—তা কে রোধ করবে—

মতি ঠাকুর ও ভগবতী উভয়েই ভগবানের ইচ্ছার নিকট আত্মসমর্পণ করিয়া চুপ করিয়া রহিলেন কিন্তু হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে একটা গভীর দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ধীরে ধীরে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল।

*

ধান কাটা সুরু হইয়াছে—

ভরতের গৃহনির্ম্মাণ প্রায় শেষ হইয়াছে, সামান্য যেটুকু বাকী তাহা ধীরে সুস্থে পরে করিলেও ক্ষতি নাই। ভরত ধান কাটিয়া মাঠে রাখিয়া আসে—সকলের জমিতেই কাটা ধান পড়িয়া থাকে। ধীরে ধীরে শুকাইয়া ভিজা ধান হাল্কা হইলে তবে গাড়ী বোঝাই করিয়া লইয়া আসিতে হইবে। ভরতের টাকা নিঃশেষ হইয়া গেলেও ভরতের আনন্দ প্রচুর—ধান যাহা হইয়াছে তাহাতে বৎসর কাটিবে, সামান্য যাহা লাগিবে

তাহা মজুর খাটিয়া অনায়াসে রোজগার করিতে পারিবে। অতএব সে এখন সারাদিন ধান কাটে এবং রাত্রে আনন্দে মদ্যপান করিয়া গান করে —আহুরী তাহার বিকল স্বামীর বিকৃত গানের সুর শুনিয়া হাসে।

মাঘের শীতে শুষ্কপত্র জ্বালাইয়া তাহারা দেহ উষ্ণ করে—ফাল্গুনে ধান ঝাড়িয়া ঘরে তুলিয়া খড়ের পালৈ দেয়—চৈত্রে প্রাচুর্য্যের মাঝে গরু লইয়া শুষ্ক তৃণশূন্য মাঠে শালবনে চরাইয়া বেড়ায়। চৈত্রের শেষে গাজনে মাতিয়া পথে বিপথে পড়িয়া থাকে—উষ্ণ বায়ুপ্রবাহ মাঠের উপর দিয়া বহিয়া যায়। তাহার মাঝে তাহারা নেশার ঘোরে গ্রাম গ্রামান্তরে গান গাহিয়া—সং দিয়া ফিরে—সংক্রান্তির মেলায় যাইয়া নাচে—তাহার পর আসে রুদ্র রুক্ষ বৈশাখ—পৃথিবীর মাটি রৌদ্রে ফাটিয়া চৌচির হয়, ধরিত্রীর বুকে কম্পমান বায়ুস্তর মরীচিকার সৃষ্টি করে, উষ্ণ বায়ুপ্রবাহ দেহ পোড়াইয়া, তরুণ পল্লবকে ঝলসাইয়া বহিয়া যায়। গৃহবধূগণ ছায়াঘন বট অশ্বত্থ বৃক্ষে সমগ্র বৈশাখ ধরিয়া জলসেচ করে। এইটা পুণ্য কার্য্য, বটের ডালকাটা পাপ, বৃক্ষরোপণ পুণ্য কাজ ইহা তাহারা জানিয়াই পরকালের মোহে বৃক্ষরোপণ ও রক্ষা করিয়া যায়—তাহার আকর্ষণে হয় প্রচুর বারিবর্ষণ—আনন্দে ভিজিয়া তাহারা ভূমিকর্ষণ করে—সোনার ধান ফলায়—এমনি করিয়াই গিয়াছে বৎসর—যুগযুগান্ত—

বৈশাখের মাঝামাঝি একদিন বৈকালে আরম্ভ হইল কালবৈশাখীর মাতামাতি। গরুগুলি কালো ঘন মেঘ দেখিয়া বাড়ীর দিকে ফিরিল—তালগাছ দোলাইয়া, শালবনে আন্দোলন তুলিয়া আসিল ঝড়, সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টি, শুষ্ক মৃত্তিকা ভিজাইয়া সরস করিয়া দিল আকাশের মেঘ। পৃথিবীর শুষ্ক বুক আবার সবুজ হইয়া উঠিবে—

অতি প্রত্যূষে উঠিয়া ভরত গাঁইতি কাঁধে করিয়া কহিল, আহুরী তু চল্, হিঙ্গুলবনের জমি তুলবেক আজ, চল্—

—আজ কোথা যাবি তু? জল কোথা?

—হ্যাঁ রে, চল্—মাটি ত নরম হ'ল বটে—এবার গাঁইতি মারবেক্—চল্—ছবিঘা• তুল্‌বেক এখন্—আদুরী চোখে মুখে জল দিয়া ঘর হইতে কিছু মুড়ি বাহির করিয়া আনিয়া কহিল, চল—রাঁধবো না ?

—তু রাঁধবি, বেলা হ'তে দে—

দুইজনে আবার চলিল—ভূত্বকের উপর গাঁইতি চালাইতে, বন্ধ্যা মৃত্তিকাকে স্বর্ণপ্রসূ করিতে। ভরত আবার গাঁইতি চালায়, আদুরী পাথর কুড়াইয়া আইলের বাঁধ দেয়, ভরতের গাঁইতির মুখে প্রস্তর ভাঙ্গিয়া খান্ খান্ হইয়া যায়। সে মনে মনে বলে—কয়লা আর ভাঙবেক নাই—কালি আর মাখবেক নাই।

*

অম্বুবাচী নিবৃত্তি হইয়া গিয়াছে, আষাঢ়ের মাঝামাঝি। তবুও উপযুক্ত বর্ষণ বিনা চাষের কাজ বন্ধ হইয়া আছে। এমন কি বীজ-তলায় বীজ বপন করা হয় নাই। চারিপাশে চলিতেছে হাহাকার—গ্রামে গ্রামে ইতর ভদ্র মিলিয়া কীর্ত্তন করিতেছে—চতুঃপ্রহর অষ্টপ্রহর—কিন্তু তথাপি বৃষ্টি হয় নাই।

সেদিন সকলে মিলিয়া মতি ঠাকুর মহাশয়ের বাড়ীতে জমাইত হইল—এই অনাবৃষ্টির একটা কিছু বিহিত ব্যবস্থা করুন, নইলে দেশে ত হাহাকার পড়িয়া গিয়াছে। মতি ঠাকুর মহাশয় কহিলেন, আমার যাহা সাধ্য, শাস্ত্রোক্ত বিধি তা অবশ্যই করবো। তোমরা নারায়ণকে ডাকো—তিনি দয়াময় নিশ্চয়ই মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করবেন—আমি কাল উদয়াস্ত চণ্ডী পাঠ করবো—ভয় কি ?

সকলে সাহস পাইয়া ফিরিয়া আসিল—ঠাকুর মশায় যখন বলিয়াছেন তখন নিশ্চয়ই বৃষ্টি হইবে।

সেইদিনই বৈকালে সকলে চণ্ডীতলা পরিষ্কার করিয়া, নিকাইয়া ধর্ম্মানুষ্ঠানের উপযুক্ত করিয়া রাখিল।

পরদিন উদয়াস্ত চণ্ডী পাঠ হইবে। অতি প্রত্যূষে মতি ঠাকুর ও গোপাল আসিয়া সংকল্প বাক্য পাঠ করিয়া চণ্ডী পাঠ আরম্ভ করিলেন। গোপাল মাঝে মাঝে চণ্ডী পাঠ করিয়া ঠাকুর মহাশয়কে বিশ্রাম দিবে। সকাল হইতেই লোকজন সমবেত হইতে লাগিল, পূজা স্থানে নৈবেদ্য সিধা প্রভৃতি আসিতে লাগিল।

অপরাহ্নের দিকে মতি ঠাকুর মহাশয় ভক্তিভরে সাশ্রুনেত্রে চণ্ডী পাঠ করিতেছিলেন, ভগবতী অদূরে আসনে বসিয়া চণ্ডী শ্রবণ করিতেছেন। গাছতলায় অপর দিকে ছোটলোকেরা বসিয়া আছে। মাঝে মাঝে মায়ের উদ্দেশ্যে জয়ধ্বনি করিতেছে। ভগবতী থাকিয়া থাকিয়া আকাশ লক্ষ্য করিতেছিলেন, পূর্ব্ব-দক্ষিণকোণে একখানা কালো মেঘ যেন মাথা তুলিয়া উঠিতেছে। ভগবতী আশান্বিত হইয়া সতৃষ্ণ নয়নে সেইখানেই বার বার দেখিতেছিলেন।

ঠাকুর মহাশয় উদাত্ত কণ্ঠে দেবীর মহিমা পাঠ করিতেছেন, এমনি সময়ে একটা হাওয়া ছাড়িল এবং দেখিতে দেখিতে মেঘখানা বায়ু চালিত হইয়া যেন উঠিতে লাগিল। ভগবতী কহিলেন, এই তোরা ছাতা নিয়ে আয়, চণ্ডীমা আমাদের প্রার্থনা শুনেছেন বোধ হয়।

কয়েকজন ছুটিয়া গিয়া কয়েকখানা তালপাতার ছাতা লইয়া আসিল। ততক্ষণে নিবিড় কালোমেঘে আকাশ ছাইয়া গিয়াছে এবং প্রবল বায়ুর সঙ্গে বৃষ্টির ফোঁটা পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। ভগবতী ছাতা হাতে করিয়া ঠাকুর মহাশয় ও পুঁথিকে রক্ষা করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু সবই বৃথা। প্রবল ঝাপ্টার সঙ্গে বর্ষণ হইতে আরম্ভ করিল—পুঁথিপত্র, সিধা নৈবেদ্য সব ভাসিয়া যায় আর কি!

ভগবতী কহিলেন, এখন কি করা যায়? ওরে তোরা বড় বড় তালপাতা নিয়ে আয় সব। ঠাকুর মশায় ভিজে যাচ্ছেন—

মতি ঠাকুর ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, ব্যস্ত হবার কিছু নেই—ভিজলে কি হয়েছে। উদয়াস্ত সংকল্প আছে, এত সন্ধ্যার আগে বন্ধ হতে পারে না।

পুঁথির অক্ষর দেখা যায় না, কিন্তু ঠাকুর মশায় নিজের অভ্যাস বশতঃ পাঠ করিয়া যাইতে লাগিলেন। আষাঢ়ের প্রথম আকাঙ্ক্ষিত বর্ষণে অন্য সকলে বার বার চণ্ডীমাতার উদ্দেশ্যে প্রণাম জানাইল। সকলে ভক্তি-সহকারে ঠাকুর মহাশয়কে প্রণাম করিয়া আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিল।

পরদিন হইতে দ্রুত কাজ আরম্ভ হইল। বীজতলা চাষ দিয়া বীজ ছড়াইয়া দেওয়া হইল, জমিচাষ করিয়া বপনোপযোগী করা হইল। দিবারাত্রি সমানে কাজ চলিল।

ভরত তাহার নূতন জঙ্গলে জমি চাষ করিয়া প্রস্তুত করিয়া রাখিল।

*

বৃষ্টিতে ভিজিয়া ভগবতীর জ্বর হইয়াছে—

দুই তিন দিনের মধ্যে বুকে একটু বেদনা ও শ্লেষ্মার প্রকোপ দেখা গেল। জ্বর ক্রমশঃ বাড়িয়া ভগবতীকে হৃতচেতন করিয়া ফেলিল। শশধর ও পরিবারের সকলের মুখেই দুর্য্যোগের কালো ছায়া পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিল। ভগবতীর বয়স হইয়াছে, প্রবল রোগের সহিত লড়াই করিবার শক্তি আর তাঁহার নাই।

দিগর গ্রাম হইতে কবিরাজ আসিয়াছেন, তিনি মাথা নাড়িয়া একটু বিষণ্ণ মুখেই কহিলেন, সান্নিপাতিক ক্ষেত্রে জ্বর বিকার।

ঔষধ পথ্য সবই চলিল, কিন্তু রোগ ক্রমশঃ গুরুতর বিকারে পরিণত

হইল এবং পরদিন সকালে হতচেতন ভগবতীর শয্যার পার্শ্বে শশধর তাহার মাতা ও পিসিমা উদ্বেগ মলিন মুখে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন—বনলতা দেয়ালের কোণ ঘেঁষিয়া একান্ত অপরাধীর মত দাঁড়াইয়া আছে। অনিবার্য্য ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তাহারা এখনও যেন অনেকটা উদাসীন। মতি ঠাকুর কবিরাজ মহাশয়কে লইয়া উপস্থিত হইলেন। নাড়ী পরীক্ষা করিয়া কবিরাজ মতি ঠাকুর মহাশয়কে সংক্ষেপে কহিলেন, এখন সূচিকাভরণ দেওয়া ছাড়া পথ নাই।

মতি ঠাকুর চমকাইয়া উঠিলেন, কিন্তু কোন কিছু না বলিয়া কবিরাজ মহাশয়কে লইয়া বাহিরে আসিলেন। কবিরাজকে বিদায় করিয়া ফিরিয়া আসিতে আসিতে তাঁহার চক্ষু ভারাক্রান্ত হইয়া জল গড়াইয়া পড়িল—ভগবতী তাঁহার অতি আপনার প্রিয়জন চিরদিনের মত বিদায় লইতে বসিয়াছে—

চণ্ডীমণ্ডপে নটবর নীলমণি প্রভৃতি সকলে কর্ত্তার সংবাদের জন্য বসিয়াছিল। তাহারা প্রশ্ন করিল—ঠাকুর মশায়, কর্ত্তা কেমন?

মতি ঠাকুর অশ্রুমার্জ্জনা করিয়া কহিলেন, সূচিকাভরণ ব্যবস্থা কল্লেন ক'বরেজ মশায়।

নীলমণি বিস্মিত ব্যথিতকণ্ঠে প্রশ্ন করিল—সূচিকাভরণ কথাটার তাৎপর্য্য তাহারা বুঝিয়াছিল। নব তাঁতি, গোবিন্দ প্রভৃতি পুনরায় প্রশ্ন করিল, এখন কেমন?

মতি ঠাকুর কহিলেন, নাড়ীটা ক্বচিৎ ছিন্ন, ক্বচিৎ ভিন্ন, এখন ভগবান যা করেন। মতি ঠাকুর আর একবার অশ্রুমার্জ্জনা করিয়া যেন সবল হইতে চাহিলেন কিন্তু কোনমতেই অশ্রু দমন করা যায় না। তিনি প্রবেশদ্বারে ক্ষণিক দাঁড়াইয়া রহিলেন—তাহার পর সারদা প্রভৃতি কয়েকজন নিঃশব্দে ঠাকুর মশায়ের পিছন পিছন অন্দরে ঢুকিল।

চণ্ডীমণ্ডপে নীলমণি কহিল, হ্যাঁ নটবরদা, কর্ত্তা কি বাঁচবেক নাই?

নটবর জিভ কাটিয়া কহিল, সে কি? কর্ত্তা না বাঁচলে মোরা সব ত ম'রবেক—ভগবান কি এমনি করবেক?

ভগবতীর সংবাদ লইতে ধীরে ধীরে চণ্ডীমণ্ডপে বহু লোক সমাগম হইল। সকলেই রুদ্ধনিশ্বাসে সংবাদের অপেক্ষা করিতেছে—

বাড়ীর ভিতরে হঠাৎ একটা কোলাহল শোনা গেল—বাবা, বাবা গো—

নটবর চোখে কাপড়ের খুঁট দিয়া কহিল, নীলমণি কর্ত্তা ত আর নাই রে—আর নাই—

চণ্ডীমণ্ডপে ব্যথিত কণ্ঠের একটা কলগুঞ্জন উঠিল—কর্ত্তা নাই—কর্ত্তা নাই

সেই সময়ে শশধর কাঁদিতে কাঁদিতে ছুটিয়া বাহির বাড়ীর উঠানে পড়িয়া চীৎকার করিয়া উঠিল—বাবা গো—কোথায় গেলে গো—বাবা—

নীলমণি প্রভৃতি সকলে ছুটিয়া আসিয়া তাহাকে ধরিয়া তুলিয়া কহিল, বড়দা, বড়দা—কি হ'ল বটে! কি হ'ল!

মতি ঠাকুর মশায় ছুটিয়া আসিয়া শশধরকে বুকের মাঝে টানিয়া আনিয়া কহিলেন, বাবা কেঁদো না। জগতের গতি এই—আত্মা অমর, দেহ পুরাতন হলে আত্মা তা ত্যাগ করে নূতন দেহ গ্রহণ করে, যেমন আমরা পুরাতন বস্ত্র ফেলে নূতন বস্ত্র পরি। তুমি অধীর হয়ো না বাবা, অধীর হয়ো না। জন্ম হলেই মৃত্যু হয়; দেহ থাকলেই ব্যাধি হয় তার জন্যে শোচনা করা ভুল—বাবা—

জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ
তস্মাদপরিহার্য্যেঽর্থে ন ত্বং শোচিতুমর্হসি।

সান্ত্বনা দিতে দিতে মতি ঠাকুর মহাশয় নিজেই কাঁদিতে লাগিলেন—আর কিছু বলিতে পারিলেন না।

শশধর পুনরায় কাঁদিয়া উঠিল—বাবা—বাবা গো, আমি কি করবো, আমি কেমন করে থাক্‌বো—

নীলমণি অশ্রুমার্জ্জনা করিয়া কহিল, বড়দা মোরা আছি ডর কি? আমরা জান দেবো—ডর কি?

সমবেত জনতা একসঙ্গে কহিয়া উঠিল, জান দেবো বড়দা, জান দেবো—ডর কি?

নীলমণি কহিল, কর্ত্তা ছেড়ে চল্‌লেক বড়দা, মোরা আছি—

সমবেত জনতা কহিল, কর্ত্তা ত মোদের ধরম বাপ বড়দা—মোরা জান দেবো—

ভগবতীর মৃত্যু সংবাদ দেখিতে দেখিতে গ্রামে গ্রামান্তরে প্রচারিত হইয়া গেল। বাগ্দী কুর্ম্মী পাড়ার কামিনরা চোখে আঁচল দিয়া কাঁদিয়া উঠিল—মোদের ধরম বাপ্ ম'রলেক রে!

আদুরী পাড়ায় ধান ভানিতেছিল, সে ঢেঁকি হইতে নামিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে গৃহাভিমুখে ছুটিল। ভরত উঠানে বসিয়া ঝুড়ি বুনাইতেছিল। আদুরী কাঁদিয়া কাঁদিয়া কহিল, ভরত তু হেথা রে! কর্ত্তা চলে গেল রে—

ভরত চমকাইয়া উঠিয়া কহিল, কর্ত্তা চল্‌লেক আদুরী! মোর বাপ ম'রলেক রে—মোর বাপ ম'রলেক—

ভরত সাশ্রুনেত্রে দ্রুত চণ্ডীমণ্ডপের দিকে ছুটিল।

*

গঙ্গাতীর বার ক্রোশ দূরে—

দাহ কার্য্য কোথায় হইবে তাহা লইয়া কথাবার্ত্তা হইতেছিল। নীলমণি কহিল, কর্ত্তার পুণ্যির দেহ মোরা গঙ্গাতীরে দেবেক। হেথা দেবেক নাই—

মতি ঠাকুর কহিলেন, কিন্তু শশধর ?

নটবর আগাইয়া আসিয়া কহিল, কাঁধে করে লেবেক ঠাকুর মশায়, কাঁধে করে পাল্কী করে লেবেক, গঙ্গাতীরে মোরা যাবেকই—

গঙ্গাতীরেই যাওয়া স্থির হইল। দেখিতে দেখিতে গ্রামের সবলদেহ পুরুষ খোল করতাল নিশান প্রভৃতি লইয়া প্রস্তুত হইল। গ্রামান্তের প্রজারা নিশান করতাল লইয়া উপস্থিত হইল। দেখিতে দেখিতে সহস্রাধিক লোক জড় হইয়া গেল।

ঠাকুর মহাশয় কহিলেন, এত লোক যেয়ে কি হবে নীলমণি। তোমাদের অর্দ্ধেক গেলেই যথেষ্ট—নটবর তোরা আর যাস্ না—

নটবর কহিল, কর্ত্তার সাথে মোরা যাবো নাই? মোরা যাবোই।

কেহই থাকিতে সম্মত হইল না, কর্ত্তার শবানুগমন করিতে তাহারা বদ্ধপরিকর, আজকার এই দুর্য্যোগে তাহারা কেহই পিছাইয়া থাকিতে পারে না। ভগবতী তাহাদের পিতৃতুল্য, তাহার শবানুগমন তাহাদের অবশ্য করণীয়।

সহস্রাধিক লোকের এক শব শোভাযাত্রা কীর্ত্তনসহ গ্রাম হইতে বাহির হইয়া চণ্ডীতলার পথ ধরিয়া ধীরে ধীরে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল। পথিপার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিল সহস্রাধিক নারী—তাহাদের চোখ দিয়া অবিরল অশ্রু গড়াইয়া পড়িতেছে—

আহুরী তাহার মায়ের কাঁধে ভর দিয়া আকুল কণ্ঠে কহিয়া উঠিল—সাতপুরুষের বাপ্ হারালেক রে! বাঁপ্ হারালেক।

আহুরীর কথায় সমবেত জনতা, আর একবার কাঁদিয়া উঠিল—তাহারা সকলেই যেন আজ পিতৃহারা হইয়াছে।

তিরিশ বছর পরের কথা।

গোপালপুরের নূতন ইতিহাস আরম্ভ হইয়াছে। সর্পিল সড়ক গিয়াছে আর্য্যাবর্ত্তের বুক চিরিয়া—কলিকাতা হইতে পেশোয়ার—তাহার আশে পাশে নীল আকাশের কোলে দেখা যায় চিম্‌নি-নিঃসৃত কয়লার ধোঁয়া, পরিচ্ছন্ন আকাশের কোলে কলঙ্ক রেখার মত। আশে পাশে কয়লার খাদ—উপরে চক্রের আবর্ত্তন ভূগর্ভের কর্ম্মের অস্তিত্ব প্রমাণ করে —রাস্তা দিয়া চলে গাড়ী, মোটর, পাশে পাশে ছোটে রেলগাড়ী—দেশ দেশান্তরে চলে লোকজন পণ্যদ্রব্য। দেশে নতুন বিদ্যা, নতুন ব্যবস্থা চলিয়াছে দ্রুত, সাহেবগণকে সকলে সমীহ ও শ্রদ্ধা করিতে শিখিয়াছে। ইংরেজী জানা ও বলাটাই আজ শিক্ষার লক্ষণ। সংস্কৃত পণ্ডিতগণ আজ হইয়াছেন সংস্কারান্ধ মূর্খ।

গোপালপুরের নূতন ইতিহাস আরম্ভ হইয়াছে। পুরাতন যাহারা তাহারা চলিয়া গিয়াছেন, তাহাদের বংশধরগণ আজ গ্রামের লোক। ক্ষয়িষ্ণু ছোটলোকের পাড়ায় আছে কয়েক ঘর লোক—কতক এখানে ওখানে চলিয়া গিয়াছে, কতক গিয়াছে, কলে বা খাদে কাজ করিতে আর যাহারা রহিয়াছে তাহারা চাষ করে। যাহারা আছে তাহাদের মধ্যে নীলমণির ছেলে শিবদাস, নটবরের ছেলে নিতাই, আর ভরত-আদুরীর ছেলে বলাই উল্লেখযোগ্য। বলাইএর ভগ্নি, তথা আদুরীর কনিষ্ঠা কন্যা এই সেদিন পলাশডাঙ্গায় মথুরকে সাঙ্গা করিয়া সেই গ্রামে চলিয়া গিয়াছে। তাহার একটা ইতিহাস আছে—

ভরতের মৃত্যুর কয়েক বছর পরেই আদুরীর মৃত্যু হয়, তখন কনিষ্ঠা কন্যা সরোজিনী ষোড়শী কিন্তু স্বামী নিরুদ্দেশ। তখন স্বজাতি মোড়লগণ ব্যবস্থা দিয়া সরোজকে এই সাঙ্গার অনুমতি

দেয়। সরোজ সাঙ্গার বিবাহে কাপড় জামা এবং কিছু গহনা পাইয়াছে—

বৃদ্ধপ্রায় শশধর জমিদারী দেখে, বৃদ্ধ গোপাল তাহার পুরোহিত। চাঁদমোহন ইংরাজি শিক্ষা পাইয়া কলিকাতায় চাকুরী করে, বেশ মোটা রোজগার। মতি ঠাকুর মহাশয়ের পুত্র হরিহরও বিদেশে চাকুরী করে, মাঝে মাঝে বাড়ীতে আসে।

তাঁতি, তিলি প্রভৃতি নবশাক পাড়ার অনেকে চলিয়া গিয়াছে—কেহ কেহ এখনও আছে, দোকান, চাষ বা সামান্য পৈতৃক ব্যবসায় লইয়া। মাঝে মাঝে দুই একখানা প'ড়ো বাড়ী—কেহ বা ফৌৎ হইয়া গিয়াছে, কেহ বা শহরে বসবাস করিতেছে, গ্রামের বাড়ী পরিত্যক্ত হইয়া ধীরে ধীরে বাসের অযোগ্য হইয়া গিয়াছে। শশধরের দুই পুত্র স্কুলে পড়িতেছে একজন শীঘ্রই এক পাশ দিয়া কলেজে প্রবেশ করিবে।

চণ্ডীমণ্ডপে আর পাশার আড্ডা বসে না। সে সময় আর কাহারও নাই, পূজার বন্ধে বা কোন কোন উৎসবে তাস প্রভৃতি খেলা হয়। ভাগবত, রামায়ণ-গান এখন আর কেহ শুনে না—এদিকে ওদিকে সখের থিয়েটার বা অপেরা শুনিতে যায়। শশধর সাবেক নিয়মেই সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করে। বনলতা গৃহিণী, পূজাপার্ব্বণের কোনটি বাদ না পড়ে সেদিকে তাহার তীক্ষ্ণ লক্ষ্য।

মাটির দেয়াল খড়ের চাল, রেড়ির তৈলের প্রদীপ নাই। এখন টিনের চাল, হারিকেন লণ্ঠন ও উৎসবে গ্যাস বাতি জ্বলে।

*

পূজা আসিয়াছে—

চাঁদমোহন আজ কলিকাতা হইতে বাড়ী আসিবেন। চারি ক্রোশ দূরে রেল ষ্টেশন, দুই জোড়া গাড়ী পাঠান হইয়াছে। সকলে সাতটার

গাড়ীতে পৌছিবেন এবং বেলা দশটা নাগাদ গ্রামে পৌছিবেন। শশধর সকাল হইতে ব্যস্তভাবে ঘর-দোর পরিষ্কার করা, ভ্রাতার খাদ্যাদির ব্যবস্থা করা লইয়া ব্যস্ত আছেন। দোতলায় দক্ষিণ দিকের দুইটি ঘর তাহাদের জন্য নূতন করিয়া সাজান হইতেছে। চাঁদমোহন, তাহার কুমারী কন্যা লতিকা, পুত্র অশোক আসিবেন। তাহারা শহরে থাকিতে অভ্যস্ত, গ্রামে যেন কোন কষ্ট না হয় সে বিষয়ে শশধর যত্নবান।

শশধরের পুত্র কানু ও কালো চণ্ডীতলা পর্যন্ত যাইয়া কাকার আগমনের প্রতীক্ষা করিতেছে। ভিতরে চাকর চরণ ও ঝি বিন্দুকে সব বুঝাইয়া দিয়া বাহিরে আসিল। পূজায় কয়লা, কাঠ, চাউল, পাঁঠা, কাপড় প্রভৃতি বহু দ্রব্যের ব্যবস্থা করিতে হইবে, পূজার দালান ও সংলগ্ন উঠান পরিষ্কার করিতে হইবে। শশধর ব্যস্তভাবে পূজার চাকরাণ জমি-ভোজী লোকজনকে খাটাইতেছেন, এমন সময় কানু আসিয়া সংবাদ দিল —কাকা আসছেন, কাকীমা, লতিকাদি, অশোকদা সব।

কিছুক্ষণ পরেই চাঁদমোহনের গাড়ী বৈঠকখানার সম্মুখে আসিয়া থামিল। তিনি তাহার দেহটাকে সযত্নে এবং ধীরে ধীরে গাড়ী হইতে বাহির করিয়া কহিলেন—বাবা, একি আসা যায়? দেহ আর নেই—গরুর গাড়ীতে কি মানুষে আসে।

শশধর ব্যস্ত হইয়া প্রশ্ন করিলেন, কেন কষ্ট হ'য়েছে খুব?

—বাবাঃ, এত কষ্টে আর বাড়ী আসা চলে না। চাঁদমোহন শশধরের পায়ের নিকট মাথাটা একটু নোয়াইয়া কহিল, তিনদিন যাবে গায়ের ব্যথা ম'রতে—

লতিকা ও প্রভাত নামিয়া জেঠামহাশয়কে প্রণাম করিয়া দাঁড়াইল। বধূ মাথায় ঈষৎ ঘোমটা টানিয়া বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করিলেন। শশধর ও উপস্থিত লোক সবিস্ময়ে দেখিল লতিকার পায়ে জুতা!

মেয়েরা জুতা পায় দেয় বা দিতে পারে, একথা এ গ্রামে কেহ পূর্ব্বে ভাবে নাই।

চাঁদমোহনের স্ত্রী কলিকাতার না হইলেও ঐ অঞ্চলের মেয়ে। তাহার নাম কি তাহার প্রয়োজন নাই, তিনি লতার মা বা ছোট-বৌ বলিয়াই সমধিক পরিচিতা। তিনি অন্দরে প্রবেশ করিয়া বনলতার পায়ের কাছে অনিচ্ছাকৃত একটা প্রণাম করিয়া কহিলেন—ওঁকে একশ'বার বলি, এমন দেশে আসা বাবা আমার পোষায় না। গরুর গাড়ীতে কি মানুষে চড়ে, হাত পা সব বেদনায় বিষ হ'য়ে উঠেছে—

বনলতা কহিলেন, ও কথা ব'লতে নেই ছোট-বৌ। শ্বশুরের ভিটেয় কষ্ট করেও ত আসতে হয়। তিনি কত করেছেন আমাদের জন্যে। তা এখন জিরিয়ে নাও—সব সেরে যাবে—

লতিকা জেঠাইমাকে প্রণাম করিতে গেলে বনলতা কহিল, লতা মা জুতো ছেড়ে এসো, জুতো পায় ছুঁয়ো না, ঠাকুর ঘরে যাবো—

লতা থামিয়া গেল—অর্থ-টা যেন এইরূপ যে জুতা ছাড়িয়া প্রণাম করিতে হইলে সে করিতে প্রস্তুত নয়। ছোট-বৌ ধমক দিয়া কহিলেন, এটা কলকাতা নয়। জুতো এখানে পরতে পাবিনে, যেখানে যেমন সেখানে তেমন ক'রতে হয়। জুতো ছেড়ে প্রণাম কর—

লতিকা জুতা খুলিয়া প্রণাম করিল, কিন্তু সে প্রণাম একান্তই শুষ্ক। বনলতা আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন, হ্যাঁমা, যেখানে যেমন সেখানে তেমন। পূজোর দিন, এখন ছোঁয়া মেশা হ'য়ে যাবে—

অশোক কহিল, জুতো পায়ে দিয়ে ছুঁলেই কি জাত যায় জেঠিমা—ও সব বাজে—আমরা মানি না—

বনলতা কহিলেন, তা বাবা তোমরা না হয় মেনো না, কিন্তু পূজোর কটা দিন ত মান্‌তেই হবে।

যাহা হউক ঠাকুরের ভোগের দালান, রান্নাঘর প্রভৃতিতে জুতা না চলিলেও জুতা ব্যবহার চলিতে লাগিল। পাড়ার মেয়েরা বিস্মিত হইয়া বলাবলি করিতে লাগিল—চাঁদমোহন ত মেয়েকে মেমসাহেব করিয়াছে। ছেলেরা না হয় জুতা পরুক, কিন্তু মেয়েরা কেন?

*

আজ ষষ্ঠীর বোধন।

গোপাল সকালে বিল্ববৃক্ষের মূলে বসিয়া দেবীর আহ্বান করিয়াছেন। যথা সময়ে ঘটস্থাপন প্রভৃতি শেষ করিয়া গোপাল চণ্ডীপাঠ করিতেছিলেন। শশধর আসিয়া কহিল, ঠাকুরমশায় চণ্ডীপাঠান্তে একবার বৈঠকখানায় যাবেন।

গোপাল শুনিলেন, কিন্তু চণ্ডীপাঠ ত্যাগ করিয়া কোন জবাব দিলেন না। চণ্ডীপাঠ সমাপনান্তে গোপাল বৈঠকখানায় উপস্থিত হইলেন। শশধর ও চাঁদমোহন দুই ভাই বসিয়া কি যেন একটা বিষয়ে আলোচনা চলিতেছিল, গোপালকে দেখিয়া উভয়ে চুপ করিয়া গিয়াছে। শশধর বিষণ্ণ মুখে কহিল, ঠাকুরমশায়, চাঁদু বল্‌ছে তিনদিন গ্রামের সমস্ত লোক নিমন্ত্রণ ক'রবার দরকার নেই—আপনি কি বলেন?

গোপাল বিস্মিত হইয়া কহিলেন, কেন? হঠাৎ এ রকম হবার কারণ কি? জন্মাবধি আমরা দেখ্‌ছি পূজার তিনদিন গ্রামে কারো হাঁড়ি চড়ে না। আজ হঠাৎ তার ব্যতিক্রম হবে কেন? কর্ত্তা ত তাঁর সঙ্গে কিছুই নিয়ে যান্‌নি, তা ছাড়া চাঁদ ত কিছু রোজগার করে—তবে?

—টাকা থাকলেই সব খরচ ক'রে ফেল্‌তে হবে এমন কিছু নয়। আর সারাগ্রাম না খাওয়ালে পূজা করা যাবে না এমনও কিছু ত নয়। আমি বলছি, বরং যাদের ব'লবো তাদের ভাল করে খাওয়াবো—নতুন জিনিষ যা খায়নি কোনদিন—

গোপাল অদূরে একখানা আসনে বসিয়া পড়িয়া কহিলেন, কিন্তু সারাগ্রাম আশা করে আছে। একদিন গ্রামের ইতর ভদ্র একত্র হবে, এই ত চলে আস্‌ছে—

শশধর কহিল, নবমীতে যাত্রাগানেও ওর মত নেই, পূজা অঙ্গেও ও ফর্দ্দ কমাতে ব'লছে—শাড়ী, কাপড়, দক্ষিণা—

গোপাল বিস্মিত হইয়া কহিলেন, কেন ? এ সব কেন হবে তা'ত আমি বুঝতে পারি না। কর্ত্তার সমস্ত সম্পত্তিই আছে, সবই আছে অথচ হবে না কেন ?

চাঁদু কহিল, জমিদারীটা বাবা রেখে গেছেন, পরকে খায়িয়ে উড়িয়ে দেবার জন্যে ত নয়। আমাদের বড় হতে হবে, বেঁচে থাকতে হবে। সময় বদলে গেছে—এখন কলকাতায় আমাকে একখানা বাড়ী করতে হবে, ছেলেকে পড়াতে হবে। চাষাভূষো খায়িয়ে নিজের পরকাল খোয়াতে ত আমি পারবো না ? নামের জন্যে হয়ত পূজাটা করা দরকার, তাই বলে বাজে লোক খাওয়াতে হবে কেন ?

গোপাল কহিলেন, মানুষ কখনও বাজে হয় না চাঁদু। তাদের উপরেই তোমার জমিদারী, তাদের তোমাকে রক্ষা করতে হবে, খাওয়াতে হবে, তবেই তোমার জমিদারী থাকবে। কাউকে বঞ্চিত করে বড় হওয়া ত বড় হওয়া নয়, সকলকে রক্ষা করে, সকলের মঙ্গল করে বড় হওয়াই প্রকৃত বড় হওয়া।

চাঁদু হাসিয়া কহিল, ঠাকুরমশায় তাকি হয়, পাঁচশ টাকা পাঁচজনে ভাগ করলে হয় একশো, আর পাঁচশ লোকের কাছ থেকে এক টাকা করে নিলেই পাঁচশ টাকা হয়। ইংরাজিতে একটা কথা আছে, survival of the fittest যে শক্তিশালী সেই বেঁচে থাকে। ব্যাং মশা খায়, সাপে ব্যাং খায়, গোসাপে সাপ খায়, মানুষে গোসাপ খায়, এমনি করে যে শক্তিশালী সেই বেঁচে থাকবে, যার শক্তি নেই সে লোপ পায়। কাজেই

শক্তি অর্জ্জন করা দরকার, আজকার শক্তি হচ্ছে ধনশক্তি, কাজেই তার অপচয় করা কি ঠিক? যে অপচয় করবে সে বেকুব—

গোপাল কহিলেন, কিন্তু আমাদের শাস্ত্রে বলে সমাজ-কল্যাণের শক্তিই শক্তি, আর ধনও সমাজমঙ্গলের জন্যে। তোমার শক্তি ধন বিদ্যা বুদ্ধি তোমাকে বড় করে যদি অন্যকে নিস্পিষ্ট করে তবে সে শক্তি আসুরিক, তা দানবিক, সেটা মানুষের ধর্ম্ম নয়—আমরা শাস্ত্রে এই শিক্ষাই পেয়েছি—

চাঁদু হাসিয়া কহিল, শাস্ত্র ত ব্রাহ্মণগণেরই সৃষ্টি, তাঁরা তাঁদের সুবিধামতই বচন দিয়ে গেছেন। ধর্ম্মানুষ্ঠান মাত্রেই ব্রাহ্মণকে দান করতে হবে—কেন? গরীবকে দান করলেই ত ভাল। ব্রাহ্মণগণ নিজেদের স্বার্থের দিকে দৃষ্টি রেখেই ত ব্রাহ্মণকে দানের কথা বলেছেন—

গোপাল প্রতিবাদ করিলেন, তা নয় চাঁদু, ব্রাহ্মণ বিদ্যার্জ্জন ক'রে, সমাজ সেবা করেন। নিজের বিদ্যা ও জ্ঞানমত সমাজকল্যাণের পরামর্শ দেন, তাই—সমাজ তাকে ভরণ-পোষণ করে দানের দ্বারা—সেটা পূজানুষ্ঠানের ভিতর দিয়ে তারা পান এবং পূজানুষ্ঠানের দ্বারা সমাজের ধর্ম্মপ্রাণতাকে রক্ষা করেন।

চাঁদু হো হো করিয়া হাসিয়া কহিল, সেই জন্যেই ত পূজার ফর্দ্দটা অত মোটা, শাড়ী ১০, ধুতি ১২ ইত্যাদি। কিন্তু দেবতা কাপড় পরেন না—পরেন ব্রাহ্মণ। শাস্ত্রটা ব্রাহ্মণগণ রচিত বলেই এমনি তা বুঝ্‌তে পারেন?

গোপাল হঠাৎ চুপ করিয়া গেলেন, চাঁদুর এই যুক্তির বিরুদ্ধে তাহার যুক্তির অভাব ছিল না কিন্তু গোপাল তাহা বলিলেন না। তিনি চুপ করিয়া ভাবিতে লাগিলেন—যে দান তিনি এতদিন গ্রহণ করিয়াছেন তাহা ছিল শ্রদ্ধার দান, আজ তিনি যাহা পাইবেন তাহা একান্তই অনুগ্রহের দান। অকস্মাৎ মনের মাঝে এই কথাটা যে তীব্র দংশন করিয়া সহসা

তাহাকে অভিভূত করিয়া ফেলিল, এমন কথা গোপাল জীবনে শুনেন নাই।

চাঁদু কহিল, আপনি পূজায় যথেষ্ট পাচ্চেন ঠাকুরমশায়, কিন্তু সমাজের কি সেবা আপনি করেন—বলুন!

গোপাল দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন, শাস্ত্রমত সংবুদ্ধি দান করি, শাস্ত্রের কথা বলি, লোককে শাস্ত্রমত কাজ করতে বলি, এইত আমাদের সেবা!

চাঁদু কহিল, হাঁ৷ তাই, সকলকে খায়িয়ে ফতুর হওয়ার সৎপরামর্শ দাদাকে দিচ্ছেন। এমনি করলে জমিদারী কদিন থাকবে—

গোপাল উঠিয়া দাঁড়াইলেন, আকস্মিক ভাবাবেগে তাঁহার কণ্ঠ কাঁপিতেছিল, তিনি আবেগ ভরে কহিলেন—বাবা চাঁদু, তোমরা কেমন শিক্ষা বা কি শিক্ষা পেয়েছ জানিনা, তবে আমরা যা শিখেছি তাই তোমাকে বললাম। তোমার বাবা বেঁচে থাকতে আমার দাদা মতি ঠাকুরমশায় এই যুক্তিই দিতেন, কিন্তু তাতে তাঁর জমিদারী নষ্ট হয়নি বরং দিনে দিনে বেড়েই গিয়েছিল। তার ডাকে দশহাজার লোক প্রাণ দিত। আমার গুরু সেই মতিঠাকুরমশায়, আমি যা শিখেছি তাই তোমাকে বললাম, সে সময়ে এমনিই হত এতদিন তাই হ'য়েছে। তোমরা এখন যা ভাল বুঝবে তাই করবে। যে সময় এসেছে, যে সমাজ এসেছে তাতে আমাদের বিদ্যাবুদ্ধি আর কোন কাজে লাগবে বলে মনে হয় না—

গোপাল ঠাকুর গভীর বেদনা ও অসম্মানের দুঃসহ বোঝা বুকে লইয়া আরক্ত সাশ্রুনেত্রে বৈঠকখানা হইতে বাহির হইয়া গেলেন। আজ অকস্মাৎ পায়ের তলা হইতে পৃথিবী যেন সরিয়া যাইতেছে—উদরান্নের জন্য অনুগ্রহের দান তাঁহাকে আজ গ্রহণ করিতে হইবে? অত্যন্ত অশ্রদ্ধা অবহেলা ও করুণা মিশ্রিত দান তিনি কেমন করিয়া দু'হাত পাতিয়া গ্রহণ করিবেন।

৪০

গোপাল দ্বিপ্রহরে চণ্ডীপাঠ করিতেছিলেন—

বিল্বমূলে শরতের অপরাহ্ণরৌদ্র আসিয়া পড়িয়াছে, তাল ও শালবনের মাথায় নিস্তব্ধ আলোকরশ্মি। মণ্ডপের সম্মুখে কাষ্ঠের গুড়ি জ্বলিতেছে, তাহার কম্পমান ধূম ধীরে ধীরে বায়ুস্তরে মিশিয়া যাইতেছে। ধূপধূনা ও গুগ্‌গুলের গন্ধে চারিদিকের বায়ুমণ্ডল সুরভিত। গোপাল উদাত্ত কণ্ঠে চণ্ডীপাঠ করিতেছিলেন। কিন্তু তাঁহার মনঃসংযোগ হইতেছে না—তাঁহার বিশ্বাসের ভিত্তিভূমি যেন এক প্রলয় ভূকম্পনে বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছে। পূজান্তে তিনি যে দক্ষিণা বা দান গ্রহণ করেন তাহা কি তাঁহার প্রাপ্য নয়? ন্যায্য প্রাপ্য হউক আর নাই হউক, ভিক্ষার দান, অবহেলার দানকে তিনি কেমন করিয়া গ্রহণ করিবেন? যে পূজায় তাঁহার মনঃসংযোগ হইতেছে না, তাহারই জন্যেই বা তিনি কিরূপে দান গ্রহণ করিবেন?

ভাবিতে ভাবিতে গোপাল থামিয়া গিয়াছিলেন। শশধর কখন যেন পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন—সম্ভবতঃ চণ্ডীপাঠ শ্রবণ করিতেছিলেন। গোপাল মুখ তুলিতেই শশধর প্রশ্ন করিলেন, কি ঠাকুরমশায়—কি?

গোপাল কহিলেন, ব'সো শশধর। কেন যেন পূজায় আমার মনঃসংযোগ হচ্ছে না। বৎসরান্তে মাকে ডাকবো কিন্তু তা'ত ঠিক পারছি না। তুমি অন্য পুরোহিত ব্যবস্থা কর, পূজা আমার দ্বারা সুসম্পন্ন হবে না।

শশধর ম্লানমুখে কহিলেন, সে কি ঠাকুরমশায়, আমি ত আপনাকেই পুরোহিত জানি—আমি ত কোন অপরাধ করিনি—

গোপাল কোন জবাব দিলেন না, কিন্তু কেন যেন তাঁহার অন্তর ফাটিয়া যাইতেছিল। কহিলেন, অপরাধ নয় শশধর, আমার ভয় হ'চ্ছে,

একান্ত মনে পূজা আমি যেন করতে পারবো না। পূজার অঙ্গহানি হবে, আমার তোমার সকলেরই অপরাধ হবে—

চাঁদমোহন আসিয়া কহিল, কি, ঠাকুরমশায় কি ?

শশধর কহিলেন, ঠাকুরমশায় ব'ল্ছেন, অন্য পুরোহিত দেখ্তে, তাঁর দ্বারা পূজা যেন সুসম্পন্ন হবে না এমনি একটা ভাবনা হ'য়েছে ওঁর···

চাঁদমোহন কহিল, কেন ? পূজা অঙ্গের ফর্দ্দ ত আমি বিশেষ কিছু কাটি নি। কেবল দুখানা কাপড়, আর দুটি টাকা দক্ষিণা কেটেছি মাত্র—

গোপাল অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া ক্ষণিক চাহিয়া রহিলেন—ফর্দ্দ কম হইতেছে বলিয়া, নেহাৎ স্বার্থের জন্যে তিনি পূজা করিবেন না একথা চাঁদমোহন ভাবিল কিরূপে ? ধীরে ধীরে কহিলেন, সেজন্যে নয় চাঁদু। আমার মনঃসংযোগ হ'চ্ছে না, পূজার অঙ্গহানি হবে শেষে—

—ওসব কিছু না, উৎসব এই মাত্র। পূজা তার অঙ্গ, মন্ত্র পড়লেও হয়, না পড়লেও পূজা হ'তে পারে। ও সব আপনি কিছু ভাববেন না।

গোপাল অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। চাঁদুর কথাগুলি অত্যন্ত নূতন, কেমন যেন সূচের মত অন্তর বিদ্ধ হয়। গোপাল কহিলেন, তবে এই পূজায় লাভ কি ? যদি ভক্তি, শ্রদ্ধাই না থাকে ?

—পৈতৃক কাজ, তাই চল্ছে। অযথা অর্থব্যয়, তা হ'লেও উৎসব মানুষের জীবনে চাই ত ! তাই পূজা-পার্ব্বণ ব্রত-প্রতিষ্ঠা।

গোপাল আরও কিছুক্ষণ ভাবিয়া কহিলেন, সত্য কথা ব'লতে কি চাঁদু, তোমার কথায় আমার বিশ্বাসের ভিত্তিভূমি যেন নড়ে উঠেছে। সত্যই কি ব্রাহ্মণ দান গ্রহণের পাত্র নয়, আমরা কি সমাজ সেবার বিনিময়ে এটা পেতে পারি না ? মানুষকে ভাল কথা, তার মঙ্গলের জন্যে জীবনের শিক্ষা দীক্ষা দান করে এই দান পেতে পারি না ? সেটা কি

একান্তই মানুষের ধর্ম্মান্ধতার সুযোগ গ্রহণ করা? এই চিন্তাটা মনের মাঝে এত প্রবল হ'য়ে উঠেছে যে চণ্ডীপাঠে মনঃসংযোগ হ'চ্ছে না। নিজের কাজে নিজেকে অপরাধী মনে হ'চ্ছে, তাই বলছিলাম অন্য কেহ হয়ত সুষ্ঠুভাবে পূজা করতে পারতো—

চাঁদু মুরুব্বির মত হাসিয়া কহিল, যাকৃগে, এখন ত পূজা করুন ওকথা পরে হবে।

গোপাল ক্ষণিক চাহিয়া থাকিয়া পুনরায় চণ্ডী পাঠ করিতে লাগিলেন।

*

অষ্টমী পূজা—সকাল সাত দণ্ডের মধ্যে সমাপ্ত করিতে হইবে। অতি প্রত্যুষে পূজার আয়োজন হইয়াছিল এবং যথাসময়ে পূজা সমাপন হইয়াছে।

শশধর ও বনলতা মণ্ডপে অঞ্জলি দিবার জন্যে উপস্থিত হইলেন। পূজা গৃহে কেহ নাই, কেবলমাত্র গোপাল বসিয়া আছেন। উভয়ে মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখেন গোপাল করজোড়ে চুপ করিয়া বসিয়া আছেন—তাহার দুই চক্ষু বাহিয়া অশ্রুধারা গড়াইয়া পড়িতেছে। গোপালকে এমনি একটা অবস্থায় দেখিয়া বনলতা ও শশধর নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিলেন—ভাবিলেন ভক্তের ভক্তি-অশ্রু গড়াইয়া পড়িতেছে। এই সময়ে কোনরূপ বিঘ্ন উপস্থিত করা সঙ্গত নয় মনে করিয়া দুইজনে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন। গোপাল হঠাৎ চক্ষু উন্মীলন করিয়া একটা গাঢ় দীর্ঘশ্বাস মুক্ত করিয়া কহিলেন, মা, করুণাময়ী অপরাধ নিও না মা। আমার পাপে আমাকে শাস্তি দিও, নিরপরাধকে শাস্তি দিও না।

গোপাল একান্ত ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া মাথা তুলিতেই দেখিলেন, বনলতা দাঁড়াইয়া, তিনি প্রশ্ন করিলেন, কতক্ষণ এসেছ মা ? অঞ্জলি দেবে ? এস—এস—

গোপাল অঞ্জলি মন্ত্র পাঠ করাইয়া দিলেন। শশধর প্রশ্ন করিল, আপনার এমন হ'য়েছে কেন ঠাকুরমশায় ? আপনার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছিল—

গোপাল কহিলেন, হ্যাঁ শশধর, সত্যই মনের মধ্যে একটা বিপ্লব চল্‌ছে, পূজা করতে পারছি না। তোমাদের কল্যাণার্থে সংকল্প বাক্য উচ্চারণ করে, আমি ত ঠিক পূজা করতে পারিনি, তাই সে অপরাধ আমার—তাই মাকে ব'লছিলাম—

শশধর কহিল, চাঁদুর কথায় আপনি কিছু মনে করবেন না। আপনি মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী পুরোহিত। আপনার আশীর্ব্বাদেই আমাদের মঙ্গল। সে কি শিক্ষা পেয়েছে জানি না, যুগেরও পরিবর্ত্তন হ'চ্ছে, কিন্তু আমরা যতদিন আছি আমরা মায়ের নামেই থাক্‌বো, আমাদের যথা কর্ত্তব্য করবো—

গোপাল পুনরায় একটা দীর্ঘশ্বাস মুক্ত করিয়া দিয়া কহিলেন, কিন্তু— চাঁদুর এ বিদ্যাও ত মিথ্যা নয়। তা হ'লে ইংরেজ এত শক্তিমান হবে কেন ? তাই মনে সন্দেহ জেগেছে, নিজে বড় হওয়াই কি সব ? জগতের কল্যাণে সে ধন শক্তির ব্যয় কি অপচয় ? কিন্তু আমাদের শিক্ষা দীক্ষা শাস্ত্র ত এ কথায় সায় দেয় না—

গোপাল থামিয়া থামিয়া কহিলেন, যে দান ছিল শ্রদ্ধার, সে দান আজ হ'য়েছে উপেক্ষার, করুণার। এ দান আমি কি করে গ্রহণ করি শশধর ? চাঁদু কেমন করে ভাবলে, দুখানা কাপড় আর দক্ষিণার টাকা কম হওয়ায় আমি পূজা করবো না, মানুষ মানুষকে এত ক্ষুদ্র ভাবলে কি করে ? পৃথিবীতে স্বার্থ ছাড়া কি কিছুই নেই ? এ শিক্ষা আর

এই সভ্যতা ত তা হ'লে দেশকে ছিন্ন ভিন্ন করে রক্তাক্ত করে দেবে—

গোপাল আত্মবিস্মৃত হইয়া কহিয়া উঠিলেন, মা, জগজ্জননী করুণাময়ী মা, আমার অপরাধ ক্ষমা কর মা, ধরিত্রীকে রক্ষা কর মা।

অত্যন্ত আবেগ ভরে গোপাল মৃন্ময়ী চিন্ময়ীর পদতলে আপনাকে লুটাইয়া দিলেন। তাহার চক্ষুদুটিতে অশ্রুধারা গড়াইয়া পড়িতে লাগিল শশধর ও বনলতা বিস্ময় বিমুগ্ধ নেত্রে চাহিয়া রহিলেন মাত্র, কিছুই বুঝিলেন না।

*

বাগ্দী ও বাউরী পাড়ার কতকগুলি লোক অষ্টমীর প্রাতে চণ্ডীতলায় বসিয়াছিল, অদূরে তাহাদের গরুগুলি চরিয়া বেড়াইতেছে। শিবদাস, নিতাই ও বলাই সেখানে উপস্থিত ছিল। তাহাদের মুখে একটা বিষণ্ণতা দেখা দিয়াছে। একজন কহিল—পূজা দেখতে যাবেক নাই রে?

ভরত-পুত্র বলাই কহিল, কোথা আর যাবেক, ছোটবাবু ত নেমন্ত বন্ধ করলেক—বাবা বলেছে, ঘর পুড়ে গেলে ছোটবাবুর বাপ্ ছ'মাস গোলা থেকে খাওয়া করালেক, বসন্তসায়র করলেক—

নটবর-পুত্র নিতাই বলিল, বড়কর্ত্তা কত বলা করলেক, ঠাকুর মশায় বলা করলেক কিন্তু ছোটবাবু ছাড়লেক নাই। কলকাতা বাড়ী করবেক টাকা চাই—

নীলমণি-পুত্র শিবদাস বলিল, হোথা খাওয়া করাবেক, মোদের খাওয়াবেক কেনে? মোরা যাবেক নাই। কেনে যাবে, না ডাকলে কেনে যাবেক?

সকলের মাঝেই একটা অভিমান মাথা তুলিয়া উঠিয়াছিল তাই

সকলে কহিল, কেনে যাবেক, ছোটবাবু ত মোদের চাইলেক না। পূজা ত মোদের না রে।

বলাই কহিল, বড়কর্ত্তা ত বাপের বেটা বটেক—মোদের ত বহুৎ ক'রলেক—

শিবু কহিল, পূজা ত বড়কর্ত্তার একার লয় বটে—অভিমান ক্রমশঃ রাগে পরিণত হইল, এবং আজ অকস্মাৎ ছোটবাবু যে তাহাদিগের পুরুষানুক্রমিক মর্য্যাদাকে উপেক্ষা করিয়াছেন সেজন্য একটা বিদ্রোহের ভাব জাগিয়া উঠিল এবং স্থির হইল তাহারা কেহ আর পূজা দেখিতে যাইবে না।

সেইদিন সন্ধ্যার পরে বলাই চুপি চুপি গিয়া কহিল, শিবু নিতাই চল, নেমন্ত মোরা করে লেবেক—

—সে কি বটে—

—চল্, বসন্তসায়রে তোগী এড়া করবেক, জাল ফেলবেক, মাছ লিয়ে ভোজ দেবেক—চল—

—কর্ত্তার সায়র বটে, মোদের জিম্মা—মাছ ধ'রবেক।

—হাঁ হাঁ, চল্! পূজার নেমন্ত করে লেবেক চল্—

কিছুক্ষণ বাদে তাহাই স্থির হইল এবং বলাইএর ওখান হইতে পচুঁই পান করিয়া তাহারা জাল লইয়া বসন্তসায়রে উপস্থিত হইল। অষ্টমী পূজার রাত্রি কেহ কোথায়ও নাই। ক্ষীণ চন্দ্র নিষ্প্রভ, কিছুক্ষণ বাদেই তোগীতে একটা বড় মাছ আটকাইয়া লাফ দিল। তিনজনে সেটাকে টানিয়া ডাঙ্গায় তুলিয়া দ্রুত গৃহে আসিয়া পৌছিল। বলাই স্ত্রীকে ডাকিয়া কহিল, আরে, সুমী লে কোটা কর। ভাল করে রাঁধা কর—মোরা খাবেক—

স্ত্রী সুমীর উপর রন্ধনের ভার দিয়া তাহারা পঁচুইএর পাত্র ও মাদল লইয়া বসিল। নেশা করিতে করিতে বলাই কহিল, আরে, শিবুদা,

বৌ আনা করা, মোরা লাচবেক। বলাই মাদল বাহির করিয়া বাজাইতে আরম্ভ করিল।

গভীর রাত্রে নেশার ঘোরে শিবু কহিল, বেশ পূজা হলেক বটে, কোথা লাগে নেমন্ত—হুর তো ছোটবাবু—

বসন্তসায়রের মাছ রক্ষা করাটা এতদিন তাহারা পবিত্র কর্ত্তব্য হিসাবে পালন করিয়াছে কিন্তু আজ প্রবল অভিমানে সে কর্ত্তব্য বিস্মৃত হইয়া, তাহা চুরি করিয়া নেশার ঘোরে মাতলামি করিতেছে—

*

নবমী পূজান্তে ছোটলোক পাড়ায় সকলে শুনিল—বসন্তসায়রের মাছ দিয়া ছোটবাবু গ্রামের সম্মানিত সকলকে কালিয়া কোর্ম্মা করিয়া খাওয়াইয়াছেন, লোকে ধন্য ধন্য করিতেছে। কি সব নূতন খাদ্য খাওয়াইয়াছেন এ দেশের লোক তাহা পূর্ব্বে খায় নাই। তাহা দেখেও নাই। কলিকাতার নূতন জিনিস, নূতন রন্ধন পদ্ধতি—

ছোটলোক পাড়ায় সকলে সে গল্প শুনিল, কিন্তু কোন বিস্ময় অনুভব করিল না। তাহারা খাদ্যাদির বর্ণনা শুনিয়া মনে মনে একটু কৌতূহল অনুভব করিল মাত্র।

*

বিজয়ার দিনে সরকার তিনকড়ি সকলকে প্রতিমা বিসর্জ্জনে যাইবার জন্য ডাকিয়া গেল। পূর্ব্বে সন্ধ্যার পূর্ব্বে প্রতিমা বিসর্জ্জনের শোভাযাত্রার জন্য সহস্রাধিক লোক সমবেত হইত কিন্তু আজ কেহই নাই, গ্রামস্থ ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও সামান্য অন্যান্য জাতির লোক আছেন মাত্র কিন্তু প্রতিমা বহন করিবে কে?

সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছে, শতাধিক রেড়ির তৈলের মশাল প্রস্তুত কিন্তু কেহই নাই। শশধর ও গোপাল মণ্ডপের বারান্দায় বসিয়া ছিলেন। চাঁদমোহন আসিয়া কহিলেন, এখনও মালপাড়া বাগ্দীপাড়ার সব এল না কেন?

—তাই ভাবছি। শশধর ম্লানমুখে উত্তর দিলেন। তিনুকে ত ডাকতে পাঠিয়েছি সেও ত ফিরছে না—

কিছুক্ষণ বাদেই তিনকড়ি আসিয়া সংবাদ দিল—কেহই আসিবে না।

চাঁদমোহন প্রশ্ন করিল, কেন?

তা ত জানি না।

গোপাল কহিলেন, এ পূজা তাদেরই পূজা, এ কথা ত তারা আজ ভাবছে না—তাই আসছে না বোধ হয়। তাদের ত নিমন্ত্রণ করা হয়নি।

চাঁদমোহন উত্তেজিত হইয়া কহিলেন, কেন? তারা আমার জমিদারীতে বসবাস করে না, ভিটে ছাড়া করে দেব। আচ্ছা দেখছি তাদের—যাও তিনু বল গিয়ে, যে যে আসবে সব চার আনা করে পাবে, দেখি তাতেও আসে কিনা?

তিনু পুনরায় ছুটিল এবং কিছুক্ষণ বাদে জন বারো লোক লইয়া ফিরিল।

সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে—প্রতিমা বরণ করিয়া পুরবধূগণ প্রস্থান করিয়াছেন। মশাল জ্বালা হইল—প্রতিমা স্কন্ধে বারজন বেতনভুক লোক পিছনে পিছনে চলিল—সামনে চলিল মশালধারী সরকার বরকন্দাজ প্রভৃতি। শতাধিক লোক প্রতিমা লইয়া শিবসায়রে বিসর্জন দিয়া ফিরিল—

শিবসায়রের ঘন তালবনের নীচে উচ্চ পাড়ের উপর দাঁড়াইয়া, নিতাইদের পাড়ার আবালবৃদ্ধবনিতা দূর হইতে প্রতিমা বিসর্জন দেখিল। চিরদিনের প্রথা মত মণ্ডপে যাইয়া প্রণাম করিয়া পরস্পর কোলাকুলি না করিয়া আজ তাহারা ম্লানমুখে গৃহে ফিরিয়া আসিল।

*

কোজাগরীর পরেই চাঁদমোহনকে কলিকাতা যাইতে হইবে। চাঁদমোহন কলিকাতায় বাড়ী করিবেন সেজন্য অর্থেরও যথেষ্ট প্রয়োজন, সেই জন্য তিনি বৈঠকখানায় প্রবেশ করিলেন, শশধরের সহিত কিছু কথাবার্ত্তা বলা প্রয়োজন—

গোপাল ও শশধর বৈঠকখানায় কোজাগরী পূজার হিসাবপত্র করিতেছিলেন। চাঁদু আসিয়া কহিল, কি করছেন ঠাকুরমশায় ?

—লক্ষ্মী পূজার ফর্দ্দটা দেখছিলাম—

চাঁদমোহন কোনরূপ ভূমিকা না করিয়া কহিল, খরচপত্র কমিয়ে ফেল দাদা, সমস্ত আয় যদি পূজা পার্ব্বণেই ব্যয় হয় তবে ভবিষ্যৎটা কি থাকবে ?

কথাটার সম্যক্ অর্থ উপলব্ধি না করিয়া উভয়েই চুপ করিয়া রহিলেন। চাঁদমোহন পুনরায় কহিলেন, কলকাতায় বাড়ীটা করাই দরকার, আমার কিছু টাকা চাই তাই খরচপত্র করে বাড়ী আসা, নইলে এ অর্থ ব্যয় ও পরিশ্রম পোষায় না—

গোপাল কহিলেন, কলকাতাতেই বসবাস করবে নাকি ? তা হলে দেশে থাকবে কে ?

—দাদা থাকবে। কলকাতায় না থাকলে ছেলেমেয়েদের শিক্ষা-দীক্ষা হবে কি করে ? সেখানে দুদিক থেকে দু'পয়সা রোজগার করবার পথ আছে—

—তোমরা শিক্ষিত হ'য়েছ, তোমরা গ্রামে থেকে গ্রামের মঙ্গল করলেই দেশের মঙ্গল, কিন্তু তোমরা সব যদি শহরে যাও ত দেশ ত কাণা হ'য়ে যাবে—

চাঁদমোহন একটু ব্যঙ্গ করিয়াই কহিল, আপনারা রইলেন—আপনারাও ত শিক্ষিত—

—সে শিক্ষা কি আর এ যুগে চলবে—

—কিন্তু আমাদের শিক্ষাও ত এখানে চলবে না, এখানে আপনাদের শিক্ষাই চলবে—যাক্ গে ওসব কথা ঠাকুরমশায়। আমাকে খাজনা আদায় করে কিছু দিতে হবে দাদা—

শশধর অবাক হইয়া বলিলেন, এখন কি খাজনা আদায় হয়! প্রজাদের খাবার ধানই নেই।

কিন্তু আমার দরকার, টাকা তাদের দিতেই হবে। বেচে কিনে দেবে আবার ধান-পান হ'লে কিনে নেবে—

গোপাল শান্তকণ্ঠে কহিলেন, সেটা অত্যাচার হবে চাঁদমোহন—

—কিন্তু আমার প্রয়োজনটা আগে ভাবতে হবে ত?

—জমিদার হিসাবে তোমার কর্ত্তব্য তাদের প্রতিপালন করা সে কর্ত্তব্যটা ত ক'রতে হবে। অসময়ে খাজনা আদায় করাটা কর্ত্তব্য হবে না—

—কিন্তু প্রজারও ত কর্ত্তব্য আছে, খাজনা দেওয়াটা তাদেরও কর্ত্তব্য। তারা কি তা ক'রছে? পূজার সময়ে প্রতিমা নিতেও ত তারা আসেনি—

—সেটা তাদের অভিমান, নিমন্ত্রণ হয়নি—

—নিমন্ত্রণ করাটা আমার ইচ্ছা ও সামর্থ্যের উপর নির্ভর করে, তাদের উপর ত নির্ভর করে না। না পারলেও খাওয়াতে হবে এত বড় মজার আব্দার? আমি খাইয়ে ফতুর হই, আর তারা নেচে কুদে আমায় অপমান করুক—আসল কথা কি জানেন, আপনার টাকা আছে এই কথাটাই যথেষ্ট, তাতেই সংসারে সব হয়—টাকা থাকলেই সব—অন্য সব দয়া, মায়া, স্নেহ কর্ত্তব্য সবই টাকার খেলা। টাকা দিলে ভাল, না দিলে খারাপ এই হচ্ছে জগৎ—

গোপাল দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, তোমাদের এই চিন্তার সঙ্গে

আমাদের চিন্তা মিলে না—আর আমরা ক'দিন? তোমাদের ইচ্ছা মতই চল্‌বে। আমাদের মনে হয় স্নেহ মমতা ভালবাসা সততা এসব টাকার অনেক উর্দ্ধে, টাকার দ্বারা তা পাওয়া যায় না—সম্মানও নয়—

চাঁদমোহন হাসিয়া উঠিলেন—হাসিতে একটা অবজ্ঞা ও বিজ্ঞতার ভাব পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। গোপাল কোন জবাব না দিয়া প্রস্থান করিলেন। চাঁদমোহন কহিল, আমাদের সমস্ত ঘরের কথার মধ্যে ঠাকুরমশাই কেন? তিনি পূজার্চ্চনা ক'রবেন, দক্ষিণা পাবেন, ব্যস্। এসব কথা ওর কাছে কেন?

শশধর সংক্ষেপে কহিলেন, বাবার আমল থেকে চ'লে আস্‌ছে।

—কিন্তু বাবার আমল ত নেই। দিনকাল পরিবর্ত্তন হ'য়েছে। এখন খাজনা আদায়ের কি করবে—

—এখন খাজনার কথা বলাটা ত ধর্ম্ম নয়, তাই ভাবছি।

—ধর্ম্ম ধর্ম্ম করেই গেলে। নিজেকে রক্ষা করা, বড় হওয়াই সব চেয়ে বড় ধর্ম্ম। আত্মানং সততং রক্ষেৎ। তুমি কিছু ব'লো না, আমি টাকা আদায় করে নিচ্ছি। টাকা কি করে আদায় করতে হয় তা আমি জানি।

শশধর কোন জবাব দিলেন না। চাঁদমোহন কহিলেন, পেয়াদা লোকটার নাম কি?

—কালী বাগদী—

চাঁদমোহন কালী ও সরকার তিনুকে ডাকিয়া হুকুম দিলেন, যাও, সমস্ত প্রজাকে—না হয় সমস্ত পাড়ার মোড়লকে কাল সকালে কাছারীতে হাজির হ'তে বলে এসো। গ্রামছাড়া অন্যান্য মৌজাও ডাক্‌বে—

কালী ও তিনু কহিল, আচ্ছা ছোটবাবু—

*

পরদিন সকালে কাছারী বাড়ীতে মাতব্বর প্রজা সকলে সমবেত হইল। চাঁদমোহন শশধরকে সঙ্গে লইয়া কাছারীতে উপস্থিত হইলেন। সকলে উঠিয়া প্রণাম জানাইল।

পলাশডাঙ্গার গোষ্ট মাতব্বর কহিল, বড়কর্ত্তা, আমাদের গাঁয়ে কিছু ধান দাদন না দিলে সকলের বড়ই কষ্ট হ'চ্ছে। গত সন দক্ষিণ মাঠের ধান পোকায় মেরে দিয়েছিল—

চাঁদমোহন কহিলেন, বড়কর্ত্তা কি? বড়বাবু বলবে—সব—

—হ্যাঁ হুজুর, বড়বাবু। আমরা ছোটনোক, কথা বলতে জানি না—

চাঁদমোহন উদাত্ত কণ্ঠে কহিলেন, শোনো তোমাদের ডাকা হয়েছে কেন, তাই বলি। আমি আর চার পাঁচদিন থাকবো, তার মাঝে তোমরা বকেয়া সমস্ত খাজনা মিটিয়ে দেবে, আর হাল ছমাস দেবে—বিশেষ প্রয়োজন আছে—

বলাই কহিল, হুজুর, ছোটবাবু, ঘরে খাবার ধান নাই, খাজনা দেবেক কেমনে? মনিষ খাটা করাবেক—

—চুপ, ওসব কথা আমি শুন্‌তে চাই না। মদের ধান, বিয়ের টাকা সব জোটে, কেবল জমিদারের খাজনাটা জোটে না—যারা দেবে তারা বাধ্য প্রজা বলে ধ'রে নেব। যারা দেবে না তারা অবাধ্য বলে গণ্য হবে, এবং কিস্তিতে কিস্তিতে নালিশ করে তাদের উচ্ছেদ ক'রে দেব। তাই বুঝে চল্‌বে—ধান দাদন বরাবর তোমরা চাও আমি আজ ন্যায্য টাকা চাইছি তাতে আপত্তি হবে কেন?

শিবু উঠিয়া কহিল, হুজুর মা বাপ্, খাজনা চৈত মাসে মোরা শোধ করবো, এ কার্ত্তিক মাসে কোথা পাবেক সব?

—ইচ্ছে থাক্‌লে হবে, কিন্তু অতিচ্ছা থাক্‌লে ব্যাপারটা গুরুতর হবে জেনে রেখো—

সকলে পরস্পরের মুখ চাহিয়া রহিল—এমন অবিবেচনার আদেশ তাহারা কখনও পায় নাই তাই সকলেই বিস্মিত হইয়াছিল।

শিবু পুনরায় সাহস সঞ্চয় করিয়া কহিল, বড় কর্ত্তা—

চাঁদমোহন ক্রুদ্ধস্বরে কহিল, বড় কর্ত্তা নয়, আমি যা ব'ল্‌বো তাই করতে হবে। দাদাকে ভাল মানুষ পেয়ে তোমরা মাথায় কাঁঠাল ভাঙ্গতে শিখেছ, কিন্তু চিরদিন তা চলবে না। তিন বছর, চার বছর সব খাজনা বাকী—এ কি নিষ্কর ব্রহ্মোত্তর না কি ?

চাঁদমোহন কাজ ও অর্থ চিনেন, তাহার কাছে যুক্তিতর্ক, আব্দার যেমন নিষ্ফল, তেমনি স্নেহ-মমতা করুণা-সহানুভূতিও আশাতীত। প্রজাগণ তাই ম্লানমুখে একে একে ফিরিয়া আসিল।

*

গোপাল কাল রাত্রিতে একটা মানসিক ৺কালীপূজা করিয়াছেন। সারা দিনরাত্রি উপবাস গিয়াছে, পূজান্তেও তিনি বিশেষ কিছু গ্রহণ করেন নাই। তাহার বয়স হইয়াছে, উপবাস আর তেমন সহ্য হয় না—কাজেই সকালে যখন ঘুম হইতে উঠিলেন তখন সর্ব্বাঙ্গে যেন একটা জড়তা ও আলস্য জমাট বাঁধিয়া বসিয়াছে। গত রাত্রির অনাহার প্রভৃতি সম্বন্ধে ভাবিতে ভাবিতে তাহার মনটা একদিকে যেমন বিষণ্ণ, অন্যদিকে তেমনি উত্তেজিত হইয়া উঠিতেছিল—যজমানের মানসিক কালীপূজায় আহারাদি, গান বাজনা প্রভৃতির জন্য যথেষ্ট ব্যয় হইয়াছে কিন্তু পূজা করিতে বসিয়া তিনি দেখেন ৺মায়ের জন্য একখানা আট-হাতি শাড়ী আসিয়াছে। যজমান অধুনা শিক্ষিত ব্যক্তি

এবং অর্থবান। গোপাল তাই বলিয়াছিলেন, এত খরচ করলে বাবা, কিন্তু ৺মাকে আট হাতি কাপড় পরালে ? আর বাবাকে দু'হাতি গামছা ?

যজমান জবাব দিয়াছিল, কাপড় ত মা পরবেন না, আপনার ছেলে মেয়েরা পরবে—ওতেই হবে—

গোপাল উত্তেজিত হইয়া বলিয়াছিলেন, ৺মা ত খান না, তবে আর কেন নৈবেদ্য বলিদান প্রভৃতি দেওয়া ? না দিলেই ত হয়, আর পূজা করবারই বা কি প্রয়োজন ?

—এই একটু আমোদ করা, মেয়েরা ধর্ম্মান্ধ তাই—নইলে সবই ত অপব্যয় আর বামুনকে খাওয়ানো।

গোপাল বিরক্ত হইয়াছিলেন—চারিদিকে একই কথা, পূজা আর পূজা নয়, বিলাস ব্যসনের অঙ্গ মাত্র। এই উপেক্ষার দান গ্রহণ করিতে তাহার প্রাণ ফাটিয়া যায়, পূজায় মনঃসংযোগ হয় না কিন্তু উপায় নাই, জমিতে ধান জন্মে না, জন্মিলেও চাষীতে ফাঁকি দেয়। পূজার্চ্চনা কমিয়া গিয়াছে, পাওনা ততোধিক কমিয়াছে। সংসার চলে না, দুইটি ছেলে ইংরাজি স্কুলে পড়ে তাহাদের খরচ যথেষ্ট—

গোপাল বড় ঘরের দাওয়ায় বসিয়া ভাবিতেছিলেন, আনমনে হুকা টানিতে টানিতে অনেক কথাই মনে পড়িতেছিল। মতি ঠাকুর মহাশয় যখন মারা যান সে সময়ে হরি ইংরাজি স্কুলে পড়ে। মৃত্যুর সময়ে তিনি বলিয়া গিয়াছিলেন—হরি রইল দেখিস্ গোপাল—

গোপালের পিতার মৃত্যুর সময় তিনিও এমনি বলিয়াছিলেন, মতি ঠাকুর সারাজীবন তাহা পালন করিয়াছেন। গোপালও নিজে না খাইয়া, জমি বন্ধক দিয়া হরিহরকে দুইটা পাশ করাইয়াছেন, জীবনে তাহার পড়ার খরচা জোগাইতে দুইখানির বেশী কাপড় তাহারা পরেন নাই—শেষ পরীক্ষার ফি দিবার সময় গোপালের স্ত্রীর হার বাঁধা দিয়াছিলেন তাহা সুদের দায়ে বিক্রয় হইয়া গিয়াছে—আজ হরি ভাল

চাকুরী করিতেছে যদি মাসে দশটা টাকা সাহায্য করিত, তবে এই অবহেলা ও-উপেক্ষার দান আর তিনি গ্রহণ করিতেন না।

যজমান একটা লোকের মাথায় একটা ঝুড়িতে পুরোহিতের প্রাপ্য জিনিষপত্র আনিয়া কহিলেন, কাল হঠাৎ চলে এলেন ঠাকুরমশায়, আপনার জিনিষপত্র সব তাই নিয়ে এলাম। পূজার পরে একটু কিছু খেলেন না—

লোকটির কথাটার ভঙ্গি দেখিয়া গোপাল বিরক্ত হইলেন। কহিলেন, তোমরা তখন গান বাজনায় ব্যস্ত ছিলে তাই আর বিরক্ত করিনি। পূজার পরে মণ্ডপেও কেউ ছিলে না, তাই চলে এলাম—পূজার প্রয়োজন যখন নেই—তখন আর আমি থাক্‌বো কেন ?

লোকটি হাসিয়া কহিল, ও রাগ করে চলে এলেন, তা আমি এমন ত কিছু বলি নি। না খেয়ে চলে এলেন উপবাসের পরে—মা বলছিলেন।

গোপাল ক্রুদ্ধস্বরে কহিলেন, তোমরা ত ভাবো নি সেজন্যে—

—আমি একটু ব্যস্ত ছিলাম গান বাজনায় তাই। আপনার জিনিষপত্র রইল—

—ও তুমি ফিরিয়ে নিয়ে যাও, ঐ অবহেলার পূজার কুণ্ঠিত দানকে আমি গ্রহণ ক'রবো না—নিয়ে যাও—

—তা কি হয়, ঠাকুরমশাই। আপনি রাগ ক'রছেন—আর আজ মা ব'ললেন আমাদের ওখানে খাবেন—

—না, খেতে পারবো না, তোমার মাকে ব'লো—

লোকটি সামান্য পূজারী ব্রাহ্মণের এই অভিমান ও অসঙ্গত ক্রোধ দেখিয়া হাসিয়া ফেলিল, আচ্ছা আসি তাহ'লে ঠাকুরমশায়—

—ও সব নিয়ে যাও—

—তা কি হয় ঠাকুরমশায়। না হয় নিজগুণে অপরাধ ক্ষমা করে নেবেন।

ব্যঙ্গের হাসি হাসিয়া লোকটি চলিয়া গেল—

গোপাল দ্রুত হুকা টানিতেছিলেন—এমনি করিয়া অসম্মান বরণ করিয়া আর কতদিন জীবন ধারণ করা চলিবে। তাহার কর্ত্তব্য, চিন্তা সবই যেন বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছে, ব্রাহ্মণেরা সমাজের শিক্ষকও নাই, গুরুও নাই, তাহার হিতাকাঙ্ক্ষাও অনাকাঙ্ক্ষিত, তবে এ দান কেন গ্রহণ করিবেন। হরিকে বলিলে যদি সে দশটা টাকাও দেয় তবে হয়ত এ অসম্মানকে আর বরণ করিতে হয় না। কিন্তু হরিকেই বা কেমন করিয়া বলেন যদি সে আজ স্বেচ্ছায় কিছু না দেয়। সেত প্রচুর রোজগার করে কোনদিনই ত কিছু দেয় নাই—তবে কি করিয়া তিনি চাহিবেন?

হরির ছেলেমেয়েরা আধুনিক জামা গায়ে ঘুরিতেছে; সে ত পূজার সময়ও তাহার ছেলেদের জন্য কিছু আনে নাই, দিবার শক্তি থাকিলেও হয়ত ইচ্ছা নাই, কাজেই বলা চলে না। সংসারের এই অনটন দেখিয়াও সে ত দেখে না—তবে ছেলেমানুষ—অত বুঝিয়া সুঝিয়া চলিবার মত বুদ্ধি হয়ত তাহার হয় নাই—এই ত সেদিনের ছেলে—

গোপাল মনে মনে যখন হরিকে প্রায় ক্ষমা করিয়া ফেলিয়াছেন এমনি সময়ে হরি আসিয়া তাহার সামনে বসিল। গোপাল মুখ তুলিয়া কহিলেন, কি হরি?

—ছুটি ফুরিয়ে এল, পরশু যেতে হবে—

—ও আচ্ছা দেখি, দিনটা ভাল ত? গাড়ী একখানা চাই কেমন? আচ্ছা—

—একটা কথা ব'লব ভাবছি—

—বল বাবা বল, আমিও ঘুরেই বেড়াচ্ছি। কথা ব'লব, দু'দণ্ড তোমাদের নিয়ে কাটাবো তার সময়ই নেই।

গোপাল মনে মনে ভাবিয়াছিলেন, সংসারের অবস্থা বোধহয় হরি

বুঝিয়াছে এবং কিছু সাহায্য করিবে বলিয়াই হয়ত বা কিছু বলিতে চায়। গোপাল মনে মনে আশান্বিত হইয়া কহিলেন, বল বাবা বল—তোমরা বড় হ'য়েছে বলবেই ত ?

হরি মাথা নত করিয়া কহিল, চাকুরী যা করি তাতে ত সংসার চলে না। পড়াশুনো আছে, মেয়েও ত বড় হচ্ছে—বিয়ে দিতে হবে—

গোপাল বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিলেন—চলে না ?

—এখানে হলে চলত কিন্তু শহরে থাকি, ভদ্রলোকদের সঙ্গে থাকতে হ'লে একটু কাপড় জামা গয়নাপত্র লাগে, একটু ষ্টাইলে থাকতে হয়—মানে ষ্ট্যাণ্ডার্ড অফ্ লিভিং সেখানে ত বেশী—

গোপাল শঙ্কিতভাবে কহিলেন—ও তাই—

—বলছিলুম, জমি জাতির—মানে—ধান-পানের হিসাবটা একটু দেখতাম, আমার অংশের ধান—

গোপাল বিস্মিত হইয়া অনেকক্ষণ চাহিয়া রহিলেন, যেন কথাটা ঠিক বুঝিতে পারেন নাই। তাহার পরে কহিলেন, হিসাব কিছু ত রাখিনি বাবা—কোনদিনই রাখা হয় না—

হরি মৃদুকণ্ঠে কহিল, কিন্তু রাখা ত দরকার।

—তোমার বাবাও কোনদিন হিসাব রাখেন নাই, আমিও রাখিনা—আমার বাবা মৃত্যুর সময়ে তোমার বাবাকে বলে গিয়েছিলেন তিনি সারা জীবন পুত্রাধিক স্নেহে আমাকে প্রতিপালন করেছেন। তোমার বাবা মৃত্যুর সময়ে তোমাকে আমার হাতে দিয়ে গেছেন—আমি যথাসাধ্য করেছি—কিন্তু ধানের হিসাব ত কোনদিন কেউ রাখেনি—

কথাগুলি শুনিয়া হরি লজ্জিত হইয়াছিল, কিন্তু কেন যেন তবুও ইতস্ততঃ করিতেছিল। গোপাল বুঝিলেন সে যেন আরও কিছু বলিতে চায়; তাই কহিলেন, আমাদের ভাবনার সঙ্গে তোমাদের মত শিক্ষিত লোকের ভাবনা ঠিক মিলে না, তোমরা যা বল তা ঠিক বুঝতে পারি না,

যা বল্‌বে স্পষ্ট করে বল বাবা—তাতে দোষের কিছু নেই, লজ্জারও কিছু নেই—

হরি ঢোক গিলিয়া কহিল, সংসার চলে না মানে—যেমন চলা উচিত তেমন চলে না, তাই আমার একটা অংশ ত আছে সম্পত্তির—

গোপাল কহিলেন, নিশ্চয়ই আছে, সে অংশ যদি তুমি নিতে চাও তবে এখন থেকে হিসাব রাখবো, ধান নিয়ে যেও—তা'তে তোমার লজ্জার কি আছে—

হরি এইবার সত্যই লজ্জিত হইয়াছিল—সে ধীরে ধীরে উঠিয়া গেল—

গোপাল পুনরায় তামাক সাজিয়া টানিতে লাগিলেন—বারবার তাহার কোটরগত চোখ দুইটি অশ্রুভারাক্রান্ত হইয়া উঠিতেছিল। অবশেষে ঠাকুর পূজার জন্য উঠিয়া পড়িলেন—স্নান, পুষ্পচয়ন ও পূজা ত করিতে হইবে। মর্ম্মস্থল হইতে একবার কহিলেন, নারায়ণ, নারায়ণ—তাহার পর গামছা কাঁধে করিয়া স্নানে চলিয়া গেলেন।

*

হরিহরের স্ত্রী আধুনিক শিক্ষিত ঘরের মেয়ে, কলিকাতার নিকটবর্ত্তী স্থানে তাহাদের বাড়ী এবং শিক্ষিতাও বটে অর্থাৎ সামান্য ইংরাজিও পড়িয়াছিলেন। প্রকৃতপক্ষে হরিহর যতই বিদ্বান ও বুদ্ধিমান হউন ব্যক্তিত্ববতী বড়লোকের মেয়েটির নিকট তিনি আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, তাহার নিজস্ব মতামত বলিতে বিশেষ কিছু আর অবশিষ্ট ছিল না—

রাত্রে স্বামী স্ত্রীতে কথা হইতেছিল। স্ত্রী কহিলেন, কবে যাচ্ছো? এখানে কি থাকা যায়?

—শিগগিরই যাবো।

—এতগুলো টাকা খরচ করে এখানে এসে এই কষ্ট ভোগ করে কি লাভটা হ'ল তোমার? এ টাকায় ত মেয়েটার দু'টো রুলি হত!

—সকলের সঙ্গে দেখা হ'ল এই—

—তোমার কাকা কি ব'ল্লেন?

হরি একটু অপ্রতিভ ভাবে চুপ করিয়া রহিলেন। স্ত্রী কহিলেন, সে জানি, যেয়ে মিউ মিউ করেছ—কেমন ত?

হরি কহিল, বাবা ম'রবার পর আমাকে কাকাই মানুষ ক'রেছেন, তাঁকে ভাগ বাঁটোয়ারার কথা বলি কি করে? বিয়ের সময় কাকীমা গলার হার খুলে তোমাকে দিলেন—সে সব ত জানো—

—তবেই তুমি সংসার করেছ। এ বিদঘুটে গাঁয়ের বাড়ীতে আমি থাকৃতে পারবো না। ওখানে বাড়ীটা তা হ'লে করবে না ত? তোমাকে মানুষ যেমন করেছেন তেমনি তোমার সম্পত্তির সবই খেয়েছেন, ট্যাঁক থেকে ত কিছু করেন নি?

—তাতে কি সব হ'য়েছে—

—না হোক নিজের ন্যায্য অংশের ধান টাকা চাইবে তাতে লজ্জা বা সংকোচের কি আছে?

হরি অসহায়ের মত কহিল, হিসাব রাখবেন ত ব'ল্লেন—

—তা হ'লেই সব হল। হিসেবের কাগজ গলায় মাদুলী করে ঝুলিয়ে রাখো, তাতেই সব হবে। একটা কথা বোঝো না, তোমার যদি এমন তেমন হয় তবে আমি যাবো কোথায়, ঐ সামান্য লাইফ্ইনসিওর ছাড়া কি আছে? একটা বাড়ীও ত নেই যে মাথা গুঁজবো—যা সোনা আছে মেয়ের বিয়েতে ত চলে যাবে—

হরি মৃদু প্রতিবাদ করিল, বাবা ত লাইফ্‌ ইন্‌সিওর করেন নি, তাতে আমি ত ভেসে যাই নি—

স্ত্রী কহিলেন, হ্যাঁ সেরা বুঝ্‌ বুঝেছ, বুঝেছি আমার অদৃষ্টে অনেক আছে, তবে সে জব্দ করতে পারবে না, গলায় দড়ি দেওয়া ত কেউ ঠেকাতে পারবে না—

তাহার পরে যাহা হইল সেটি সহজ বোধ্য—স্ত্রীর শেষ মারণাস্ত্র চোখের জল ছাড়িয়া বিছানায় লুটাইয়া পড়িলেন—যেন হরিহর সত্যই পরলোক যাত্রা করিয়াছেন এবং স্ত্রী নাবালক পুত্র কন্যা লইয়া একেবারে পথে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন এবং অত্যন্ত অসহায় অবস্থায় উচ্চৈস্বরে ক্রন্দন করিতেছেন।

*

হিঙ্গুল বনের ধারে শালবনের নতুন কচি সবুজ পাতা বর্ষান্তে গাঢ় সবুজ হইয়া উঠিয়াছে। উচ্চ ভূমি বর্ষার জলে ধৌত হইয়া চিক চিক করিতেছে। নতুন নতুন মসৃণ পরিষ্কৃত পাথর আত্মপ্রকাশ করিয়াছে—মাঠে নতুন ধানে সবে মঞ্জরী দেখা দিয়াছে। বর্ষাস্নাত শারদীয় পৃথিবী অপরাহ্নের রৌদ্রে ঝিকমিক করিতেছে—

বলাই, নিতাই ও শিবদাস গরুগুলিকে শালবনে ছাড়িয়া দিয়া মহুয়া-তলায় তিনখানা পাথরে বসিয়া কথা বলিতেছিল। মসৃণ পাথরের গোড়াটা পাচনী দিয়া খুঁচিতে খুঁচিতে শিবদাস কহিল, খাজনা দেওয়ার কি করবেক রে নিতাই—

নিতাই বলিল, কোথা থেকে দেবেক, গরু বেচবেক না হাল বেচবেক—যা হয়—হোক্‌ কেনে—

শিবদাস ভীত হইল—ছোটবাবু জমি কেড়ে লেবেক, খাবেক কি? জমিদার—

বলাই বলিল, কি করবো, দুবিঘা জমি কর্ত্তা দেওয়া কর্‌লেক, খাজনা আড়াই টাকা—উ লেয় লেবেক, খাদকে চলে যাবো—দেশান্তরী হবো—

নিতাই কহিল, এক কাজ কর কেনে—বসন্তসায়রে মাছ ধরা কর্‌, ভিনগাঁয় বেচে খাজনা দে কেনে—এ কার্ত্তিক মাসে কে টাকা দেবেক—

বলাই কহিল, চুরি করবো কেনে? নেই ত দেবো না—ছোটবাবু ত সব লয়, বড়বাবু ত রইছেন—

শিবদাস কহিল, বড়বাবু ত আর জমিদারী দেখা করবেক নাই—ছোটবাবুই ত দেখা ক'রবেক—

বলাই কথাটা অনুমোদন করিল না। সে কহিল, কি হবেক, কি করবেক শুনি? খাজনা মোরা দেবেক নাই—

—খাস জমি কেড়ে লেবেক।

—কে হাল দেবেক বল? তু দিবি? না হয় মোরা দেবেক, বাবু ত জমি চষবেক নাই—সব মোরা খাজনা দেবেক নাই; কি করবেক?

শিবদাসের ভয় ছিল, যে খাজনা দিবে না তাহারই জমি ছাড়াইয়া লইবে, অতএব তাহার আর উপায় নাই। বলাই প্রস্তাব করিল যদি সকলেই খাজনা না দেয় তবে কাহার জমি ছাড়াইবে এবং কাহাকেই বা দিবে? জমি ত বাবু নিজে চাষ করিবে না! এ প্রস্তাব সাধু সন্দেহ নাই কিন্তু শিবদাস কহিল, খাজনা ত বাউরী পাড়ার কতক দেওয়া কর্‌বেক—ধান ছিল বেচা করলেক। মোদের বটু, ফকির, ভজু ত খাজনা দেওয়া করলেক বটে—

বলাই এবার বিপন্নমুখে কহিল, তবে ত বিপদ কর্‌লেক বটে!

নিতাই কহিল, তু মাছ ধর কেনে—দুটো মাছ ধরা কর, খাজনা হবেক বটে!

বলাই রুক্ষস্বরে কহিল, মোরা খাজনা দেবো নাই, জমি ছাড় হলে খাদকে যাবো—

একটা গরু শালবনের সীমানা ছাড়িয়া ধানের মাঠে নামিতে যাইতেছিল, বলাই সেইটার উদ্দেশ্যে অশ্লীল গালাগালি দিয়া ছুটিল—এবং ছোটবাবুর অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিল গরুটিকে নিদারুণ প্রহার করিয়া।

*

রাত্রি নিশীথ—

আকাশে কৃষ্ণপক্ষের অস্তায়মান ক্ষীণ চাঁদ—পাণ্ডুর জ্যোৎস্নায় পৃথিবী নিদ্রাতুর। নিতাই ধীরে ধীরে উঠিয়া বলাইকে ডাকিল, বলাই চল্, বসন্তসায়রকে মাছ ধরা করি—

বলাই চোখ মুছিতে মুছিতে উঠিয়া আসিয়া কহিল, তু যাবি ?

—হ্যাঁ বটে, মাছ ধরা করবেক, খাজনা দেবেক—

বলাই কি যেন ক্ষণিক ভাবিল, তাহার পর কহিল, নাঃ মু যাবো না—

নিতাই ধীরে ধীরে যাইয়া শিবদাসকে ডাকিল, শিবুদা, চল্—

শিবু উঠিল। গোটা দুই তোগী ও জাল লইয়া বসন্তসায়রে উপস্থিত হইল। তোগী দুইটিকে সায়রের ঘাটে রাখিয়া তাহারা জাল লইয়া নামিল। বর্ষায় জল অনেক বাড়িয়াছে ; সাধারণ জালে মাছ ধরিবার উপায় নাই। তবে টানা জালে ঘাট ঘিরিতে পারিলে ঘেটেল মাছ দুই একটি ধরা পড়িতে পারে। প্রথম ঘাটটা ঘিরিতেই একটা সের তিনেক কাতলা মাছ ধরা পড়িল। ভোরের পূর্ব্বে তিনটি মাছ প্রায় বারসের মত ধরা পড়িয়া গেল। নিতাই কহিল, শিবুদা তু যা কামারডাঙ্গাকে, মু যাবে মামুদপুর—মাছ বেচা করে ফিরচি—

—হাঁ, তাই চ—

তাহারা দ্রুত মাছ লইয়া চলিয়া আসিল এবং সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই ভিন্নগ্রামে রওনা দিল। চারিটি টাকা সংগ্রহ করিতে পারিলেই আপাততঃ ছ'মাসের খাজনা দিয়া রেহাই পাওয়া যায়।

*

গোপালপুর হইতে নিকটবর্ত্তী গঞ্জ প্রায় বার মাইল দূরে। গ্রামের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ গ্রামের ব্যবসায়ীরা ঐ গঞ্জ হইতে আনে এবং গ্রামে বেচাকেনা করে। গোবিন্দ তিলির ছেলে বংশী মুদিখানার দোকান করে। তাঁতিদের মধ্যে নবীন তাঁতি মনোহারী দোকান করে এবং হারু তাঁতি হাটে হাটে কাপড়ের দোকান লইয়া বেড়ায়। গোপালপুরের বারোয়ারী তলার অদূরে সপ্তাহে দুই দিন হাট বসে। তাহাতে সব জিনিষই পাওয়া যায়, গ্রামেও সাধারণ প্রয়োজনীয় সব জিনিষই পাওয়া যায়। বংশীর দোকানই বড়—কুলুদের অনেকেই গাড়ী চালায় এবং চাষ আবাদ করে—এমনি করিয়াই এই তিরিশ বছর তাহারা বাঁচিয়া আছে। দুই-চারখানা তাঁত চলে, তাহাতে গামছা ও মশারীর থান হয়।

কোজাগরীর পরে অকস্মাৎ একদিন মেঘ করিয়া প্রথমে ঝিম ঝিম করিয়া পরে বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি নামিল এবং বর্ষার বর্ষণান্তে এই সামান্য বৃষ্টিতেই পথঘাট এবং মাঠ কর্দ্দমে পিচ্ছিল হইয়া গেল—চাঁদ-মোহনের যাইবার কথা ছিল কিন্তু তিনি রাস্তাঘাটের অবস্থা দেখিয়া একটু চিন্তান্বিত হইয়া উঠিলেন।

দুই-তিনদিন ধরিয়া ঝিম্ ঝিম্ বৃষ্টি হইতেছে—সারদা মল্লিকের ছেলে বিষ্ণু সরিষার তেল কিনিতে গিয়াছিল বোতলটা দরজার সামনে

নামাইয়া, ছাতাটা বাহিরে রাখিয়া পা মুছিয়া দোকানে প্রবেশ করিল। বংশী কহিল, কি বিষ্ণুদা, স'রষের তেল চাই নাকি ?

—হ্যাঁ হে বংশী। আরও জিরে চাই, নুন চাই—

—চাইত খুড়ো—কিন্তু মাল যে নেই। গাড়ী ত গঞ্জে যায় না, সারা দিন ঘুরে ডবল ভাড়া দিয়েও গাড়ী পেলাম না—

—কিছুই নেই কি ?

—নেই ঠিক তা নয়, তবে কি জানো—অবশ্য তোমাকে ফেরাই কি করে ?

—তা ত বটে, কিন্তু ব্যাপার কি ?

—দরটা চড়ে গেছে—আমদানী নাই ত ! সরষের তেল ছ আনা হলে দিতে পারি, তাও এক পো—আর—

বিষ্ণু চোখ কপালে তুলিয়া কহিল, বল কি বংশী, চার আনার বদলে ছ আনা—এ যে মাথায় কাঁঠাল ভাঙ্গা আরম্ভ ক'রলে—

—তবে ঠাকুর, যেখানে পাও যাও, আমার তেলই নেই—তার দেব কি ?

বিষ্ণু কহিল, এটা কি ধর্ম্ম হ'ল বংশী। কায়দায় পেলে এমনি টাকা আদায় করা—

বংশী কহিল, ঠাকুর টাকা রোজগারটাই ত ধর্ম্ম। তাছাড়া আর কি ধর্ম্ম আছে বল ? গরীব বলে চোখ রাঙাচ্ছো ত, ছোটবাবু যে খাজনা আদায় ক'রছে তাতে ত কিছু বলছ না—

বিষ্ণু স্তব্ধ হইয়া বাহির হইয়া আসিল এবং সোজা ভগবতী চাটুয্যেদের কাছারীতে আসিয়া উঠিল। চাঁদমোহন বসিয়া খাজনা আদায় পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন। বিষ্ণু তাহার নিকট বংশীর ব্যাপারটা বর্ণনা করিয়া কহিল, আপনি ছোটবাবু, জমিদার, আপনি থাকতে এমন অনাচার হবে আপনি দেখবেন না !

চাঁদমোহন কহিলেন, অন্যায়, নিশ্চয়ই অন্যায়। লাভ সে পাবে কিন্তু একেবারে দেড়া দাম—কালী, বংশী তিলিকে ডাক ত—

কাছারী হইতে আহ্বান পাইয়া বংশী আসিল এবং অত্যন্ত বিনয়ের সহিত সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া আলিসায় বসিল। চাঁদমোহন প্রশ্ন করিলেন, তেল ছ'আনা চেয়েছ ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, দর হ'য়েছে—

—তাই বলে দেড়া দাম চাইছ এটা কি হ'ল—

বংশী কহিল, ব্যবসায় লাভ ক্ষতি আছেই, সুবিধে পেলে লাভ হয়। আজ্ঞে তাই। আর ব্যবসাটা ত টাকার জন্যেই করি হুজুর—

—তা বটে, কিন্তু লাভের একটা সীমা আছে ত ?

বংশী হাসিয়া কহিল, হুজুর একটিন তেল আনবার জন্যে দুই টাকা দিয়েও লোক পাইনি। গাড়ী ত বন্ধ—নিজে মাথায় ক'রে এনেছি তা আমি কি দু'টো টাকা পাবো না! আর টাকার জন্যে আনিনি হুজুর—গ্রামের লোক তেল পাবে না আমি থাকতে, এই জন্যেই আমি মাথায় করে এনেছি হুজুর। আপনি ধর্ম্মাবতার, বিচার করে দেখুন আমি দুটো টাকা মুনাফা পেতে পারি কি না ?

বিষ্ণু কহিল, তুমি আবার কবে গেলে গঞ্জে বল ?

বংশী হাসিয়া কহিল, ঠাকুর মশায় বৃষ্টিতে আপনি ঘর থেকে বেরোন নি আপনি জানবেন কি করে—এর নাম ব্যবসা—

উপস্থিত সকলেই বুঝিল এ সম্পূর্ণ মিথ্যা, কিন্তু বিরুদ্ধ যুক্তিও কিছু দিল না। চাঁদমোহন প্রশ্ন করিলেন, খাজনা আদায় ক'রছি বলে তুমি কি বলেছ ?

—টাকার দরকার বলেই হুজুর খাজনা চেয়েছেন, তাই বলেছি। আমিও টাকার দরকার বলেই ব্যবসা করি, বৃষ্টিতে যখন সকলে ঘরে শুয়ে

থাকে আমি তখন ভিজতে ভিজতে গঞ্জে যাই—আজ্ঞে এই বলেছি হুজুর।

চাঁদমোহন যুক্তিতে পরাস্ত হইয়া কিছু পুঁথিগত ধর্ম্মোপদেশ দিয়া বংশীকে বিদায় করিলেন। বংশী দোকানে ফিরিয়া আসিতেই বিষ্ণু আসিল। বংশী কহিল, তেল নেই ঠাকুর, ফুরিয়ে গেছে এবং মুখ গোঁজ করিয়া বসিয়া রহিল। নিতাই একছটাক তেলের জন্য দোকানে আসিয়া তেলের বোতলটা দিল। বংশী কহিল, আট আনা সের, ইচ্ছে ক'রলে নিতে পার—

নিতাই কিছু বলিবার পূর্ব্বেই বিষ্ণু কহিল, এই যে নেই ব'ললে!

—তুমি ত বড় বেয়াড়া লোক ঠাকুর, আট আনা হ'লে আছে, নইলে নেই—বুঝলে। ধর্ম্ম কর্ম্ম কে ক'রছে বল? সকলেই টাকার পূজো আরম্ভ করেছে আমরাও করেছি।

বিষ্ণু বোতল হাতে নির্ব্বাক বিস্ময়ে দাঁড়াইয়া রহিল।

*

হরিহর আজ বাড়ী হইতে চাকুরীস্থলে যাইবে, যাত্রার শুভদিন, গোপাল ঠাকুর দেখিয়া দিয়াছেন। সদর দরজায় গরুর গাড়ী অপেক্ষমান, ভারবাহী বলদ দুইটি দুই আঁটি শুষ্ক খড় চিবাইতেছে। গাড়োয়ান ভিতর হইতে চাউল প্রভৃতি তাহার প্রাপ্য বুঝিয়া লইয়া গাড়ীর মাঝে সাজাইয়া রাখিতেছে, পথে ফিরিবার কালে তাহাকে পথে রাঁধিয়া খাইতে হইবে। রেল ষ্টেশন হইতে ফিরিবার সময় গরুরও বিশ্রাম প্রয়োজন এবং চালককেও ভাত খাইয়া লইতে হয়। কুকুটিয়ার আম-বাগানে সকলেই রাঁধিয়া খায়—

হরিহর সহপাঠী চাঁদমোহনের সহিত দেখা করিতে গিয়াছিল, তাহার

যাইতে এখনও দুই চারদিন দেরী হইবে। হরিহরের স্ত্রী বাক্স পেটরা প্রভৃতি দেখাইয়া দিতেছিলেন, গাঁড়োয়ান একে একে তুলিতেছিল। হরিহর ফিরিয়া আসিলে গোপাল প্রশ্ন করিলেন, কি বাবা, দেখা হ'ল, কথাবার্ত্তা সব হ'ল—

—হ্যাঁ—কি যেন একটা কথা বলিতে যাইয়া হরিহর থামিয়া গেল। গোপাল পুনরার্য় প্রশ্ন করিলেন, কি কথা সব হ'ল ?

হরিহর মাটির পানে চাহিয়া কহিল, চাঁদু বলছিল, ওখানে একটা বাড়ী করে ফেলার কথা, নইলে পরে ঠক্‌তে হবে—গ্রাম আর বাঁচবে না, সহরে বাড়ী থাকলে—

গোপালের আর ধৈর্য্য ছিল না, তিনি কহিলেন, তা করো বাবা, যা সুবিধে হয়। আমরা গ্রামে থাকি, গ্রামের কথাই ভাবি, শহর বাজার সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানি না। তুমি ভেবো না—তোমার সমস্ত ধান ও হিসাব আমি ঠিক রাখবো—

হরিহর জবাব দিল না। হরিহরের স্ত্রী গোপালের পায়ের কাছে প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলে গোপাল কহিলেন, সাবধানে থেকো মা, হরির সেবা-যত্ন করো—ঘরের দিকে চাহিয়া কহিলেন, লাড়ুর হাঁড়িটা গাড়ীতে দিয়েছ ত ?

দরজার পাশে স্ত্রী দাঁড়াইয়া ছিলেন, তিনি কহিলেন, এই ত সে হাঁড়িটা, এটা তুমি না হয় হরি তুলে নিক্‌। ও ছোঁবে কি করে ?

—হ্যাঁ হ্যাঁ তাই ত বটে! গোপাল হাঁড়িটা গাড়ীতে তুলিয়া দিতে যাইতেছিলেন—হরির স্ত্রী কহিল, গাড়ীতে ত অনেক জিনিষ হ'য়ে গেছে, ওটা থাক্, ওরা লাড়ু টাড়ু খায়ও না—

—তা হোক্, পথে একটু খাবে—দাদুরা ত ছেলেমানুষ, খিদে পাবেই—

হরি কহিল, শুধু শুধু নষ্ট হবে ত—

—হোক্—খাক্ আর নাই খাক্, যাবার সময় একটু কিছু দেওয়াই ত আমাদের আনন্দ, হরি। দাদার মৃত্যুর পরে কত কষ্টে তোকে মানুষ করেছিলাম কিন্তু দু'দিন তোদের নিয়ে থাকতে পারি না।

হরি প্রণাম করিল। গোপাল বৌমার দিকে তাকাইয়া বলিলেন, বৌমা, যে ক'দিন আমি আছি, ওদের নিয়ে এসো—একটু দেখবো—

বৌমা কহিলেন, আস্‌তে ত চায় কিন্তু আসা যে কষ্ট—অর্থাৎ হরি আসিতে চায় কিন্তু পথশ্রমের জন্য আসা চলে না।

গোপাল জবাব দিলেন না। হরিহর গাড়ীতে উঠিলেন—গোপাল উচ্চকণ্ঠে ধেনুর্বৎস প্রযুজা···পাঠ করিলেন। গাড়ী ধীরে ধীরে বাঁকের পরে অদৃশ্য হইয়া গেল—হরি ও বৌমা কেহই ফিরিয়া চাহিল না, দরজায় দাঁড়াইয়া গোপাল ও তাহার স্ত্রী সাশ্রুনেত্রে এই বিদায় দৃশ্য দেখিলেন—গোপাল একটা গাঢ় দীর্ঘশ্বাস মুক্ত করিয়া ফিরিয়া চাহিলেন—তাঁহার নির্ব্বাক স্ত্রীর গণ্ড বাহিয়া অশ্রু ঝরিয়া পড়িতেছে। গোপাল কহিলেন, যাও—আর দাঁড়িয়ে থেকে কি হবে!

গোপালের মনে হইল—হরিহর আজ তাহার হৃদয় নিঃশেষে নিষ্পিষ্ট করিয়া চলিয়া গেল। একটা অপ্রকাশ্য বেদনায় তিনি মৌনভাবে বারান্দায় আসিয়া বসিলেন।

হুঁকাটা সাজিয়া লইয়া তিনি ভাবিতেছিলেন—অনেক কথা—হরি যখন ছোট ছিল—তাহার বিবাহ দিলেন তখন তাহার স্ত্রী গলার হার খুলিয়া দিয়াছেন, সে হার তাহার বৌঠাকরুণ দিয়াছিলেন। এমনি কত কি—

গোপালের স্ত্রী অশ্রু মার্জ্জনা করিয়া কলসী লইয়া ঘাটে রওনা দিলেন। গোপাল দেখিলেন তাহার মুখ বিষণ্ণ—বিদায় বেদনায় যেন কালির প্রলেপ পড়িয়াছে। এই নিদারুণ কষ্টের মধ্যেও ওই স্ত্রীলোকটি একান্তে বসিয়া লাড়ুগুলি তৈয়ারী করিয়াছে কিন্তু উহারা লইতে চাহে নাই—

এমনি অকুণ্ঠ স্নেহের দান তাহারা ফিরাইয়া দিতেছে। কি দিতেছে তাহাই শুধু দেখিল। কিন্তু কে দিল, কত স্নেহে, কত আগ্রহে, কত কষ্ট করিয়া দিল তাহা একবারও দেখিল না। এত কষ্ট করিয়া, এত সহ্য করিয়া তিনি কি হরিকে এই শিক্ষা পাইতে সদরে পাঠাইয়াছিলেন।

গোপাল মনে মনে উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিলেন, তাই তাড়াতাড়ি একবার গ্রাম প্রদক্ষিণ করিতে বাহির হইলেন।

*

চাঁদমোহন সরকার তিনুকে লইয়া খাজনা আদায় করিতেছিলেন। প্রজারা কেহ বাহিরে কেহ ভিতরে বসিয়াছিল। এক একজন ডাক হইতেছিল এবং তাহারা সাধ্যমত খাজনা দাখিল করিয়া চেক লইয়া যাইতেছিল। নিষ্প্রয়োজন বোধে শশধর আসেন নাই এবং পাছে তিনি কোন দয়াদাক্ষিণ্য করিয়া বসেন এই ভয়ে চাঁদমোহন তাহাকে দূরেই থাকিতে উপদেশ দিয়াছেন।

বলাইএর ভগ্নিপতি অর্থাৎ সরোজের সাঙ্গার স্বামী আসিয়াছিল। সেও ভিনগ্রামের প্রজা—সে পাঁচ বিঘা জমি রাখে, খাজনা সোয়া ছয় টাকা। মুহুরী-আনা সেস্ প্রভৃতি লইয়া প্রায় সাত টাকা। মথুরের ডাক পড়িল—

মথুর সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া অপরাধীর মত দাঁড়াইয়া রহিল। তিনু কহিল, খাজনা কি এনেছ দাও—

মথুর একটু নিরীহ সৎপ্রকৃতির ভীরু লোক। সে কহিল, হুজুর—

চাঁদমোহন গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন—খাজনা টাজনা কিছু এনেছ না রং দেখ্‌তে এসেছ ?

—দিতে লারছি হুজুর। ঘরে ত পেটভাত নেই—এক বেলা খাওয়া করছি হুজুর—

—সকলে পারছে তুমি পারছ না। ও সব শয়তানী আমি বুঝি—

—হুজুর মা বাপ্, কি করবেক হুজুর।

—কিস্তিতে কিস্তিতে নালিশ হবে। আর আমাদের কতটুকু জমি চাষ কর?

তিনু কহিল, পাঁচ বিঘে—

—এবার ছাড়িয়ে দেব—সব সিধে করে দেব—

মথুর কাতর কণ্ঠে কহিল, হুজুর—

—যা—যা—হুজুর হুজুর ক'রতে হবে না—

মথুর ম্লানমুখে ফিরিয়া আসিল। শিবুর ডাক পড়িল—শিবু দুই টাকা দিয়া কহিল, ধানচাল বেচা করলেক হুজুর, মুখের ভাত হুজুর বেচা করে দু'টাকা দিচ্ছেন হুজুর—

—তহুরী দু'আনা। তিনু বলিল।

—দেবেক হুজুর, দুদিন বাদে—

চাঁদমোহন কহিলেন, আচ্ছা ওটা জমা করে দাও—তহুরী দিয়ে যাবি—

—আজ্ঞে হুজুর—

নিতাইও দুই টাকা দিয়া নিষ্কৃতি পাইল। তাহার পর ডাক পড়িল বলাইএর—বলাই উঠিয়া আসিয়া দাঁড়াইল, মনে মনে একটা বিদ্রোহ তাহার মাঝে ধূমায়িত হইয়া উঠিয়াছিল। সে চুপ করিয়া রহিল। চাঁদমোহন কহিলেন, খাজনা এনেছিস্?

—আজ্ঞে হুজুর দিতে লারবেক। কোথায় পাবেক, ঘরের ধান ত ভাদর মাসে ফুরালেক। মনিষ খাটাবেক কে এখন—

চাঁদমোহন কহিলেন, হু—তোমার আর কিছু জুটলো না—বেটা ধাড়ি বদমায়েস—

বলাই কহিল, কোথা পাবেক কর্ত্তা—চুরি ডাকাতি করতে মু লারবেক—

—ও এরা বুঝি সব চুরি ডাকাতি করে টাকা আন্‌ছে—আর তুমি সতী লক্ষ্মী—ওর সব জমি ছাড়িয়ে দেবে তিন্থ—ভিটে থেকে উচ্ছেদ করে দেব—

বলাই কোন কথা কহিল না। দূরের পানে চাহিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। চাঁদমোহন এই অবাধ্য প্রজার বিনয়ের অভাব লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, দূর হ যেটা, জুতিয়ে তাড়িয়ে দেব—বদমাইস্—

বলাই কহিল, যাবেক ত বটেই হুজুর—বলাই চলিয়া আসিল।

সে জানিত, যাইতে তাহাকে হইবেই—শুধু এই কাছারী হইতে নয় এ গ্রাম হইতেও। বলাই কাছারী হইতে বাহির হইয়া আপন মনে বাড়ীর দিকে চলিল—গ্রামের সর্ব্বাঙ্গে একটা মমতার চাহনি বুলাইয়া একবার হয়ত ভাবিল, এর গাছ-পালা পথ-ঘাট তাহার কত আপনার, কিন্তু তথাপি তাহা ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে হইবে।

পথে গোপাল ঠাকুরের সঙ্গে দেখা। বলাই প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া কাঁদিয়া ফেলিল—ঠাকুর মশায় মোরা চলে যাবেক—

—কোথায় যাবি ?

—ছোটবাবু সব জমি ছাড় করাবেক, কেমনে গাঁয়ে থাক্‌বেক বাবাঠাকুর—

গোপালের মনটা ভাল ছিল না। চাঁদমোহনের খাজনা আদায়ের ব্যাপার সবই জানিতেন। এই কয়েকটি কথায় সবই তিনি বুঝিয়াছিলেন। তিনি একটু বিচলিতভাবেই বলাইয়ের মুখের দিকে চাহিলেন।

বলাইএর অশ্রুপূর্ণ চোখ দুইটির দিকে চাহিয়া তাহার বেদনা কোথায় তাহা তিনি বুঝিয়াছিলেন। কহিলেন, তাই কি হয় রে বলাই, প্রজা না থাকলে জমিদারের জমিদারী কি ? আজ কাল অমনিই হয়েছে, তাই বলে গাঁ ছেড়ে কোথায় যাবি ? চৈত্র মাসে খাজনা দিস, তা হলেই সব মিটে যাবে—

কথা কয়েকটির মাঝে বলাই অনেকটা সান্ত্বনা পাইয়া যেন আপনার দুঃখকে অনেকখানি ভুলিয়া গেল। গোপালের পায়ের কাছে মাথা নত করিয়া পুনরায় প্রণাম করিল। গোপাল কহিল, বেঁচে থাকো, সুখে থাকো—

বলাই অনেকটা আশ্বস্ত হইয়া চলিয়া গেল কিন্তু গোপাল হাসিলেন— তাঁহার এ আশীর্ব্বাদ একেবারেই মিথ্যা। কেহ বাঁচিয়াও আর থাকিবে না। কেহ আর সুখেও থাকিবে না। গ্রামের সে শান্ত নীরব শুচি পরিবেশ চিরদিনের মত চলিয়া গিয়াছে।

*

বলাই ঘরে যাইয়া বিষণ্ণ মনে বসিয়াছিল। যদি চৈত্র মাসে বর্গা জমি সব বাহির হইয়া যায়, তবে থাকিবে মাত্র দুই বিঘা জমি, তাহাতে ভরণ-পোষণ চলিতে পারে না। বলাইএর স্ত্রী সুমী প্রশ্ন করিল, কি হলেক রে?

বলাই কহিল, তু বুঝবি না, ছোটবাবু সব জমি ছাড় করাবেক।

—কেনে—

—খাজনা দিতে লারলেক।

সুমী কথাটার অনেকখানি বুঝিয়াছিল। সে কহিল, জমি সব লিয়ে লিলে খাবেক কি? বললি না—

—এ ত কর্ত্তা নয় রে সুমী, এ ছোটবাবু—কোন কথা শুনবেক নাই, তার কথাই শুনতে হবেক—সে কাল আর নাই রে সুমী—

—কি করবি?

—পেটভাত না জুটে ত খাদকে যাবেক, কয়লা কাট্‌বেক—

সুমী কহিল, গরু কি করবি?

—বেচা করবেক—যা তু কাজ কর—

বলাই বিরক্ত হইয়াছিল, সে আর কোন কথার জবাব দিল না। স্ত্রী অসন্তুষ্ট হইয়া চলিয়া গেল—সম্ভবতঃ গৃহকর্ম্মে—

বলাই ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করিয়া ক্রমেই উত্তেজিত হইতেছিল—যাহা হইতেছে এবং যাহা হইতে যাইতেছে সবই যে অন্যায় ও অত্যাচার—এ বিষয়ে তাহার কোন সংশয় ছিল না, মনে মনে চাঁদমোহনের প্রতি একটা ক্রোধ ও অভিমানে সে উত্তেজিত হইয়া উঠিতেছিল—

নিতাই আসিয়া কহিল, বলাই, দে তামাক খাবেক—

বলাই ইঙ্গিতে হুঁকা কলিকা ও তামাকের সরঞ্জাম দেখাইয়া দিল। নিতাই তামাক সাজিয়া আনিয়া কহিল, তোর খাজনা ত আড়াই টাকা—হ্যাঁরে বলাই—

—হ্যাঁ বটে—

নিতাই কহিল, চল্ আজ মাছ ধরা করি, কাল পাঁচ সিকে খাজনা দেওয়া করবেক। ছোটবাবু জমি ছাড়া করাবেক নাই। ওর মাছে ওর খাজনা দেওয়া কর কেনে—যেমন কাজ তেমনি ফল পাবেক—মোরা ত তাই করলেক—আরও একটা মাছ সেদিন ভাজা করে খাওয়া করলেক—

বলাই কিছু কহিল না। চুপ করিয়া রহিল—সে জানিত বসন্ত-সায়রের মাছ বিক্রয় করিয়াই নিতাই ও শিবু খাজনা পরিশোধ করিয়াছে। কিন্তু একটা অন্যায় দ্বারা আর একটা অন্যায়ের প্রতিকার হয় না বরং অন্যায়ের মাত্রা বাড়িয়া চলে, এই কথাই বোধ হয় বলাই তাহার মত করিয়া ভাবিতেছিল। নিতাই হুঁকা দিয়া কহিল, বলাই কি হবেক রে?

বলাই হুঁকা টানিতে টানিতে কহিল, ভগবান যা কপালে লিখ্‌লেক তাই হবেক।

—তু চল, মাছ ধরবেক—

—না, মু চুরি ক'রবো নাই। জমি ছাড়া ক'রলে খাদকে যাবেক—চুরি করবো কেনে? মোর বাবা বল্‌লে, কর্ত্তা যখন গঙ্গা যাত্রা করলেক, মা ঘরে কেঁদে আঁচল ভেজা করালেক। মোদের বাড়ী পুড়লেক তাই বসন্তসায়র বানা করালেক—তার মাছ চুরি মু করবেক না—

—তবে জমি ছাড়বেক—

—মু ত ছাড়বেক নাই, ছোটবাবু ছাড়া করাবেক ত ছাড়বেক—

—মথুর কি করবেক?

—কে জানছে—সব খাদকে যাবেক। তোরা বিশ বিঘা চাষ করবি—তোদের ক্ষেত কে আটকাবেক—

নিতাই এ সব যুক্তির কিছু বুঝিল না। একরাত্রি একটু পরিশ্রম করলেই ত খাজনা পরিশোধ হয় তবে কেন এত কষ্ট করা। নিতাই কহিল, কি বুঝছিস্ তু?

বলাই জবাব দিল না, নিতাই চলিয়া গেল। বলাই হুঁকা টানিয়া যাইতে লাগিল। স্ত্রী আসিয়া কহিল, ঝুড়ি ত নাই রে—

বলাই একটী দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া দা লইয়া বাঁশঝাড়ের দিকে রওনা দিল। কঞ্চি কাটিয়া আনিয়া দুইটা ঝুড়ি তৈয়ার করিতে হইবে।

*

গোপালের ইচ্ছা ছিল না তবুও অভ্যাসবশতঃ চাটুয্যেদের কাছারীতে উপস্থিত হইলেন। তখন বেলা এক প্রহর হইয়াছে—বাহিরে শারদীয় স্নিগ্ধরৌদ্রকরোজ্জ্বল পৃথিবী—গোপাল ভিতরে প্রবেশ করিলেন।

প্রজারা সকলে চলিয়া গিয়াছে, তিনু আদায়ী টাকার হিসাব করিতেছিল, চাঁদমোহন বসিয়াছিলেন, শশধর একপাশে বসিয়া তামাক খাইতেছিলেন।

গোপাল প্রবেশ করিতেই, শশধর উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন, বসুন, ঠাকুর মশায় বসুন—হঠাৎ এমনি সময় ?

শশধর বসিবার জন্য একটা স্থান পরিষ্কার করিয়া দিলেন। গোপাল বলিলেন, হরি আজ বাড়ী থেকে চলে গেল। বাড়ী একেবারে ফাঁকা হ'য়ে গেছে, তাই একটু বেরিয়ে পড়লাম—

শশধর কালিকে তামাক সাজিতে ইঙ্গিত করিয়া কহিলেন, ও এই। কিন্তু ঠাকুর মশায়, হরি চাকুরী করে সে ত যাবেই, আবার আস্‌বে—তাতে দুঃখ করবেন না—

গোপাল হাসিয়া কহিলেন, দুঃখটা সমস্ত যুক্তিতর্কের বাইরে শশধর। কান্না পায় বলেই মানুষ কাঁদে, কেঁদে কিছু হবে বলে কাঁদে না।

চাঁদমোহন এতক্ষণ মুখ তুলিয়া চাহেন নাই। তিনু কহিল, দুই শত, পঁচাত্তর সাত আনা—

চাঁদমোহন স্মিত হাস্যে মুখ তুলিয়া কহিলেন, বেশ বেশ—দাও—চাঁদমোহন টাকার থলেটা হাতে করিয়া প্রসন্ন মুখে একবার চাহিলেন। শশধরের উদ্দেশ্যে কহিলেন, কি দাদা, টাকা আদায় হয় না ? দেখলে ত, ক'রতে পারলেই টাকা আদায় হয়—

শশধর কহিলেন, তা জানি চাঁদু, কিন্তু প্রজাদের উপর এতে পীড়ন হ'ল খুবই—লাভ কিছুই হ'ল না। এ টাকা ত চৈত্র মাসে এমনিই পেতে পারতে—

চাঁদু কহিলেন, বাড়ীটা যে আরম্ভ ক'রে দিয়েছি, তখন কি আসা চলে ?

গোপাল কহিলেন, বাড়ীটা বৈশাখে ক'রলে কি অসুবিধে হত ?

—সে কথা আপনাকে কি ক'রে বোঝাবো ? কলকাতায় যদি থাকতেন, জগতটা দেখতেন তবে বুঝতেন। চাঁদমোহন গোপালের কথা শুনিলেই যেন অপ্রসন্ন হইয়া উঠেন, তাহাদের জমিদারীর

কথায় এই অশিক্ষিত ব্রাহ্মণটি মুরুব্বিআনা করিয়া উপদেশ দেয় এটা তাহার অসহ্য।

গোপাল কহিলেন, বুঝিয়ে বললেও কি বুঝতে পারবো না—

—হয়ত পারবেন, কিন্তু তার প্রয়োজন কি আপনার? আমাদের সংসারের ভিতরের কথায় আপনার প্রয়োজন না থাকাই বাঞ্ছনীয়—

—কিন্তু পুরুষানুক্রমে যে থাকাটাই বাঞ্ছনীয় হ'য়ে ছিল, আজ হঠাৎ নেই এ কথাটা ত জানি না চাঁদমোহন। আমরা তোমাদের পুরোহিত, শুভাকাঙ্ক্ষী বলেই কথা বলি—প্রজাগুলি পীড়নে শোষণে অবাধ্য ও অসৎ হয়ে উঠবে এটা কি ক'রে দেখবো—

—অসৎ তারা চিরদিনই, আর অবাধ্য যদি হয় তার অষুধ আমি জানি—

গোপাল ক্ষুণ্ণ হইয়াছিলেন; তিনি কহিলেন, ভগবতী চাটুয্যের প্রতিমা ট্যাং ট্যাং করে বিসর্জ্জন কোনদিন হয়নি। স্বেচ্ছায় হাজার লোক হ'য়েছে, আর আজ পয়সা দিয়ে লোক আনতে হয়—

চাঁদমোহন হাসিয়া কহিলেন, ওদের খাওয়াতে খরচ হত তিনশ' টাকা, আর লোক আন্‌তে খরচ হ'য়েছে তিন টাকা। লাভ দুই শত সাতানব্বুই টাকা—বুঝেছেন—

—তাহ'লে ত পূজা উঠিয়ে দিলেই সবচেয়ে ভাল হয়—

—আমার আপত্তি নেই, যদি দাদা আপত্তি না করে। চাঁদমোহন জয়োল্লাসে হাসিয়া উঠিলেন এবং একটা বিজ্ঞজনোচিত হাসিতে সকলকে পরাভূত করিয়া দিয়া, টাকার থলি হস্তে প্রস্থান করিলেন।

গোপাল চুপ করিয়া হুঁকা টানিতেছিলেন—মুখখানা তাহার বিরক্তি ও অপ্রসন্নতায় মলিন। শশধর কহিলেন, আমাদের চিন্তাধারার সঙ্গে ওদের নতুন বিদ্যা যে কি তা বুঝতে পারি না—

গোপাল দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, যে শিক্ষা মানুষকে এমন স্বার্থপর ও আত্মকেন্দ্রিক করে তোলে, তার প্রশংসা করতে পারি না শশধর, ছেলেদের এ শিক্ষার আর প্রয়োজন নেই। অন্যের কথা যদি ভাবতে না শেখায় তবে সে শিক্ষা নয় শশধর, সে পাশবিক প্রবৃত্তির সেবা—

শশধর কহিলেন, কিন্তু এত শক্তি কেমন ক'রে হ'ল তাহ'লে—

—পশুর শক্তি ত বৃহৎ। অসুরই শক্তির দ্বারা স্বর্গজয় করেছে, আর দেবতারা পালিয়েছে ভয়ে, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তারা হ'য়েছে পরাজিত, মা চণ্ডী, ভগবান স্বয়ং তাদের সংহার করেছেন—আত্মঘাতী হ'য়ে মরেছে অসুর—

শশধর কি যেন ভাবিয়া কহিলেন, সবই ভগবানের ইচ্ছা! কিন্তু আশ্চর্য্য হই ভেবে চারিদিকে হাহাকারই বেড়ে যাচ্ছে—

গোপাল কহিলেন, প্রয়োজন বেড়েছে তাই হাহাকার—কত নতুন জিনিষ আজ উঠছে, উঠেছে, সবই ত চাই—

কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তার পর গোপাল বাড়ীর দিকে ফিরিলেন, কিন্তু হরির বিদায়, চাঁদুর উপেক্ষা, সব একসঙ্গে মিলিয়া তাহাকে উত্তেজিত করিয়া তুলিল। মনটার মাঝে একটা অস্বস্তি ও অজ্ঞাত বেদনা যেন বিষের মত ধীরে ধীরে সর্ব্বাঙ্গে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িতেছে। গোপাল যখন বাড়ীতে আসিয়া পৌছিলেন তখন বেদনা ও অস্বস্তির দহনে অন্তর উষ্ণ হইয়া উঠিয়াছে। তিনি আনমনে তামাক সাজিতে সাজিতে ভাবিতেছিলেন—এই জড়শিক্ষার কি প্রয়োজন ছিল—যে শিক্ষা কেবলমাত্র বিদ্যা দিল কিন্তু জ্ঞান দিল না। কেবল আত্ম-সুখ-স্বার্থকে চিনাইল —কিন্তু মানুষকে, সমাজকে ভালবাসিতে শিখাইল না, কেবল নিতে শিখিল, কিন্তু দিতে শিখিল না; ভোগ করিতে শিখাইল, ত্যাগ করিতে শিখাইল না।

আপনার ভাইকে বঞ্চিত করিতে শিখাইল, ভালবাসিয়া আপনার করিতে শিখাইল না...

গোপাল আবার ভাবিতে লাগিলেন—এমন শিক্ষা ত ছিল না, পূর্ব্বে হরির বাবা যাহা শিখাইয়াছেন তাহা ত অন্যরূপ। ভগবতী যে কাজ করিয়াছেন, যেভাবে জমিদারী পরিচালনা করিয়াছেন তাহা ত এমনি নয়—তবে এমন একটা উলট পালট হইল কি করিয়া ?

পিতার বিষণ্ণ মুখশ্রী দেখিয়া গোপালের পুত্রদ্বয় নীরবে পাঠ্যপুস্তক খুলিয়া বসিয়াছিল—পিতার হুঁকার শব্দ কিছুটা মন্দীভূত হইলে তাহারা ক্ষীণকণ্ঠে পড়িতেছিল—বি, এল, এ, ব্লে—সি, এল, এ, ক্লে—

গোপাল অকস্মাৎ হুঙ্কার দিয়া উঠিলেন, তোদের ওসব ছাই-পাঁশ পড়তে হবে না, আর ইস্কুলেও যেতে হবে না। কাল থেকে আমার কাছে সংস্কৃত পড়বি—মুগ্ধবোধ।

ওই ম্লেচ্ছ বিদ্যা শিক্ষা করিয়া উহারা ত পরস্পর হানাহানি করিবে, ভাইকে সাহায্য না করিয়া তাহার অংশ উদরসাৎ করিবে। অর্থকরী না হয় নাই হইল, তবুও দারিদ্র্যের মাঝে প্রীতি ও স্নেহ লইয়া বসবাস করিতে পারিবে ত! গোপাল এমনি ভাবিতে ভাবিতে কহিলেন, যা খেলা কর গিয়ে, ওসব আর পড়তে হবে না—

পুত্রদ্বয় পড়িতে হইবে না ও ইস্কুলে যাইতে হইবে না জানিয়া হৃষ্টমনে পাঠ্যপুস্তকের কারাগার হইতে মুক্ত হইয়া মুক্ত বাতাসে বাহির হইয়া গেল। গোপাল বসিয়া তামাক সেবন করিতে করিতে কেবল উত্তেজিত মনে ভাবিয়াই যাইতে লাগিলেন—তাঁহার মনে হইতেছিল—মানুষ যেন মানবাচার ত্যাগ করিয়া পশ্বাচার গ্রহণ করিয়াছে, পরস্পরের দেহ কামড়াইয়া রক্তাক্ত হইয়া উঠিয়াছে—ইহাই ত ঘোর কলি—এখানে কেহ কাহাকেও লেহন করিয়া সান্ত্বনা দিবে না।

*
০

চাঁদমোহন খাজনাপত্র আদায় করিয়া কলিকাতার বাড়ী নির্ম্মাণ জন্য কয়েক হাজার টাকা সংগ্রহ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। গ্রামের সকলেই স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়াছে। যাহা হউক কিছুদিনের জন্য আর কেহ পীড়ন করিবে না।

চাঁদমোহনের গো-শকট যখন চণ্ডীতলা দিয়া গ্রামের বাহিরে যাইতেছিল সেই সময়ে নিতাই ও বলাই গরুগুলি চরিতে দিয়া চণ্ডী-তলায়ই বসিয়াছিল। গাড়ীখানি ধীরে ধীরে চলিয়া গেল, সঙ্গে যাইতেছে পেয়াদা কালী বাগ্দী, ট্রেনে উঠাইয়া দিয়া ফিরিয়া আসিবে। নিতাই অনেকক্ষণ চাহিয়া চাহিয়া অপস্রিয়মান গাড়ীখানি দেখিল—

শালবনের পথ ধরিয়া ধীরে ধীরে সেটা অদৃশ্য হইয়া গেল। বলাই একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, ছোটবাবু যে বড়কর্ত্তার বেটা এটা মনে লিতে লারছি—

নিতাই কহিল, কেনে রে?

—বড়কর্ত্তা থাকৃতে ভয় ডর ছিল নাই। জান্‌ছি বড়কর্ত্তা রইছেন, না খেয়ে গাঁয়ের লোক মরবেক নাই। আর বুকের পাটা এত বড় রইছেন—আর ছোটবাবুকে দেখলেই ত ডর লাগে—

—ডর কেনে লাগবেক—মানুষ ত বটেন—

—মানুষ নাই রে, মানুষ নাই—ও মোদের খাবেক।

নিতাই সান্ত্বনা দিয়া কহিল, বড়বাবু ত রইছেন—

বলাই মনে কোন সান্ত্বনাই পাইল না। তাহার মনে যেন কেমন একটা শঙ্কা হইয়াছিল, ছোটবাবুই তাহাকে গৃহহীন করিবে। চির-পরিচিত এই গ্রাম, এই গৃহ, পিতৃপুরুষের এই ভিটা ত্যাগ করিয়া

তাহাকে চলিয়া যাইতেই হইবে। অনাগত একটা দুর্দ্দিনের কল্পিত বেদনায় নিতাই ম্রিয়মাণ হইয়া বসিয়া রহিল। মনে মনে চণ্ডীতলার উদ্দেশ্যে প্রণাম জানাইয়া কহিল, মা যা করবেক তাই হবেক—

*

শরতের নির্ম্মল আকাশের নীচে ধানের মঞ্জরীগুলি ধীরে ধীরে হেমন্তের হাওয়ায় অবনতশীর্ষ হইল। হিঙ্গুলবনের ধারে শালবনের নতুন পাতা গভীর শ্যামলতায় ভরিয়া গেল—তার পর শীতের পশ্চিম বায়ুতে তাহা ধীরে ধীরে পিঙ্গল হইয়া উঠিল—মাঠের সবুজ ধান ও ঘাসগুলি পাণ্ডুর মৃত্তিকার উপরে পিঙ্গলবর্ণের আবরণের মত পড়িয়া রহিল। সকালের নিস্তেজ সূর্য্যালোক সোনালী ধানের শিষে সঞ্চিত শিশিরবিন্দুর মাঝে প্রতিবিম্বিত হইয়া বর্ণচ্ছটার সৃষ্টি করিল। গাড়ী গাড়ী ধান—সারা বৎসরের পরিশ্রম-লব্ধ ধান সকলের খামারে স্তূপীকৃত হইয়া উঠিল—দিগন্তবিস্তৃত পাণ্ডুর মাঠ পড়িয়া রহিল নিঃশব্দ নীরব। ফাল্গুনের আগুন হাওয়ায় মাঠের মৃত্তিকা ফাটিয়া চৌচির হইল—শুষ্ক ঘাসের মাঝে পাথরগুলি আত্মপ্রকাশ করিয়াছে—

চৈত্রের মাঝামাঝি একদিন ধূলিঝঞ্ঝায় আকাশ গৈরিক হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু বর্ষণ হয় নাই। বর্ষের শেষপ্রান্তে একদিন বায়ুকোণে মেঘ পুঞ্জীভূত হইয়া প্রবল বর্ষণ হইয়াছে—শুষ্ক ঘাসে আবার সবুজ আভা দিয়াছে—

গোপালপুরের একটানা ইতিহাস চলিয়াছে একই উপায়ে—বাগ্দী বাউরী পাড়ায় গাজন চলিতেছে, কিন্তু তাহাতে আতিশয্য নাই—সকলেরই অবস্থা খারাপ, তাই কোনমতে পার্ব্বণ রক্ষা হইতেছে।

চাঁদমোহন একাকী আসিয়াছিলেন, খাজনা আদায় করিয়া চলিয়া

গিয়াছেন। কলিকাতায় তাহার বাড়ীর একতলা সম্পূর্ণ হইয়া এখন দ্বিতলের গাঁথনি চলিতেছে।

বৈশাখ জ্যৈষ্ঠের খররৌদ্রে চাষীরা গাড়ীতে করিয়া জমিতে সার দিয়াছে, আষাঢ়ের প্রথম বর্ষণে বীজতলায় ধান বুনিয়াছে। ধানের আফরগুলি বড় হইয়াছে—উপযুক্ত বর্ষণের সঙ্গে সঙ্গে সেগুলি পোঁতা হইবে—

অকস্মাৎ একদিন চাঁদমোহন একাকী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার আগমন বার্ত্তা প্রচারিত হইতেই সকলে শঙ্কিত হইল—এখন যদি পুনরায় খাজনা চাহেন তবে বিপদ—চাষের সময়, তাহারই খরচ সকলের ঘরে নাই।

চাঁদমোহনের কলিকাতাস্থ বাড়ীর দ্বিতলের ছাদ দিতে হইবে, অতএব টাকার তাঁহার প্রয়োজন ছিল—সকলেই জানিত বিনা প্রয়োজনে তিনি আসেন নাই। শশধরের নিকট টাকার কথা বলিতে তিনি এই আষাঢ় মাসে আদায় করিতে অনিচ্ছুক তাহা জানাইয়াছেন—চাঁদমোহন প্রস্তাব করিলেন গোলার ধান বিক্রয় করিতে হইবে, শশধর তাহাতে জানাইয়াছেন চাষ-আবাদ শেষ না হইলে ধান বিক্রয় করা সম্ভব নয়। ইহা লইয়া দুই ভাইতে মন কষাকষি চলিয়াছে, কাজেই চাঁদমোহন এখনও কোন নির্দ্দিষ্ট হুকুম জারি করেন নাই। দুই ভাইএর মাঝে মাঝে একটু কথাবার্ত্তা হইতেছে, সেটাকে বচসাও বলা যাইতে পারে।

*

আষাঢ় যাইয়া শ্রাবণে পড়িল কিন্তু আকাশে মেঘ নেই, একবিন্দু জলের সম্ভাবনা নাই। আফরগুলি শুকাইয়া যাইতেছে আর সপ্তাহ খানেকের মধ্যে বৃষ্টি না হইলে এবারের মত চাষ একেবারেই নষ্ট হইয়া

যাইবে। বাগ্দী বাউরী পাড়ায়, নিতাই শিবদাস সকলে মিলিয়া নানারূপ যুক্তি করিয়াছে কিন্তু জলের উপায় কি? বৃদ্ধ শশী বাউরী একদিন কহিল, ঠাকুরমশায়ের কাছে যা, ভগবানকে ডাক, তবেই বৃষ্টি হবে, নইলে সব মাটি—

নবীন বহু পুরাতন দিনের একটা গল্প করিল—মতি ঠাকুর কেমন করিয়া চণ্ডীপাঠ করিয়া বৃষ্টি নামাইয়াছিলেন। অবশেষে কহিল, গোপাল ঠাকুর ত তারই বংশের, তিনি চেষ্টা করিলে হয়ত বা বৃষ্টি হইতে পারে—

গল্পটা কেহ বিশ্বাস করিল, কেহ করিল না—কেহ কহিল, ব্রাহ্মণের সেই তেজ কি আর আছে। তথাপি যখন গত্যন্তর নাই তখন সকলে গোপাল ঠাকুরের নিকট যাওয়াই স্থির করিল—

সন্ধ্যার পরে শুক্লা সপ্তমীর চাঁদ উঠিয়াছে। চণ্ডীতলার অদূরে জ্যোৎস্নালোকিত অস্পষ্ট মাঠের মৃত্তিকা দেখা যায়। ওই পাড়ার মাতব্বর কয়েকজন গোপাল ঠাকুরের নিকট উপস্থিত হইল। গোপালের পুত্রদ্বয় ইংরাজি পড়া ছাড়িয়া সংস্কৃত পড়িতেছিল—গোপাল তাহাদিগকে মুগ্ধবোধ পড়াইতেছিলেন। সকলকে দেখিয়া তিনি কহিলেন, এস এস বাবাসকল, বস—তা হঠাৎ এত রাত্রে কি মনে করে?

শিবদাস নিতাই বলাই কালী নবীন সকলে একটা খেজুরের পাটিতে বসিয়া কহিল, শাওন ত এল ঠাকুরমশাই, জল নেই—মাঠের জমি ত খাঁ খাঁ করতে লাগলেক। আপনি বৃষ্টি নামা করান ঠাকুরমশাই। শশীদা বললেক—মতি ঠাকুর আর আপুনি বৃষ্টি নামা করালেক—উই সেই কোন সালে।

গোপাল ধীরে ধীরে কহিলেন, সেদিন ত আর নেই, তখন ভগবানকে লোকে ভক্তি করতো, তাদের কথায় তিনি কান দিতেন। এখন দায়ে পড়ে ডাক্‌লে কি তিনি শুনবেন? দেশে

ধর্ম্ম নাই, চুরি, ডাকাতি, ফাঁকি, মিথ্যা, অধর্ম্মের আবাস হয়েছি আমরা। আমাদের কথা তিনি শুন্‌বেন কেন ?

নিতাই কহিল, তবে ভগবান কি মোদের সব মারবেক ? ছিষ্টি লয় হবেক ?

শিবদাস কহিল, কি করা লাগবেক ঠাকুরমশাই ?

গোপাল কহিলেন, তোমরা নগর কীর্ত্তন কর, তারপর দেখা যাক্ কি হয়। অন্ততঃ সাতদিন ত তাঁকে প্রাণ দিয়ে ডাকো—

নবীন কহিল, এটা কথা বটেক—হাঁ আজ থেকেই নাম-কীর্ত্তন লাগা করাবেক চল্—সব—চল্—

সেই দিন হইতে নাম-সংকীর্ত্তন চলিল। সন্ধ্যা হইতে রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত গ্রামের পথে পথে বাগ্দী বাউরী ডোমেরা কীর্ত্তন করিতে লাগিল—

*

কিন্তু বৃষ্টি হইল না—বীজতলায় আফরগুলি প্রায় শুকাইয়া লাল হইয়া উঠিয়াছে। সেদিন মাঠ ঘুরিয়া আসিয়া সকলের মুখ শুকাইয়া গেল—এই আফর মরিয়া গেলে পুনরায় আফর করিয়া চাষ শেষ করিতে আশ্বিন মাস—তাহাতে কি ধান জন্মিতে পারে ?

গ্রামস্থ যুবক প্রৌঢ় সকলে নতমুখে নিজেদের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া আকুল হইয়া উঠিয়াছিল। একপাশে শশী বসিয়া তামাক টানিতেছিল—সহসা লাঠির উপর ভর দিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, চল্, ছোঁড়ারা সব চল্—মোরা ঠাকুরকে ধরা করবেক। গোপাল ঠাকুর খলিশের বাচ্চা বটে—উ পারবেক চল্—মা চণ্ডীর থানে উ মন্তর বল্‌বেক—চল্—

শশী লাঠিতে ভর দিয়া ও কোমরে হাত দিয়া কোন মতে চলিতে লাগিল, সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবেশী দুই চার জন গেল। যুবকদের অনেকেরই এই ব্যাপারে বিশ্বাস ছিল না তাহারা প্রায়ই গেল না! একজন কহিল, মোরা ত কীর্ত্তন ক'রলেক—কি হল বটে—

আর একজন কহিল, পুণ্যির শরীর বট—ভগবানকে ডাকা করলে শুনবেক কেনে? তু ত—মদ মারছিস্ হররোজ—

গোপালের উঠানে গ্রামস্থ ছোটলোকগণ সমবেত হইয়াছিল, তাহাদের মধ্য হইতে শশী লাঠিতে ভর দিয়া উঠিয়া কহিল, ঠাকুর মশাই, তু ত বামুন বটেক, তু যদি লারিস্ ত কোন বেটা পারবেক, মতি ঠাকুর আর তু ত বৃষ্টি নামা করালেক, মু দেখলেক সেই সন। তু পুঁথি ধরা কর, দেশ রক্ষা কর—

আরও অনেকেই গোপালের শরণাপন্ন হইল। গোপাল কহিলেন, ভগবানকে আমি ডাকতে পারি, তবে তাঁর ইচ্ছাই সব।

শশী কহিল, তু ডাক্ কেনে, দেখ না ভগবান কি ক'রবেক—

গোপাল কহিলেন, বেশ তাই হবে—চণ্ডীতলা পরিষ্কার কর গিয়ে। উদয়াস্ত চণ্ডীপাঠ করবো, ভগবান যদি দয়া করেন।

শশী সদলবলে আশান্বিত হইয়া ফিরিয়া আসিল।

*

পরদিন প্রত্যূষে নিতাই বলাই সুমী পুনি প্রভৃতি সকলে চণ্ডীতলা পরিষ্কার করিয়া, লেপিয়া পুঁছিয়া সুন্দর করিয়া তুলিল। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে গোপাল আসিয়া যাহা প্রয়োজন সমস্ত গোছাইয়া লইয়া সংকল্প-বাক্য পাঠ করিলেন এবং ৺শ্রীশ্রীচণ্ডীর উদ্দেশ্যে ভক্তি ভরে প্রণাম করিয়া চণ্ডীপাঠ আরম্ভ করিলেন—কিছুক্ষণ পরে শালবনের পিছনে রক্তিম

নির্মেঘ আকাশ নবোদিত সূর্য্যের আলোয় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। অদূরের শালবন, মাঠ, প্রান্তর রক্তিম আলোকে ঝলমল করিতেছে। একে একে গ্রামের দুই একজন আসিয়া চণ্ডীপাঠ শুনিতে লাগিল— বাগ্দী বাউরী পাড়ার গৃহবধূগণ বসন্তসায়র হইতে ফিরিবার পথে চণ্ডী-তলায় প্রণাম করিয়া গেল—

ধীরে রৌদ্র প্রখরতর হইল—পথের কাঁকর বালি উত্তপ্ত হইয়া উঠিল —গোপালের এক রূপ চণ্ডীপাঠ শেষ হইল—তিনি ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া চাহিয়া দেখিলেন, শশী বাউরী অদূরে বসিয়া আছে, সেও মা চণ্ডীর উদ্দেশ্যে প্রণাম করিল। আরও দুই একজন অকর্ম্মণ্য বৃদ্ধ বসিয়াছিল কিন্তু তথাকথিত ভদ্রলোক কেহ বিশেষ নাই। তিলি তামুলীপাড়ার দুই একজন আসিয়া গিয়াছে মাত্র। ছোটলোক পাড়ার একটি তরুণ যুবক পাচনী হাতে আসিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, শশী জেঠা, এ যে বড় রোদ ফুটে গেলেন বটে!

শশী কহিল, তা যাক্, বৃষ্টি হবেক রে হবেক—ভগমান কি বামুনের কথা শুনবেক নাই রে! তা কি হয় বটে! গোপাল পুনরায় চণ্ডীপাঠ আরম্ভ করিলেন—পিছনের ওই তরুণটির অবিশ্বাসের কথা তাঁহার কানে না গিয়াছিল এমন নয়; তথাপি তিনি পাঠ করিয়া চলিলেন— কিন্তু মনটা খারাপ, বিমনা হইয়া যাইতে লাগিল। বহুদিন পূর্ব্বে এক-দিন মতি ঠাকুরের সঙ্গে এই চণ্ডীতলায়ই তিনি চণ্ডীপাঠ করিয়াছিলেন, সেদিন চারিপাশে গ্রামের কতলোক ভক্তিভরে আকুল আগ্রহে এখানে বসিয়াছিল, তাহারা কত আগ্রহে মায়ের চরণে মাথা খুঁড়িয়াছে কিন্তু আজ এই অবিশ্বাস ও একক প্রার্থনায় কি দেবতা সন্তুষ্ট হইবেন? বার বার তাঁহার মন বিমনা হইয়া যাইতেছে এই বিচ্ছিন্ন মনোযোগহীন চণ্ডীপাঠেই বা কি হইবে! গোপাল একবার রৌদ্রকরোজ্জল দূরদিগন্তের পানে চাহিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলিলেন, তবুও একান্ত কর্ত্তব্য ও সংকল্প হিসাবে

চণ্ডীপাঠ করিয়া যাইতে লাগিলেন কিন্তু বার বার চোখ দুইটি অশ্রু-সজল হইয়া উঠিতে লাগিল। বার বার মনে মনে বলিলেন—মা আজ যদি তুমি প্রার্থনা পূর্ণ না কর, তবে তোমার মহিমা যে এই পাপময় পৃথিবীতে লোপ পাইয়া যায়? তোমার যা ইচ্ছা তাহাই কর মা, আমার কর্ত্তব্য আমি করিতেছি—

বিচ্ছিন্ন মনকে সংযত করিয়া তিনি পুনরায় চণ্ডীর আখ্যানভাগে মনঃসংযোগ করিলেন এবং ঐকান্তিকতার সঙ্গে বার বার উচ্চারণ করিলেন—দেহি দেবি নমস্তুতে।

শশধর প্রায় দেড় প্রহর বেলায় একবার ঘুরিয়া গেলেন—বিষণ্নমনে। তাহার সঙ্গে একটা বৃহৎ সিধাও আসিয়াছিল। চণ্ডীপাঠরত গোপালকে কোনরূপ প্রশ্ন না করিয়া তিনি একবার মায়ের উদ্দেশ্যে প্রণাম করিলেন, তাহার পর এক অধ্যায় পাঠ শুনিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেলেন—

ক্রমে মধ্যাহ্ন অতিক্রান্ত হইল—আকাশে মেঘের লেশ মাত্র নাই—কয়েকখানি স্তূপমেঘ মাত্র আকাশের বুকে ঝুলিয়া আছে। চারিদিকে প্রখর রৌদ্র—ছায়া-শীতল চণ্ডীতলাকেও উত্তপ্ত করিয়া তুলিয়াছে—

গোপালের কণ্ঠস্বর ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে, একাকী চণ্ডীপাঠ করিতে করিতে তৃষ্ণার্ত্ত শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছেন—

ক্রমে অপরাহ্ণ—তাহার পর বেলা পড়িতে লাগিল।

গোপাল একান্ত নৈরাশ্য ও বেদনার সঙ্গে চণ্ডীপাঠ করিয়া যাইতে লাগিলেন—কিন্তু কেন যেন চোখ দুইটি বার বার অশ্রুসজল হইয়া উঠিতেছিল—তিনি কি পারিবেন? মতি ঠাকুরের যে সাধনা ছিল তাহার ত তা নাই—মনটা কিছুতেই সংযত হয় না—

শশী বাউরী অকস্মাৎ লাঠিতে ভর দিয়া উবু হইয়া প্রণাম করিতে

করিতে তারস্বরে কহিল, মা চণ্ডী, মোদের কথা শুন্‌বেক রে—মা শুন্‌বেক—মা মা—

উপস্থিত সকলে আশ্চর্য্য হইয়া তাড়াতাড়ি সকলের চারিপাশে তাকাইতে লাগিল কিন্তু কোথায়ও মেঘ নাই। শশী উঠিয়া কহিল, ঈশ্‌নে মেঘ উঠ্‌লেক রে, ভেসে যাবেক সব ভেসে যাবেক—ছাতা আনা করা কেনে, মোদের ঠাকুর ভিজে যাবেক—

কয়েকজন শশীর প্রলাপ বচনে হাসিয়া উঠিল। একজন কহিল, ঈশ্‌নে মেঘ আসবেক, ত ছাতা আনা করাবেক—

কিছুক্ষণ বাদেই অকস্মাৎ দেখা গেল ঈশানের ক্ষুদ্র এক খণ্ড মেঘ বায়ুচালিত হইয়া আকাশের অর্দ্ধেক ছাইয়া ফেলিয়াছে। দেখিতে দেখিতে ঘন কালো মেঘ ছিঁড়িয়া খুঁড়িয়া পাণ্ডুর হইয়া গেল—প্রবল বায়ু রাস্তার ধূলি উড়াইয়া দিগমণ্ডল আচ্ছন্ন করিয়া দিল—তাহার পর আসিল বর্ষণ—প্রবল, ক্রমে প্রবলতর—

উপস্থিত জনগণ শশীর কথায় মা চণ্ডীর জয়ধ্বনি করিল। কে একজন ছাতা আনিয়া দিলে গোপাল কোনমতে পুঁথি রক্ষা করিয়া তাহার সংকল্পিত পাঠ করিয়া যাইতে লাগিলেন। অবিশ্বাসীর দল বার বার জয়ধ্বনি করিতে লাগিল—

*

সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে বর্ষণ থামিল—মাঠঘাট প্লাবিত হইয়া জল কান্দোড়ে নামিতেছে। আর চাষ আবাদের ভয় নাই—কয়েকদিনে বহু জমি পোঁতা হইয়া যাইবে। সাধারণে গোপালের ধন্য ধন্য করিল—ব্রাহ্মণের মুখে এখনও আগুন জ্বলে এ কথাটা যেন পুনরায় প্রমাণিত হইয়া গেল।

পশ্চিমের ছেঁড়া কালো মেঘের ফাঁকে অস্তায়মান সূর্য্যের রক্তরশ্মি চণ্ডীতলার ভিজা ঘাসের উপর পড়িয়া ঝলমল করিতে লাগিল—গ্রামের অনেকেই সিধাহস্তে চণ্ডীতলায় আসিয়া মাতা চণ্ডীকে প্রণাম করিয়া গেল—

সন্ধ্যার পূর্ব্বে চাঁদমোহন চটি পায়ে, ছড়ি হাতে করিয়া আসিলেন—চণ্ডীতলায় লোকসমাগম লক্ষ্য করিয়া সেই দিকেই আসিলেন—তখনও গোপাল চণ্ডীপাঠ করিতেছেন।

চাঁদমোহন উপস্থিত লোকজনকে জিজ্ঞাসা করিয়া লোক-সমাগমের কারণটা জানিয়া লইলেন এবং অদূরে দাঁড়াইয়া স্মিতহাস্যে চণ্ডীপাঠ শুনিতে লাগিলেন—

তখন সূর্য্যাস্তের পরে অন্ধকার হইয়া আসিয়াছে, গোপালেরও চণ্ডীপাঠ সমাপ্ত হইয়াছে। তিনি সিধাগুলি নিবেদন করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। ভিজা কাপড়ে থাকিয়া উপবাসী গোপালের জীর্ণ শরীর শীতার্ত্ত ও ক্লান্ত হইয়া উঠিয়াছে—

চাঁদমোহন আগাইয়া আসিয়া প্রশ্ন করিলেন, ঠাকুরমশায় চণ্ডীপাঠ করলেন বুঝি—কেন?

—অনাবৃষ্টির জন্যে কৃষি হচ্ছিল না, তাই উদয়াস্ত চণ্ডীপাঠের সংকল্প করেছিলাম—

—চণ্ডীপাঠের জন্যেই বৃষ্টিটা হ'ল তা হ'লে—কি বলেন?

গোপাল ঠিক বুঝিলেন না, চাঁদমোহন কি বলিতে চায়। তাই তিনি নীরব রহিলেন। চাঁদমোহন পুনরায় কহিলেন, আপনার জন্যেই বৃষ্টিটা হ'ল তাহ'লে—

গোপাল কহিলেন, না না, আমার সাধ্য কি? মায়ের কাছে সকলে প্রার্থনা করেছে, তাই তিনি দয়া করেছেন—

চাঁদমোহন হাসিয়া কহিল, তা কিন্তু নয় ঠাকুরমশায়, বৃষ্টি আজ হ'ত

কারণ নৈসর্গিক কারণগুলি আজ অনুকূল। চণ্ডীপাঠের সঙ্গে বৃষ্টির কোন যোগাযোগ নাই। চাঁদমোহন মূঢ় ব্রাহ্মণের অজ্ঞতা দেখিয়া হাসিলেন।

গোপাল কহিলেন, হ'ত সে ত ভাল কথাই, লাভের মধ্যে ভগবানের নাম হ'ল—সেই আনন্দ—সেটাই ত ভাগ্য!

চাঁদমোহন পুনরায় কহিলেন, হ্যাঁ ভাগ্য বই কি, তাই সিধে জুটেছে মন্দ নয় দেখছি—

গোপাল অপরাধীর মত কহিলেন, আমি সিধে আন্‌তে বলিনি—লোকে স্বেচ্ছায় এনে দিয়েছে—

—হ্যাঁ, সংস্কার ওদের মজ্জাগত—ওরা ত আন্‌বেই—

গোপাল কহিলেন, থাক্ ওসব কথা, পরে হবে। বড় ক্লান্ত, আজ আসি—

গোপাল যাইবার উদ্যোগ করিলেন, কয়েকজন সিধার চাল প্রভৃতি গোছাইয়া লইয়া তাহার সঙ্গে গেল। চাঁদমোহন ছড়ি ঘুরাইতে ঘুরাইতে বাড়ীর দিকে ফিরিলেন—দেশের অশিক্ষা ও সংস্কারান্ধ সমাজ দেখিয়া সম্ভবতঃ মনে মনে করুণার হাসি হাসিলেন।

*

শশধর কাছারী বাড়ীতে বসিয়া ছিলেন, সরকার তিনু খাসজমির চাষ-আবাদের হিসাব লিখিতেছিল। পেয়াদা কালী বাগ্দী গোপাল ঠাকুরকে ডাকিয়া আনিল। গোপাল আসিতেই শশধর কহিলেন, পরশু পূর্ণিমায় সত্যনারায়ণ তা মনে আছে ত ঠাকুরমশায়? ফর্দ্দটা করে দিয়ে যান্—

উভয়ে বসিয়া সত্যনারায়ণ পূজার ফর্দ্দ করিতেছিলেন। তিনু কহিল, তা হ'লে বড়কর্ত্তা একবার মাঠটা ঘুরে আসি, কে কি করছে—

—হ্যাঁ দেখে এসো। আলগুলো ঠিক ঠিক বাঁধা হ'য়েছে কিনা নজর রেখো—এই জলে অন্ততঃ অর্দ্ধেক জমি ওঠা চাইই—

তিনু চলিয়া গেল।

সত্যনারায়ণের ফর্দ্দ সমাপ্ত হইয়াছে এমন সময় চাঁদমোহন কোথা হইতে আসিয়া হঠাৎ প্রশ্ন করিল, দাদা আমি আর কতদিন ব'সে থাক্‌বো?

শশধর কহিলেন, এখন হয় না, বরং আশ্বিনে কিছু হতে পারে।

—তাই বলে বাড়ী আরম্ভ করে বন্ধ ক'রবো? ধান না হয় বিক্রী করে দাও—খাজনা আদায় করতে দেবে না, ধান বিক্রি করতে দেবে না —তাহ'লে আমি যাই কোথা—

—এই চাষের সময় খাজনা চাওয়াই চলে না, বরং তাদের দিতে হবে —টাকা, ধান, চাল। নইলে জমি উঠ্‌বে না। আর সুষ্ঠুভাবে চাষ হ'য়ে গেলে তবে ধান বিক্রি হ'তে পারে। তা নইলে বিক্রি হবে না— তাতে গ্রামের লোক মারা যাবে।

চাঁদমোহন দৃঢ়স্বরে কহিলেন, কিন্তু টাকা আমার চাইই, বাড়ীর ছাদটা দিলেই হয়, এখন থামতে পারবো না—

—বাড়ীটা ছ'মাস পরে সম্পূর্ণ হ'লে ক্ষতি কি? তুমি চাষ-আবাদ এসব ব্যাপার বুঝ্‌তে পারো না, কাজেই বুঝ্‌বে না—

চাঁদমোহন কহিলেন, বুঝি আমি সবই। কারণ বিনা কার্য্য হয় না। আমার চেয়ে তোমার দরদ বেশী হল ছোটলোকদের প্রতি—

—তা নয়, ওরা আছে তাই জমিদারী, নইলে ধানই বল, টাকাই বল কিছুই আস্‌তো না। তাদের বাঁচাতে হবে ত? যদি চাষ ভাল না হয় তবে কি করে তারা বেঁচে থাক্‌বে বল?

চাঁদমোহন এবার শেষ অস্ত্র ছাড়িলেন—কিন্তু আমার ভাগটাও কি আমি বিক্রি করতে পারবো না?

শশধর উত্তেজিত হইয়াছিলেন—সে কেবল নিজে কি পাইতেছে—

কি দরকার তাহাই ভাবিতেছে, অন্য কাহারও দিকে এতটুকু তাকাইতে শিখে নাই। তাই শশধর দৃঢ়কণ্ঠে কহিলেন, না তোমার ভাগের ধানও এখন বিক্রয় করা হবে না। যদি ইচ্ছে কর পূজার সময় এসে ভাগ করে নিও—সমস্ত সম্পত্তি ভাগ করে নিও, তাতেও আপত্তি নেই।

—আমার ন্যায্য ভাগও আমি পাব না ?

—নিশ্চয়ই পাবে কিন্তু এখন নয়।

—আমি চাই—আমি বিক্রয় করবো—

শশধর কহিলেন, আমি দেব না। তোমার ক্ষমতা থাকে তুমি ধান বিক্রি করে নিয়ে যাও।

চাঁদমোহন কহিলেন, বেশ তাই হবে—

চাঁদমোহন উঠিয়া যাইতেছিলেন। গোপাল কহিলেন, বসো চাঁদমোহন, জিনিষটা বুঝে দেখ! ওই ধানের মধ্যে তোমাদেরই হাজার হাজার প্রজার জীবন রয়েছে, সেটা কি এমনি সময়ে ছেড়ে দেওয়া সঙ্গত। যদি আবাদ না হয় তবে সকলে কি করে বেঁচে থাকবে—বুঝে দেখ—

চাঁদমোহন ব্যঙ্গের স্বরে কহিলেন, আমি অত্যন্ত কম বুঝি এটাই বা আপনি ধারণা করছেন কেন ?

গোপাল কহিলেন, তুমি বোঝ বই কি ? তবে গ্রামে ত থাকো না, গ্রামের এই সব ব্যাপার ত ঠিক তোমার জানা নেই—তাই বলি—

চাঁদমোহন কহিলেন, থাক্ থাক্ আমি হিতোপদেশ চাই না। যাকে দিচ্ছেন তাকেই দিন—পূজোর ফর্দ্দগুলো বেশ মোটা মোটা করে ধরুন, তাতেই সুসার হবে—

গোপাল ধৈর্য্য হারাইয়াছিলেন তিনি কহিলেন, তুমি সবই বুঝে ফেলেছ--এ অহমিকা থাকাও ত ভাল কথা নয় চাঁদমোহন। তোমার এ শিক্ষা কোথা থেকে পেয়েছ জানি না—তবে এ ত মঙ্গলের লক্ষণ নয়—

চাঁদমোহন কটু কটাক্ষে গোপালের দিকে চাহিয়া কহিলেন, বিদ্যার

অহমিকা যদিও সহ্য করা যায়, অজ্ঞতার অহমিকা অসহ্য। আপনি কেন আমাদের কথায় কথা বলেন, বলুন ত?

শশধরের দিকে ফিরিয়া চাঁদমোহন কহিল, আমি আজ চলে যাচ্ছি, পূজার সময়ই আস্‌বো এবং আমার সম্পত্তি ভাগ করে দেওয়ার জন্য প্রস্তুত থেকো—

শশধর কোন জবাব দিলেন না, চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। চাঁদমোহন উঠিয়া গিয়া ডাকিলেন, কালী এখুনি গাড়ী তৈরী কর, আমি এখুনি যাবো—

*

চাঁদমোহন উষ্মাসহকারে কলিকাতা চলিয়া গেলেন—

শশধর ও গোপাল জানিতেন—আত্মকেন্দ্রিক বর্ত্তমান ভোগগত শিক্ষা তাহাদের একান্নবর্ত্তী বহুসম্বন্ধবিশিষ্ট সংসার ও সমাজকে খান্ খান্ করিয়া দিবে। চাঁদমোহন সম্পত্তির ভাগ চাহিয়াছে সহরে বসবাসের জন্যে, হরিহরও চাহিয়াছে, এমনি করিয়া সকলেই সহরে যাইবে—পড়িয়া থাকিবে যত দুর্গত অশিক্ষিত লোক এই ভগ্ন জীর্ণ পল্লীর অস্বাস্থ্য ও অজ্ঞতার মাঝে। তাই তাহারা কেবল দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়াছেন—ইহার মধ্যেই তিলি, তাঁতি ও তামুলী পাড়ায় পরিত্যক্ত বাড়ী দুই একখানি বন্য জন্তুর আবাসস্থল হইয়াছে—চারিপাশে চুরি, প্রবঞ্চনা, প্রতারণা চলিতেছে। সততা, বিশ্বাস, ধর্ম্মভয় ধীরে ধীরে লোপ পাইয়া মানুষ কেবল ধন-সম্পদের পূজা আরম্ভ করিয়াছে—গোপালের শিক্ষা উপদেশ, ভগবতীর ত্যাগ সেবা এ প্লাবনের পথরোধ করিতে পারে নাই, গোপাল ভাবিয়া ভাবিয়া বিষণ্ণ হন মাত্র এবং নিরুপায়ের মত দীর্ঘশ্বাস ফেলেন—

*

তিনু বলাইএর উপর আদেশ দিয়াছিল যে সে খাসজমি চাষ করিতে পারিবে না। চাঁদমোহন এই আদেশ দিয়াছিলেন—সকলে ভাবিয়াছিল ওটা হুমকি মাত্র, কিন্তু চৈত্রের শেষে তিনু এই আদেশ জানাইয়াছে। অবাধ্য প্রজার মধ্যে আরও অনেকের সঙ্গে বলাই ও তাহার ভগ্নিপতি মথুরও আছে। খাস জমি ছাড়িয়া দিলে নিতাই-এর জমিমাত্র দুইবিঘা—তাহা চাষ করিয়া এবং তাহার উপর নির্ভর করিয়া গ্রামে থাকা চলে না। বলাই এই সব লইয়া বহুচিন্তা করিয়াছে কিন্তু পরিশেষে ঠিক করিয়াছে, জমি চাষ করিয়া রাখিয়া খাদে যাইবে। মথুরও অনুরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছিল।

ভরত আর আহুরী মিলিয়া দ্বিপ্রহরের রৌদ্রে গাঁইতি চালাইয়া ও পাথর কুড়াইয়া যে দু'বিঘা জমি উঠাইয়াছিল, সে দু'বিঘা জমি আজও সোনার ফসল দিতেছে। শ্রাবণের প্রথম বর্ষণে দেখিতে দেখিতে জমি চাষ করিয়া বলাই ও সুমী জমি পুঁতিয়া দিয়াছে। এখন পরের ক্ষেতে কাজ করিয়া দুইচার আনা যাহা হয় তাহাতেই দিন চলে। ঘরের ধান ফুরাইয়াছে। চারিপাশে আবাদও শেষ হইয়া আসিল—কেহ মনিষ চাহে না। সংসার অচল হইয়া আসিলে বলাই গরু বিক্রয় করিল, এমনি করিয়া আশ্বিন আসিল—তখন সংসার একান্তই অচল—

আহুরী ও ভরত যেমন করিয়া একদিন গৃহ ফেলিয়া খাদে গিয়াছিল তেমনি করিয়া একদিন প্রভাতে সুমী ও বলাই গৃহ ও গ্রাম ছাড়িয়া ভাহুলিয়া কলিয়ারীতে চলিয়া গেল। পাড়ার নবীন বুড়া লাঠি হাতে করিয়া দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া ছিল অশ্রু চোখে। সে যাইবার সময় বলিল, আবার অঘাণে আসবেক একটা ব্যবস্থা বড়কর্ত্তা করবেক। ডর কি! আসবি—

বলাই হ্যাঁ বলিয়া প্রস্থান করিল—

ওদিকে মথুর ও সরোজিনীও এমনি করিয়া গৃহ ত্যাগ করিয়া জামুড়িয়া কলিয়ারীতে উপস্থিত হইল।

এখানে স্বামী-স্ত্রীতে যে হপ্তা পাওয়া যায় তাহাতে খাদ্য, বস্ত্র ও নেশাটা কোনমতে চলে—

*

ভাতুলিয়া কোলিয়ারীর ধাওড়া—জানালাহীন অর্দ্ধবৃত্তাকার ঘর, পিছনে একটু ঘুলঘুলি—গৃহ অন্ধকার। বারান্দায় রান্না করা যায়—গ্রীষ্মে বাহিরেই শোয়া চলে, শীতে কেবল ঘরে আসিতে হয়—

সকাল ছ'টায় বলাই আর সুমী খাদে নামে, এগারটায় উঠিয়া আসে—আবার বারটায় নামে, চারটায় উঠিয়া আসে। তখন দিনের আলো নিষ্প্রভ—পৃথিবীর উপরের মাঠ ঘাট বন যখন রৌদ্রে ঝলমল করে তখন তারা ভূগর্ভের নিবিড় তিমিরের মধ্যে গাঁইতি চালায়, সুমী কয়লা বহন করিয়া টব বোঝাই করে। নিবিড় তিমিরাচ্ছন্ন ছোট ছোট মিশকালো কয়লার গলির মাঝে সেফটি ল্যাম্পের আলোয় তাঁহারা কাজ করে—সন্ধ্যায় আসিয়া রাঁধিয়া খায়, সন্ধ্যার পরে ক্লান্তদেহে নিদ্রা যায়। এমনি করিয়া দিন যায় রাত্রি আসে—কলের মত নিয়মিত জীবন! ঘণ্টা ও বাঁশীর সঙ্গে জীবন বাঁধা—গ্রামের উদার স্বাধীনতা নাই। সে মুক্ত বাতাস নাই, চারিপাশের নয়নাভিরাম সবুজাভা নাই—কয়লার কালি, ধূলা, ধূম দিকমণ্ডল মলিন করিয়া রাখে—সে মালিন্য আসিয়া জমে মানুষের অন্তরে, কালিমা লেপন করে বস্ত্রে, দেহে, অন্তরে। মানুষের আদিম প্রবৃত্তিগত পশুত্ব সমাজহীন অপরিচয়ের সুযোগে এবং ধনলিপ্সার কালিমার মাঝে জাগ্রত হইয়া উঠে—ভূগর্ভে নিবিড়

অন্ধকারে ঢাকিয়া রাখে সে পশুত্ব। গ্রামের সরল সুন্দর লোকগুলিকে টানিয়া আনিয়া তিমিরাচ্ছন্ন পশুত্বের গর্ভে নামাইয়া দেয় এই যন্ত্রদানব—তাহারা ভাসিয়া যায় নিরুপায়ের মত, সে কারাগার হইতে বাহির হইবার উপায় থাকে না। মানুষের হয় মৃত্যু, পশুত্ব জাগিয়া উঠে অকস্মাৎ উত্থাম শক্তি লইয়া।

সেদিন শনিবার বলাই ও সুমী হপ্তা পাইয়াছিল—ধাওড়ায় ফিরিবার পথের অদূরে পঁচুইএর দোকান। বহু সহকর্মী তেলেভাজা ও পঁচুইএর হাঁড়ি সামনে করিয়া ইতিমধ্যেই জমিয়া গিয়াছে। সারা সপ্তাহের ক্লান্তির পর বলাইএর কাল ছুটি—সে প্রলুব্ধ হইয়াছে, একদিন একটু আনন্দ না করিলে বাঁচিবে কি করিয়া। বলাই কহিল, সুমী তু ঘরকে যা, রস খাওয়া করে মু যাবেক—

সুমী তাহার হাত ধরিয়া কহিল, তু কেনে যাবি—রস খেলে ভাল হবেক নাই—মাতাল হবে বটে! গাঁকে কেমনে যাবি?

গ্রামের প্রসঙ্গে বলাইএর অন্তর অভিমানে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। সে কহিল, গাঁয়ে যাবেক? হুঁ···, কোন গাঁয়ে? ছোটবাবুর ও পচা গাঁয়ে মু যাবেক নাই—যা তু ঘরকে, রাঁধা কর—বলাই হেঁচকা টানে হাত ছাড়াইয়া লইয়া দোকানের উদ্দেশ্যে চলিয়া গেল। সুমী অনেকক্ষণ চাহিয়া রহিল, তার পর ধীরে ধীরে ফিরিয়া আসিল।

বলাই ভরপেট পঁচুই ও তেলেভাজা গিলিয়া, সুমীর জন্যে আধসেরটাক পঁচুই লইয়া যখন ফিরিল তখন রাত্রি হইয়াছে। অভিমানে বলাই ভাসিয়াছে—ভাসিয়া যাইবে—

সুমীর শাকান্ন রাঁধা হইয়া গিয়াছিল, সে একটা ছেঁড়া খেজুরের পাতার তালাই বা পাটিতে ময়লা বালিশ মাথায় দিয়া শুইয়াছিল। বলাই মত্ত, দ্রব্যগুণে অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় ধাওড়ায় আসিয়া ডাকিল, সুমী—সুমী—

স্বমী শুইয়াই কহিল, ডাক্‌ছিস্ কেনে—

—রাঁন্না হল বটে!

—হাঁ।

—তবে, লে মালটো খাওয়া কর—একসঙ্গে ভাত খাবেক—

—মাল মু খাবেক নাই—

—কেনে—তু খা। শরীরটা ত বেদনা বটে। কয়লা টানা ক'রলেক না কত? ব্যথা ম'রবেক—

স্বমী খাইতে ইচ্ছুক ছিল না কিন্তু সারা সপ্তাহ কয়লা টানিয়া টানিয়া শরীরটা বেদনা হইয়াছে। বলাইএর অনুরোধে অবশেষে সে পঁচুইটুকু পান করিল।

আহারান্তে উভয়ে তামাক সাজিয়া লইয়া বসিয়া গল্প করিতেছিল—মত্ত অবস্থায় বলাই বলিয়া যাইতেছিল—গাঁকে আর মোরা যাবেক নাই—হোথা কি আছে বল কেনে? পেটভাত হবেক নাই—বারো দুয়ারে মনিষখাটা করে কুকুরের মত আর বাঁচবেক নাই—হেথাই কাটাবেক—

স্বমী আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, কুটুম, আত্মীয় সব ছাড়া করবেক? হেথা তোর কোন কুটুম আছে?

বলাই হো হো করিয়া হাসিতে লাগিল—অনেকক্ষণ আপন মনে হাসিয়া কহিল, বড় কুটুম হেথা রে স্বমী, বড় কুটুম রইছেন?

—কে বটে?

—টাকা, টাকা—টাকা! এ কুটুম ছাড়া ক'রে বড় কুটুম ছোটবাবুর গাঁয়ে যাবেক কেনে? শিবু নিতাই মাছ চুরি ক'রলেক, তারই খাজনা দিলেক—তাদের খাস জমি বাড়তি দিলেক। মু চুরি করবেক নাই, ধরম খোয়াবেক নাই তাই—জমি ছাড় করালেক। লে—লে—ধরম কেনে তবে? বল স্বমী বল—ধরম কেনে তবে? ও গাঁয়ে মু যাবেক নাই—টাকাই ত ধরম বটে—বলাই পুনরায় হাসিল।

সুমীর নেশা লাগিয়াছিল, সে অতটা কিছু এখন বুঝিতে পারিল না, সেও বলাইএর দেখাদেখি হাসিল। কহিল, টাকাই ত ধরম বটে—ধরম বটে—

পঁচুইএর উন্মত্ততার মাঝে ধাওড়ার বারান্দায় শুইয়া তাহারা শনিবারের দুর্লভ রাত্রি কাটাইয়া দিল—

*

সুমীর বর্ণ নিকষ কালো, কিন্তু দেহটা তাহার ক্ষীণ ও মজবুত। এখানে যাহারা কাজ করে তাহাদের দেহের লালিত্য ও কমনীয়তা বহুদিন পূর্ব্বেই অন্তর্হিত হইয়াছে কিন্তু গ্রামের উদার মাঠ, মুক্ত বায়ু, সবুজ গাছের দেওয়া স্বাভাবিক কমনীয়তাটুকু সুমীকে তখনও লোভনীয় করিয়া রাখিয়াছে—বয়স তাহার আঠার উনিশ, সন্তান হয় নাই, ঋজু সরল ক্ষীণ চঞ্চল দেহ। চোখ দুটি টানাটানা, ক্ষীণ কটি, বিপুল নিতম্ব—এখানে কালিকাময় কয়লার খাদে তাহার দেহসৌষ্ঠব লোভনীয়—তাই অনেকেই চাহিয়া দেখে। শিফ্‌টবাবু, লোডিংবাবু সকলেই চাহিয়া দেখেন—পরিচয় করেন কিন্তু সুমী তাহার সংশয়হীন অকুণ্ঠ মনে তাহার অর্থ বুঝিতে পারে না—ভাবে, তাহারা নতুন বলিয়া তাহাদের প্রতি এটা করুণা মাত্র!

*

প্রভাতে উঠিয়া বলাই হাটে গিয়াছে সপ্তাহের দোকান আনিতে এবং তরিতরকারী কিনিতে—সঙ্গে পাড়ার সহকর্ম্মীরাও গিয়াছে। পূবের পুরাতন বটগাছের মাথার উপরে সূর্য্য উঠিয়া ঝলমল করিতেছে। সুমীর পূব-দুয়ারী ধাওড়ার বারান্দায় রৌদ্র আসিয়া পড়িয়াছে। সরু গলির

দুইদিকে ধাওড়া—সুমী সকালে উঠিয়া গৃহ-মার্জ্জনা, জল আনা প্রভৃতি সমাপ্ত করিয়া বসিয়া ভাবিতেছিল—বলাই কি সত্যই আর গ্রামে ফিরিয়া যাইবে না? এখানেই সারাজীবন কাটাইয়া দিবে—এখানে গৃহ নাই, স্বজন নাই, আপনার বলিতে কিছু নাই। এখানে কেমন করিয়া সারা-জীবন কাটান যাইবে।

সামনের ধাওড়ার কুলি হাটে গিয়াছে তাহার স্ত্রী বসিয়া বাসন মাজিতেছে, দুইটি ছেলেমেয়ে দিগম্বর হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। ওরাও কাজ করে—এখানেই রহিয়া গিয়াছে পুরুষানুক্রমে। ওই ছেলেমেয়ে দুইটিও এখানে কাজ করিবে।

সুমী হঠাৎ লক্ষ্য করিল একজন বাবু সরু গলির মধ্য দিয়া ছড়ি হাতে যাইতে যাইতে হঠাৎ থামিয়া গিয়াছেন এবং তাহাকেই লক্ষ্য করিতেছেন। চোখে চোখ পড়িতেই বাবু ডাকিলেন, এই শোন ত!

সুমী উঠিয়া গেল। তিনি প্রশ্ন করিলেন, তোর নাম কি?

—সুমী।

—তোর লোকের নাম কি?

—বলাই বটে।

—কি করিস?

—খাদকে কয়লা কাটি—

—ওঃ কুলি! কতদিন এসেছিস্?

—দু হপ্তা হল—

—বিকেলে আমার বাসায় যাবি—

সুমী বিস্মিত হইয়া কহিল, কেনে?

—কেনে কি? যাবি বলছি—যাবি। তার আবার কেনে কি?

সাম্‌নে যে মেয়েটি বাসন মাজিতেছিল সে উঠিয়া আসিয়া যুক্ত করে নমস্কার করিয়া কহিল—হুজুর এদিকে—

—এমনি বেড়াতে এসেছি—

মেয়েটি স্থমীকে কহিল, সিফ্‌টবাবু—হুজুর—উনি বলছেন তা যাবেক নাই কেনে?

স্থমী তবুও কহিল, কেনে যাবেক ?—মোর মনিষ ঘরকে আস্থক। শুনবেক নাই—

মেয়েটি বুঝাইয়া বলিল, বাবু কইছেন তা মনিবকে কি শুধাবেক! বড় ভাল মনিব—মন মত কাজ করবি, কত পাবি, রস খাবি, গয়না পরবি—টাকা পাবি—

স্থমী তখনও ইঙ্গিতটা সম্পূর্ণ বুঝিতে পারে নাই। সে বিস্মিত দৃষ্টিতে চাহিয়াছিল। বাবু স্মিতহাস্থে কহিলেন, যাবি বুঝলি—আমি বিনি পয়সায় কাউকে দিয়ে কিছু করাই না—বাসনটা মেজে দিলেও আমি পয়সা দেই—বুঝলি—আর তোদের দিয়ে খাইয়েই ত আমি ফতুর—বাবু ছড়ি ঘুরাইতে ঘুরাইতে চলিয়া গেলেন।

সাম্‌নের ধাওড়ার মেয়েটি মুচকি হাসিয়া কহিল, তোর বরাৎ খুলবেক রে স্থমী, বরাৎ খুলবেক—

স্থমী বিষণ্ণভাবে পুনরায় দাওয়ায় আসিয়া বসিল—তাহার মনে ভাসিয়া উঠিতেছে হিঙ্গুল বনের মাঠ, বসন্তসায়র, চণ্ডীতলার বিরাট বটগাছ—গাভী, গ্রামের পায়ে চলা পথ—পাড়ার লোকজন, প্রতিবেশী বন্ধু—গোপাল ঠাকুর আরও কত কি। স্বপ্নাচ্ছন্নের মত বসিয়া সে গোপালপুরের স্বপ্ন দেখিতেছে—কি মোহময় সেই ক্ষুদ্র গ্রাম—কি স্থন্দর—অথচ একান্ত নিরুপায়ের মত তাহা ত্যাগ করিয়া আসিতে হইয়াছে। এই শিশির ঝলমল ঘাস, শস্য-শ্যামল দিগন্ত বিস্তৃত মাঠ, তাহার মাঝে বুক ভরিয়া নিশ্বাস লইয়া কাজ করা যায়—সেখানে কি আর ফিরিয়া

যাওয়া চলে না—এই অপরিচিত হৃদয়হীন প্রতিবেশী ও কয়লার কালির মধ্যে কেমন করিয়া জীবন অতিবাহিত করা যায়—

স্বমী ভাবিতে ভাবিতে ব্যথিত হইয়া উঠিল—অশ্রুভারে চোখ দু'টি টলমল করিতে লাগিল।

*

বলাই হাট করিয়া ফিরিতেছিল—সপ্তাহের দোকান খরিদ জিনিষপত্র ও তরিতরকারী। একপোয়া মাংসও সে আজ কিনিয়াছে। রবিবারের হাটে মাংস পাওয়া যায়।

কলিয়ারীর প্রান্তে ঢুকিতেই দেখে একটা ক্ষুদ্র গৃহের প্রাঙ্গণে একটি মেয়ে রস খাইয়া নেশার ঘোরে কি সব বলিতেছে, আর মাঝে মাঝে গান গাহিতেছে—

মেয়েটির রং ফরসা, ক্ষীণ তন্বীদেহ, সুন্দর স্বচ্ছন্দ। বয়স কুড়ি বাইশ হয়ত হইবে কিন্তু যৌবনের ম্লানিমা দেখা যায় না। কেবল মাত্র চোখের কোণে একটা কালিমা তাহার দৈহিক অত্যাচারের কথা ঘোষণা করে। এখানে ওমনি একটি মেয়ে, ভদ্রঘরের মেয়ে কি করিয়া আসিল, কি বা করে—তাহা বলাই ভাবিয়া পাইল না। কৌতূহলবশতঃ সাথী নগরবাসীকে প্রশ্ন করিল—উ কে নগরবাসী। এই কয়দিনে নগরবাসী বাউরীর সঙ্গে তাহার একটু ভালবাসা হইয়াছে। লোকটি ভাল, বলাইকে ভাল চোখেই দেখে। সে প্রায় দশবৎসর এইখানে কাজ করে। নগরবাসী কহিল, জানিস্ না? উ সুন্দরী বাউরীর বেটি। সুন্দরীর মনিষ হেথা খাদে চাপা পড়ে মারা গেলেক—সুন্দরী দারোয়ান পাঁড়েজির কাছে রইলেক। পাঁড়েজির রং ছেলো টুকটুকে—তাই ওই বেটী হলেক সুন্দরীর। ওর নামটা বট লছমী—

বলাই প্রশ্ন করিল, খাদকে কাজ করে ?

—কাজ করবেক কেনে ? বাবুরা আস্‌বেক যাবেক টাকা দেবেক—উর অভাব কি ? রস খেয়ে দিবারাত্রি হল্লা করবেক—বড় সাহেব জনসন্ তিন বছর উকে রাখলেক—

কথা বলিতে বলিতে তাহারা লছমীর প্রাঙ্গণের নিকটবর্ত্তী হইল—প্রাঙ্গণের পাশ দিয়াই পথ। লছমী উঠিয়া আসিয়া রাস্তার ধারে দাঁড়াইল, অত্যধিক মদ্যপানে তাহার দেহ টলিতেছে। সে প্রশ্ন করিল, তু কোন বট রে ?

নগরবাসী কহিল, নগরবাসী—

—তু কোন ? তোকে কে বলছেক ?

অর্থাৎ বলাইকে সে প্রশ্ন করিয়াছে। বলাই জবাব দিল, মু বলাই বাগ্দী।

লছমী একগাল হাসিয়া কহিল, তু বাউরী নয়, বাগ্দী কুলীন বট ? নতুন বট ?

—হ্যাঁ নতুন বটে—

—খাদকে কাম করিস্—

—হাঁ বটে।

—আচ্ছা জোয়ান বট ! তু আয় বসবি, গান শুন্‌বি রস খাবি, আয় তু—আয় মোর ঘরকে—

নগরবাসী যাহা কহিল তাহার অর্থ এই যে বলাইএর সুন্দর সুডৌল তরুণ দেহ দেখিয়া লছমী মজিয়াছে। সুযোগ লইলে বলাই বিনাপয়সায় যথেষ্ট রসপান ও স্ফূর্ত্তি করিতে পারিবে।

বলাই লছমীর রূপে মুগ্ধ হইয়াছিল—এমন একটি দিব্যরমণী তাহাকে রসপান করিতে ডাকিতেছে সে কেমন করিয়া প্রত্যাখ্যান করে! সে কহিল, নগরদা তু আয়—

নগরবাসী কহিল, না মু ঘরকে যাবেক—

লছমী বলাইএর হাত ধরিয়া এককলি গান গাহিয়া শেষে কহিল, তু যা নগরবাসী ঘরকে—বলাই আয় রস খাবি—

নগরবাসী চলিয়া গেলে, লছমীর হাতে বদ্ধ অবস্থায় বলাই বিস্মিত-ভাবে তাকাইতে লাগিল। লছমী কহিল, আয় তু জোয়ান বটে, রস খাবি—

বলাই একটু ভীত ভাবে কহিল, সকালে কেনে রস খাবেক ?

—বিকালে আসবি বল ?

বলাই বিহ্বল ভাবে কহিল, আস্‌বেক—

—তবে যা—আসবি।

বলাই ছাড়া পাইয়া চলিয়া আসিল—কিন্তু লছমীর অপূর্ব্ব সুন্দর দেহ ও অকুণ্ঠ আবেদনের কাছে হৃদয়টা রাখিয়া আসিল। তাহার স্পর্শ, তাহার আহ্বান, তাহার হৃদয়কে আলোড়িত করিয়া দিল। এমন বিচিত্র ঘটনা তাহার জীবনে ঘটে নাই—

ধাওড়ায় ফিরিয়া দেখে সুমী বিষণ্ণ মুখে স্বপ্নাবিষ্টের মত বসিয়া আছে। বলাই একবার তাহার দিকে ভাল করিয়া তাকাইল—লছমীর সুন্দর সুডৌল দেহের কাছে সুমীর দেহ যেন অত্যন্ত কুৎসিত। বলাই কহিল, উঠ্‌ সুমী, রাঁধা কর—

সুমী গোপালপুরের স্বপ্ন ছাড়িয়া উনুনে আঁচ দিতে গেল—তখন বেলা ন'টা—

*

শিল্পাঞ্চল এমনি একটা স্থান যেখানে বিচিত্র লোকের সমাবেশ, বিচিত্রভাবে জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে—সমাজহীন, নৈকট্যহীন, প্রতি-বেশীহীন একটা রাজ্য, যেখানে কেহ কাহাকেও কৈফিয়ৎ তলব

করে না। মানুষের বিকিকিনি চলে শিল্পজাত দ্রব্যেরই মত। মানুষ ধনের দাসত্বে হয় কলকব্জার মত প্রাণহীন। জীবন চলে ঘড়ির কাঁটায়, টাকার দামে, টাকার নিয়ন্ত্রণে। মানুষ সেখানে গৃহহীন, চারিপাশে অপরিচিত দূরাগত লোকজন—মানুষের মনে স্বভাবতঃই পশুপ্রবৃত্তি জাগিয়া উঠে। সেখানে লোকলজ্জা, লোকভয়ের বালাই নাই, কলিয়ারী বদল করিলেই সব মিটিয়া যায়; তাই সেখানে চলে স্বেচ্ছাচার—পশুজীবনের অপরিহার্য্য পরিণতি; প্রলোভন ও অর্থের মোহকে সংযত করিবার মত কোন শৃঙ্খল নাই—যাহারা মালিক তাহারা চান—ধনের বিনিময়ে কাজ ও কাজের উপরে মুনাফা—মানুষ পশু হইলেই, কলের মত হইলেই মুনাফা। তাই শিল্প-সাধনার সঙ্গে চলে মানুষকে পশুকরণ-যজ্ঞ, দরিদ্র জনশ্রেণী সেখানে আত্মাহুতি দিয়া মুনাফা যোগায়—বাড়িয়া চলে বিলাস-ব্যসন—ষ্ট্যাণ্ডার্ড অব লিভিং।

বাধাহীন মন এখানে সহজেই উচাটন হইয়া উঠে—তাই লছমীর ডাক বলাইকে দিশাহারা করিয়া দিল। গোপালপুর হইলে লোক-লজ্জা লোকভয় সমাজশাসন হয়ত তাহাকে সংযত করিতে পারিত—কিন্তু বলাই আজ মুক্ত, তাই পশুমনের স্বেচ্ছাচার জাগিয়া উঠিয়াছে নিরঙ্কুশভাবে।

*

দ্বিপ্রহরে আহারাদির পরে বলাই ও সুমী শুইয়াছিল দুইটি পাটীতে। স্বপ্ন দেখিতেছিল গোপালপুরের, বলাই স্বপ্ন রচনা করিতেছিল লছমীকে ঘিরিয়া। মধ্যাহ্ন সূর্য্য মাথার উপরে থাকিয়া পৃথিবীতে ঢালিয়া দিতেছিল আলো—চারিপাশে নিঝুম—ধাওড়ার সামনে গলিটার মাঝে নিদ্রাহীন কুলিতনয়গুলি চেঁচামেচি করিতেছে মাত্র।

স্বমী হঠাৎ প্রশ্ন করিল, বলাই গাঁকে আর যাবেক নাই রে ?

বলাইএর স্বপ্নটা ভাঙ্গিয়া যাইতেছিল, সে সংক্ষেপে কহিল, তু ঘুম করনা, গাঁকে যেয়ে খাবেক কি ?

কথাটা সত্য, সেখানে উদরান্ন উপার্জ্জনের সম্ভাবনা নাই। তথাপি স্বমী কহিল, হেথা বারমাস কেমনে থাকৃবি বল কেনে ?

স্বমীর প্রশ্নে বলাইএর চিন্তাধারা ছিন্নভিন্ন হইতেই সে বলিল, চুপ কর কেনে ঘুম কর। তু যা গাঁকে মু যাবেক নাই হোথা—তু যা সাঙ্গা করবি, যা কেনে—

স্বমী ব্যথিত হইয়া চুপ করিল।

অপরাহ্ণে নিদ্রা হইতে উঠিয়া বলাই একটা বিড়ি পান করিতেছিল। স্বমী কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, সিফ্‌টবাবু বিকেলে যেতে ব'ললেক কেনে রে ?

বলাই জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ক্ষণিক চাহিয়া থাকিতে স্বমী কহিল, সিফ্‌টবাবু যেতে ব'ললেক বিকেলে কি ক'রবেক ?

—কেনে ?

—কে জান্‌ছে। বল্‌লেক—হোথা সড়কে দাঁড়িয়ে, কেনে তা কে জান্‌ছে—উঃ সামনের ধাওড়ার কামিন ব'ললেক কি—

—কি ব'ললেক—

—শুন্‌না উর কাছকে—

সামনের ধাওড়ার কামিনটা বসিয়া তামাক খাইতেছিল, বলাই উঠিয়া গিয়া তাহাকে কি সব প্রশ্ন করিয়া ফিরিয়া আসিল এবং রাগে রক্তআঁখি হইয়া কহিল, তু যাবেক নাই, শালা ডাকু তোকে রস খাওয়াবেক, তোকে ঘরকে রাখবেক—

—মু থাকৃবেক কেনে ?

—শালা বলছেক টাকা দেবে—শালাকে খুন করবেক—

*

সন্ধ্যার আগমনে বলাইয়ের অন্তরটা চঞ্চল হইয়া উঠিল লছমীর জন্যে। এক পায়ে দু' পায়ে সে ঐ দিকেই চলিল। ঠিক সন্ধ্যার পূর্ব্বে লছমীর ঘরের নিকটে উপস্থিত হইল। লছমী ডাকিল, বলাই, তু—আয় এদিকে। তোর তরে বসে থাকতে লারি। আয় রস খাবেক নাই—

লছমীর আগ্রহে তাহার পয়সায় প্রচুর পঁচুই পান করিয়া এবং রাত্রির প্রথম প্রহর অতিবাহিত করিয়া বলাই যখন ফিরিয়া আসিল, তখন সুমী রান্না-করা ভাত ঢাকিয়া রাখিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। বলাই নেশার ঘোরে আসিয়া কহিল, এ সুমী ভাত দে—সুমী—

সুমী উঠিয়া ভাত দিল। বলাই চোখ বুজিয়াই খাইতে লাগিল। সুমী কহিল, রস খেলি কোথাকে ?

—উই হোথা—

—পয়সা পেলি কোথা ?

—কেনে ? পয়সা মোর নাই, মদ কিন্‌তে লারি ?

সুমী কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিল তাহার পরে প্রশ্ন করিল, সিফ্‌টবাবু ত আবার আস্‌বেক বটে, মু গেলেক নাই—

বলাই বিরক্ত হইয়াছিল, সে কহিল, যা কেনে, টাকা পাবি। বাবু আশনাই করবেক তোর সাথে, যা কেনে ? শাড়ি পাবি গয়না পাবি—

সুমী আশ্চর্য্য হইল, তাহার স্বামী হইয়া বলাই এমন একটা কথা বলিয়া ফেলিল, প্রকারান্তরে সে তাহাকে অবিশ্বাস করিয়াছে! সুমী ব্যথিতভাবে কহিল, তু কি ব'লছিস্ সব!

—ঠিক বল্‌ছি, টাকা চাই মোরা—লুটে লে দু' হাতকে, লুটে লে—

সুমী বুঝিল বলাই নেশায় উন্মত্ত, তাই চুপ করিয়া রহিল।

*

তাহার পরের ঘটনা অত্যন্ত সংক্ষেপ—

লছমীর প্রেমে বলাই ভাসিয়া চলিল—হপ্তা যাহা পায় তাহার সবই লছমীর ওখানে রাখিয়া আসে, আর ঘরে আসিয়া সুমীর উপর অত্যাচার করে। সুমীও সিফ্‌টবাবুর হাত বেশীদিন এড়াইতে পারে নাই—প্রথমে বাসনমাজা ঘর-দোর ঝাড়ু দেওয়া এবং সেই সূত্রে ভালই উপার্জ্জন করিয়াছে। এখানটা এমনিস্থান যেখানে নিষ্কৃতি নাই, সংযমের সংস্কারের শৃঙ্খল এখানকার তাপে গলিয়া যায়, তাই চারিপাশের বন্যার মাঝে আপনাকে আর কেহ ধরিয়া রাখিতে পারে না—পশুত্ব আপনি প্রবলতর হইয়া উঠে। অর্থের জন্যে এখানে মানুষ সবই করিতে পারে—

সেদিন বলাই লছমীর ওখানে গিয়াছিল কিন্তু লছমী তাহাকে বিদায় দিয়াছে—তাহার ঘরে কোন এক বাবু শুভাগমন করিয়াছেন তাই—বলাইকে লইয়া রসপান করিবার সময় তাহার ছিল না। দুঃখে ক্ষোভে একটা উত্তেজনা লইয়া সে ফিরিয়া একেবারে দোকানে উপস্থিত হ'ল। যে শেষ সম্বল ছিল সব দিয়া বলাই আকণ্ঠ পঁচুই পান করিয়া ধাওড়ায় ফিরিয়া আসিল—তখন রাত্রি এক প্রহর হইবে। বলাই এত সকালে কোন দিনই ফিরে না। অন্ধকার ধাওড়ার বারান্দায় দাঁড়াইয়া সে ডাকিল, সুমী—সুমী—

সুমী নাই। কপাটে কুলুপ দেওয়া, চারিপাশে অন্ধকার, দূরে দূরে কাঁচা কয়লার স্তূপ জলিতেছে, তাহার স্বল্প আলোয় উঠানের একাংশ দেখা যায়—সে ইতস্ততঃ তাকাইয়া দেখিল। পুনরায় ডাকিল, সুমী—সুমী—

সুমী নাই—ক্ষীণ আলোয় কুলুপের কিছুটা চিকচিক করিতেছে।

বলাইএর মাথায় হঠাৎ যেন আগুন জলিয়া উঠিল—সুমী কোথায় গিয়াছে। উঠানের কোণ হইতে সাবলটা হাতে লইয়া সে অন্ধকারে বাহির হইয়া গেল—

বাবুদের কোয়াটার প্রাচীর ঘেরা, সিফ্‌টবাবুর বাসাটা একেবারে মাঠের ধারে। বলাই দরজায় ধাক্কা দিয়া দেখিল ভিতর হইতে দেওয়া। বাসার ভিতরের একটা পেয়ারা গাছের ডাল এদিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে, সে সেইটা ধরিয়া প্রাচীরের 'পরে উঠিল এবং গাছ বাহিয়া উঠানে আসিয়া নামিল। ঘরের মাঝে মিটিমিটি একটা লণ্ঠন জলিতেছে—অতি সন্তর্পণে সে ঘরের দরজার নিকটে গেল এবং ভিতরের দৃশ্য দেখিয়া হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া গেল। সুমী চীৎকার করিয়া উঠিল, মারলেক রে, মারলেক—

বলাই শাবল তুলিয়া তক্তপোষে শায়িত লোকটির দেহে এক বিরাট আঘাত করিয়া মুহূর্ত্তে বাহির হইয়া পড়িল। নেশার ঘোরে হইলেও সে জানিত সে কি করিয়াছে, তাই ধাওড়ায় না ফিরিয়া সোজা কেষ্টপুর কলিয়ারীর দিকে রওনা দিল—

পরদিন একটু হৈ চৈ হইল, সিফ্‌টবাবু কিছুদিন হাসপাতালে থাকিয়া ফিরিলেন, সুমী রহিয়া গেল ভাতুলিয়াতেই। যেমন করিয়া লছমীর মা ছিল তেমনি—দিন চলিতে লাগিল।

বলাই নতুন কলিয়ারীতে কাজে লাগিয়া গেল—তাহার নতুন নাম হইল গিরিধারী।

*

আতুরীর মেয়ে সরোজ ও মথুর গিয়াছিল জামুরিয়া কলিয়ারীতে। মথুর শান্ত প্রকৃতির মানুষ। কাজকর্ম্ম করে, শনিবারে দোকান হইতে

পঁচুই কিনিয়া ধাওড়ায় বসিয়া খায় আর ঝুমুর গান করে। লেটো গানের সুরে সুরে আপনার হাত বাজায়! নির্ব্বিরোধ লোক—এমনি করিয়াই দিন চলিয়া যায়—

সরোজের দেহেও আদুরীর দেহের মাদকতা কিছুটা ছিল, তাই এখানে আসিবার পরই তাহাকে বহু প্রলোভনের সম্মুখে আসিতে হইয়াছে। মথুর মদ খাইয়া আনন্দে গান করিতেছিল। সরোজ আসিয়া কহিল, চল্ বাড়ী চল্—হেথা থাক্‌বেক নাই। চল্—গাঁকে ঘুরে যাই—

মথুর হাসিয়া কহিল, গাঁয়ে কি খাবি?

—দু'টো পেট-ভাত জুটবেক নাই?

—না। কোন্ দেবেক, কোন্ খাটাবেক—জমি ত সব ছোটবাবু ছাড় করালেক—কোথা যাবি? বল্—

সরোজ কহিল, হেথা সব মোর সঙ্গে লাগ্‌লেক রে! ছোটবাবু ডাক্‌লেক তার ঘরকে যেতে, লোডিংবাবু বল্‌লেক—মু কি করবেক, টাকার জন্যে ধরম দেবেক?

মথুর সুর করিয়া কহিল, টাকা বিনা ধরম নেই রে? টাঁকার জন্যে সব প্রাণ দিলেক, ধরম কি করবেক? টাকার জন্যে ছোটবাবু ধরম খোয়ালেক নাই? তাঁতি 'তিলি কুলু সব ত ধরম খোয়ালেক, জাত খোয়ালেক। তোর এত কেনে? যা তু—পিথিমে ধরম আর লেইরে সরোজ—সরোজ ব্যাকুলভাবে কহিল, মু পারবেক নাই, পারবেক নাই, চল গাঁকে ঘুরে যাই। খেতে ধান রোঁয়া করবেক, কাস্তে চালাবেক, তু গাইতি চালাবি, কোদাল চালাবি—

আদুরী একদিন এমনি সংকল্প লইয়া গ্রামে ফিরিয়া গিয়াছিল তাহার কন্যা সরোজও আজ ব্যাকুল হইয়াছে—মথুর স্বভাবসুলভ হাসি সহযোগে কহিল, কার জমিতে তু রোয়া করবি, মু গাইতি চালাবেক বল? গাইতি

খাদকেই চালাতে হবেক—টাকা রোজগার কর কেনে, গাঁকে যেয়ে জমি কিন্‌বেক কোন্ জান্‌ছে বলনা—

সরোজ উর্দ্ধে হাত তুলিয়া ভগবানকে ইঙ্গিতে দেখাইয়া কহিল, উ-ত জান্‌ছে বটে—নরকে যাবেক—

মথুর অপ্রকৃতিস্থ ভাবে কহিল, বহুলোক জুটবেক নরকে, বাবুরাও বহু জুটবেক সরোজ। শুন্ বলি, বড়বাবু দেখ্‌ছিস্ তো, ঐ ত লোডিংবাবু ছিলেক, পঁচিশটাকা মাসমাহিনা ছিলেক। বড়সাহেবকে খানাপিনা দিলেক, ভেট দিলেক, উর কামিন আশনাই ক'রলেক, বড়বাবু হলেক বটি। তু কোন সতী-সাবিত্রী? ভদ্দরলোক বাবুরা টাকা কামালেক তু পারবিনা—তু ত বাগ্দীর কামিন মেয়ে, ধরনা কেনে আর একটা সাঙ্গা করলেক—

মথুর নেশার ঘোরে নিজের রসিকতায় হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল! সরোজ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল, সরোজ স্ত্রীলোক, লোভ মোহ মানুষের মতই তাহার মধ্যে ছিল, সেটা গাঁয়ের মাঝে স্নিগ্ধপরিবেশে মাথা তুলিতে পারে নাই, এখানে এই স্বেচ্ছাচারী সমাজে ধাপে ধাপে মাথা তুলিতেছিল।

পাড়ার একটা কামিন আসিয়া কহিল, সরোজ চল, ছোটবাবু তোকে ডাক্‌ছে—চল। হোথা কি কাজ আছে—

সরোজ কহিল, মু যাবেক নাই—

কামিনটি কহিল, চল কেনে—মু ত যাবেক তোর সঙ্গে, চল কেনে—

সরোজ কহিল, যাবেক কেনে? এ রাতে মু কেনে যাবেক, কোন কাজ লাগবেক—

মথুর হাসিয়া কহিল, লাগ্‌বেক বটি লাগ্‌বেক—যা কেনে—ছোটবাবু ডাকলেক, মু সর্দ্দার হবেক বটে, তু সর্দ্দারণী হবেক—

সরোজ প্রশ্ন করিল, তু বল্‌ছিস মু যাবেক?

—যা কেনে, মু ত বলছি—

সরোজ তুম্ তুম্ করিয়া পা ফেলিয়া কামিনের পিছন পিছন চলিয়া গেল। মথুর—হাঁড়ির শেষ পঁচুইটুকু এক চুমুকে নিঃশেষ করিয়া দুইখানা পেঁয়াজী এক সঙ্গে গালে ফেলিয়া দিল, দেয়াল ঠেস্ দিয়া বিচিত্রস্বরে ঝুমুর গানের এককলি বার বার গাহিতে লাগিল—তাহার পরে পঁচুইয়ে বিস্মৃতির মাঝে কাটিয়া গেল রাত্রি—

*

চারিপাশে শহর, কলকারখানা গজাইতেছে—পল্লীর সে শান্ত কর্ম্মময় পরিবেশ নাই। মানুষের আকাঙ্ক্ষা বাড়িয়াছে—অভাব বাড়িয়াছে, কাজ বাড়িয়াছে। দেশে শিল্পোন্নতি হইতেছে, কারখানাকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে জনপদ, বিচিত্র মানুষ লইয়া। মানুষ ত্যাগ করিতে ভুলিয়াছে—ভোগ করিতে শিখিয়াছে। বহু সম্বন্ধবিশিষ্ট সমাজ আত্মকেন্দ্রিক হইয়া উঠিয়াছে—মানুষের সমাজে চলিতেছে প্রতিযোগিতা—ধনী হইবার সম্পদশালী হইবার। গ্রামের রক্ত শোষণ করিয়া নগর স্ফীত হইয়াছে—মানুষ সভ্য হইয়াছে।

এই গোপালপুরে একদিন হ্যারিকেন লণ্ঠন লইয়া সারদা মল্লিক কি কাণ্ডই না করিয়াছিল, আর আজ ছোটলোকদের পাড়ায়ও ঘরে ঘরে লণ্ঠন—সেটা আর বিস্ময় নয়, নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের একটি। এমনি করিয়া ধান চাউলের বিনিময়ে ঘরে ঘরে লণ্ঠন, কাঁচের চুড়ি, গন্ধ তৈল প্রভৃতি সভ্যতার আনুষঙ্গিক আসবাব স্থান পাইয়াছে—চারিপাশে চলিতেছে অগ্রগতি—দ্রুত তীব্রগতিতে—

অন্যান্য জমিদারীর ইতিহাসের মতই ভগবতীর জমিদারীর ইতিহাস। চাঁদমোহন তাহার অংশ ভাগ করিয়া লইয়াছেন এবং আপনার পাওনা-গণ্ডা আদায় করিয়া কলিকাতায় বাড়ী ও ব্যবসায় করিয়াছেন, ছেলেরা

শিক্ষিত হইয়াছে। ভগবতীর দোল দুর্গোৎসব প্রভৃতি ও দান ধ্যান বজায় করিতে শশধর ঘরের সম্পত্তি অনেক নষ্ট করিয়া গিয়াছেন—দরিদ্র প্রজাকে বহু জমি বিলি করিয়া গ্রাম ত্যাগ করিতে দেন নাই। ধর্ম্মকর্ম্মের মোহে বেকুবের মত নিজের সব কিছুই প্রায় নষ্ট করিয়া পরম আত্মতৃপ্তি লইয়া পরলোকগমন করিয়াছেন। চাঁদমোহন বুদ্ধি ও কৌশলে সম্পত্তি বাড়াইয়াছেন। বড় হইয়াছেন। হরি প্রথমে সম্পত্তির অংশ লইয়া শহরে বাড়ী করিয়াছিলেন, তাহার পরে সেটা বিক্রয় করিয়া ভাড়া বাড়ী করিয়াছিলেন—তাহা হইতে এখন যে উপার্জ্জন তাহা উল্লেখযোগ্য।

*

গোপাল অধিকতর বৃদ্ধ হইয়াছেন—গ্রামান্তরে যজমান রক্ষা তাহার পুত্রদ্বয়ই করিয়া থাকে তিনি কেবল বনলতার কাজগুলি নিজে করিয়া দেন এবং মাঝে মাঝে শাস্ত্র কথা বা ভাগবত শুনান। গোপাল সেদিন লাঠি লইয়া ধীরে ধীরে মাঠের দিকে যাইতেছিলেন, একবার জমিটা দেখিতে হইবে—সার প্রভৃতি দেওয়া হইতেছে কিনা—

চৈত্রের মাঝামাঝি। বেশ গরম পড়িয়াছে—মাঠ তৃণশূন্য, গরুগুলি শুষ্ক মাঠে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। গোপাল মাঠের পানে যাইতে যাইতে দেখেন—কে একজন বসন্তসায়রের পাড়ে একটা পাকুড়গাছের ডাল কাটিতেছে। গোপাল বিস্মিত হইলেন—এমন অনাচার কে করিতেছে? তিনি প্রশ্ন করিলেন, কে পাকুড়ের ডাল কাট্‌ছিস্?

উপর হইতে নবীন কহিল, আমি বট ঠাকুর মশায়—

—পাকুড়ের ডাল কাট্‌ছিস্ কেন? এ যে মহাপাপ রে?

—কেনে ছাগল গরুগুলো কিছু খাবে—

—অন্য ডাল কাট, বনস্পতির ডাল কাটিস্ না। বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ ছাড়া বট পাকুড়ের ডাল কাট্‌তে নেই। নেমে আয়—নেমে আয়—

নবীন বাউরী অনিচ্ছাসত্ত্বেও নামিয়া আসিল। গোপাল কহিলেন, ধর্ম্মকর্ম্ম ত দেশে নেই-ই—আর থাকবারও সঙ্গত কোন কারণ নেই। মানুষ পশুর মত কেবল নিজের স্বার্থ ও উদর নিয়েই ব্যস্ত। তবে যে কয়দিন আছি বলবো। শাস্ত্রে বলে বনস্পতি লাগানো এবং রক্ষা করা ধর্ম্ম, কারণ এতে সমাজের মঙ্গল, এই গাছের ছায়ায় বসেই ত দুদণ্ড জিরোবে গরমের সময়, কাজেই তার শাখা কাটা অধর্ম্ম—

গোপাল লক্ষ্য করেন নাই, কোন সময় চাঁদমোহন পিছনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। গোপাল পিছন ফিরিয়া যেন একটু ভীত হইলেন। শাস্ত্রবাক্য বলাটা হয়ত চাঁদমোহন পছন্দ করিবেন না।

চাঁদমোহন হাসিয়া কহিলেন, কি আলাপ কচ্ছেন ঠাকুরমশায় ?

গোপাল অনেকটা অপরাধী মত কহিলেন, বটপাকুড়ের ডাল কাটা ঠিক নয় তাই বলছিলাম—গাছপালা লাগানো ধর্ম্ম এই—

—কেন ডাল কাট্‌লে কি হয় ? ব্রাহ্মণেরা ত কাট্‌তে পারেন।

—তা পারেন, তবে যাগযজ্ঞ ব্যপদেশেই কাটা প্রয়োজন হয়।

—গাছ লাগালে কি হয়—

—পুণ্য হয়, কত পথিক গাছতলায় বসে আরাম পায়, ছায়ায় বসে শ্রান্তি দূর করে—

চাঁদমোহন ব্যঙ্গের সঙ্গে হাসিয়া উঠিলেন—ওসব কিছু না ঠাকুরমশায়, কিছু না। ব্রাহ্মণে যদি কাট্‌তে পারে তবে সকলেই পারে—ডাল ত আবার গজাবে—

—গাছটা মরেও যেতে পারে ত ?

—ডাল কাট্‌লে কি গাছ মরে ?

গোপালের বাদানুবাদ করিবার ইচ্ছা ছিল না, তিনি কহিলেন,

বেশ বাবা কাটুক, যার খুশী কাটুক—তবে গাছের ছায়াটা ত আর পাবে না।

গোপাল উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া চলিতে লাগিলেন—অদূরের মাঠের জমিটা দেখিয়া তাহাকে ফিরিতে হইবে।

চাঁদমোহন স্মিতহাস্যে ছড়ি ঘুরাইতে ঘুরাইতে প্রাতঃভ্রমণ শেষ করিয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন।

*

গোপাল আজকাল অশক্ত হইয়া পড়িয়াছেন, উপবাস, গ্রামগ্রামান্তরে গমন বা পূজার্চ্চনার কাজ আর করিয়া উঠিতে পারেন না। কেবল গৃহদেবতার পূজা করেন এবং অবসর সময়ে শাস্ত্রাদি পাঠ করেন। টোলে একটিমাত্র ছাত্র—আর তাহার দুই পুত্র। সকাল ও সন্ধ্যায় তাহাদের অধ্যাপনা করেন। যদি স্বগ্রামে কেহ নেহাত নাছোড়বান্দা হইয়া পূজা করিতে বলে তবেই পূজা করেন, তাহা ব্যতীত পুত্রদ্বয়ই তাহা সম্পন্ন করে। তাহারা ইংরাজি শিখে নাই, পিতার কাছে দশকর্ম্ম ও সংস্কৃত শিখিয়াছে—এখনও ছেলেমানুষ হইলেও পূজা পার্ব্বণের কাজ ভালই করিতে পারে এবং তাহারাই এখন যজমান রক্ষা করে।

সেদিন সকালে গোপাল বসিয়া তালপাতার একখানা পুঁথি পড়িতেছিলেন—চোখে সূতাবাঁধা চশমা।

দুই পুত্র পাঠ লইবার জন্যে আসিয়া বসিলে তিনি দশকর্ম্ম সম্বন্ধে বুঝাইয়া দিতে লাগিলেন। ৺শ্রীকালীপূজার মুদ্রা আসন হোম প্রভৃতি সম্বন্ধে বলিতেছিলেন এবং মতি ঠাকুরের স্বহস্ত লিখিত পুঁথিখানার কোথায় কি আছে তাহা বুঝাইয়া দিতেছিলেন।

কনিষ্ঠ ভোলানাথ প্রশ্ন করিল, বাবা, ওর সংক্ষেপ কি?

—পূজায় আবার সংক্ষেপ কি? সংক্ষেপ করলেই অঙ্গহানি হবে যে!

অতবড় পূজা করতে হ'লে ত একরাত্রে একখানার বেশী ৺কালীপূজা হয় না, তাতে পোষাবে কেন?

গোপাল বিস্মিত হইয়া চাহিয়া রহিলেন, পরে প্রশ্ন করিলেন, ৺কালীপূজা কি ব্যবসা নাকি?

—আজকাল যা দক্ষিণা, তাতে—

—নাই-বা দিলে দক্ষিণা, ভগবানের নাম ত করা হ'ল। যজমানের কল্যাণে ৺মাকে ডাকা হল—সেই ত লাভ—

ভোলা কহিল, যারা বড়লোক তারা কত বাজে ব্যয় করে অথচ পূজা অঙ্গে কিছু দেবে না, তাতেই ত রাগ হয়। গরীবে না দিলে ত দুঃখ হয় না।

গোপাল বিরক্ত হইয়াছিলেন—পুত্রের এই মনোবৃত্তি তাঁহাকে ব্যথিত করিয়া তুলিয়াছিল। তিনি কহিলেন, ভোলা, পূজার্চ্চনা তোর কাজ নয়, তুই দোকানদারি কর গিয়ে—

জ্যেষ্ঠ শিবনাথ এতক্ষণ চুপ করিয়া ছিল, সে অপেক্ষাকৃত বুদ্ধিমান। পিতার অন্তর বেদনাকে সে জানিত, তাই সে কহিল, ওসব বাজে কথা, চুপ কর ভোলা। শোনো বাবা, অনেক যজমানই আজকাল চায় যে সকাল সকাল পূজাটা হ'য়ে যায়, যাতে—তাড়াতাড়ি খাওয়া দাওয়া মিটে যায়—তাই ভোলা ব'লেছিল—

—সে রকম যজমানের বাড়ীতে পূজা করার দরকার নেই—

ভোলা কহিল, সকলেই ত ঐ রকম যজমান—পূজা ভালভাবে হোক্, এ ত কেউ চায় না—

গোপাল কহিলেন, ঘোর কলি, ঘোর কলি! পূজা এখন ব্যসনের

পর্য্যায়ে গেছে—অন্তরে ভক্তি-প্রীতি নেই। ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচার নেই—কেবল টাকা টাকা! ভগবান—আর কতদিন দেখতে হবে আমাকে—

গোপাল উত্তেজিত হইয়াছিলেন, তিনি কহিলেন, যা তামাক সাজ—আর অধ্যয়ন হবে না--

শিবনাথ উঠিয়া তামাক সাজিতে গেল। গোপাল বিষণ্ণ মনে বসিয়া রহিলেন। তিনি ভাবিলেন—কি হইল! যে ভয়ে তিনি ইংরাজি স্কুল হইতে পুত্রদিগকে ছাড়াইয়া আনিয়াছিলেন, সেই ভয় তাহার ঘরেই ঢুকিয়া পড়িয়াছে—ভোলাকে এত শাস্ত্র পড়াইয়াছেন, কিন্তু সে সমস্ত উবিয়া গিয়া এখন সে চিনিয়াছে টাকা? দক্ষিণার অনুপাতে সে পূজা করিতে চায়! মানুষের এমন পরিবর্ত্তন হইল কি করিয়া—হাওয়ায় যেন এই রোগের বীজাণু ছড়াইয়া পড়িয়াছে। হায়! হায়! মানুষ যদি এত স্বার্থপর হয় তবে শ্বাপদের সহিত আর পার্থক্য রহিল কি? আজ গোপালপুরের পানে চাহিয়া তাঁহার অশ্রু ঝরিয়া পড়ে—এখানে মানুষ কেহ নাই—সমস্ত গ্রাম আজ যেন সর্প, ব্যাঘ্র, শৃগাল, কুকুরে ভরিয়া গিয়াছে, আর অর্থের পচা শব ধরিয়া টানাটানি করিতেছে।

শিবনাথ হাতে হুঁকা দিতে গোপাল কহিয়া উঠিলেন, জানোয়ার—জানোয়ারের পৃথিবী এটা—দুর্গা, দুর্গাশ্রীহরি!

*

তামাক টানিতে টানিতে একখানা পত্র আসিল—

হরিহর লিখিয়াছে, তাহার ধান বিক্রয় করিয়া টাকা পাঠাইতে। তাহার লাইফ ইনসিওরের কিস্তি খেলাপ হইয়া যাইতেছে অতএব টাকাটা শীঘ্র পাঠান চাই। গোপাল অনেকক্ষণ চিন্তা করিলেন, কিন্তু লাইফ ইনসিওর কি বস্তু তাহা বুঝিতে পারিলেন না এবং তাহার ফলে

কৌতূহলটা ক্রমশঃ বৰ্দ্ধিত হইতে লাগিল। ভাবিলেন—চাঁদমোহন নিশ্চয়ই ব্যাপারটা জানে, অতএব তাহার নিকট হইতেই শুনিয়া আসা যাক্।

গোপাল গ্রামের পথে ধীরে ধীরে যাইতেছিলেন—চরণক্ষেপ আজ তাঁহার অত্যন্ত অলস, দেহে শক্তি নাই। যাইতে যাইতে গ্রামখানার নূতনরূপ তাঁহার চোখে আজ প্রতিভাত হইয়া উঠিল—যাহারা পথে তাঁহার পাশ কাটাইয়া গেল তাহারা যেন মানুষ নয়, হিংস্র শ্বাপদ, অন্যের বক্ষরক্ত পান করিবার জন্য সর্ব্বদা যেন ছোঁ ছোঁ করিয়া বেড়াইতেছে। এই ত মদন তাম্বুলীর বাড়ী জঙ্গলাকীর্ণ—বড় ভাই ছোট ভাইকে সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করিয়া এত বড় বাড়ী করিয়াছিল—ছোট ভাইটা দেশত্যাগী হইয়া কোথায় গিয়াছে। শোনা যায় শহরে সে বাড়ী করিয়া আছে, মদনের সম্পত্তি পাইয়াছিল জামাইরা, বিক্রয় করিয়া দিয়া গিয়াছে—এ বাড়ীতে, এই অধর্ম্মের ভিটায় আর প্রদীপ জ্বলে না।

বংশী তিলির দোকান। দুই চারজন খরিদ্দার দাঁড়াইয়া আছে। বংশী জিনিষপত্র মাপিয়া দিতেছে—মাপে কম হইয়াছে বলিয়া কে যেন বচসা করিতেছে। গোবিন্দ বাঁচিয়া থাকিতে এমন হয় নাই। কতজনের কত গচ্ছিত টাকা থাকিত গোবিন্দের বাড়ীতে, তাহার এক পয়সাও কোনদিন লোকসান হয় নাই। তাহারই ছেলে বংশী আজ অবিশ্বাসী—তেলে ভেজাল, মাপে কম, ঘি'তে চর্ব্বি—কত কি?

গোপাল চলিলেন—গ্রামের পানে চাহিয়া তাঁহার যেন বুক ফাটিয়া যায়। কি একটা দানব আসিয়া যেন পুরাতন স্বর্গরাজ্য ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিয়াছে—বিষবৃক্ষ রোপণ করিয়া হাওয়া দূষিত করিয়া দিয়াছে···

গোপাল চাঁদমোহনের বৈঠকখানায় যাইয়া উঠিলেন। চাঁদমোহন তিনুর সঙ্গে কি যেন একটা পরামর্শ করিতেছিলেন। চাঁদমোহন ফিরিয়া

চাহিলেন কিন্তু কিছু বলিলেন না, তিনু বসিতে বলিল। তামাক সাজিবার জন্য কোন ব্যস্ততা ছিল না কাহারও, কালী বাগ্দী বাহিরে বসিয়া রহিল নির্ব্বিকারভাবে। চাঁদু সিগারেট খান, তাই বর্ত্তমানে তামাকের বিশেষ কোন বন্দোবস্ত নাই।

গোপাল নিজেই কথাটা পাড়িলেন, চাঁদু, একটা বিষয় জান্‌তে এলাম। লাইফ ইনসিওর কি? তার কিস্তি খেলাপ হ'লেই বা কি হয় একটু বুঝিয়ে দেবে—

চাঁদু প্রথমেই খানিক বিজ্ঞের হাসি হাসিলেন, তাহার পর ব্যাপারটা কি বুঝাইয়া দিলেন। শেষের দিকে চাঁদু কহিলেন, আর কিছু কাজ নেই ত ঠাকুরমশায়?

—না—

—আচ্ছা—

চাঁদু কাজে মন দিলেন। ইহা হইতে চলিয়া যাইবার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত আর কি হইতে পারে? অতএব গোপাল উঠিলেন। কাছারী হইতে নামিলেই চণ্ডীমণ্ডপ—সেখানে গরু বাঁধা হয়—শুষ্ক গোবর ও খড় রহিয়াছে—গোমূত্রে দুর্গন্ধময়। এই চণ্ডীমণ্ডপ একদিন ঝক্‌ঝক্ করিত—দ্বি-প্রহরে বসিত পাশার আড্ডা। সারদা মল্লিক, মতি ঠাকুর সকলে পাশা খেলিতেন। ভাগবত, রামায়ণ, কত গান হইয়াছে এইখানে, পতিব্রতা সীতার দুঃখ, ত্যাগ ও সহিষ্ণুতার কাহিনী শুনিয়া ইতর ভদ্র সকলে অশ্রুমার্জ্জনা করিয়াছে—সে লোকশিক্ষা আজ নাই। ভাগবত রামায়ণ উঠিয়া গিয়াছে—জন্মাবধি কেহ ত্যাগের কাহিনী শুনিতে পায় না, শুনে কেবল টাকার স্তুতি গান। লোকে অবসর সময়ে গল্প করে—অমুক কেমন করিয়া রাতারাতি বড়লোক হইয়াছে। তদ্দ্বারা মানুষের মনে উচ্চাকাঙ্ক্ষার বীজ বপন করা হয়—কিন্তু অর্থোপার্জ্জনই কি একমাত্র উচ্চাকাঙ্ক্ষা—আর কোনটাই নয়। গোপাল পুরাতন জীর্ণ অপরিষ্কৃত

মণ্ডপের পানে চাহিয়া মনে মনে বলেন—মা, জগজ্জননী, তুমি ইহাই দেখাইবার জন্যে কি আমাকে এত দীর্ঘায়ু দান করিয়াছ? বৃদ্ধ গোপালের কোটরগত নিষ্প্রভ চোখ দুইটি জলে ভরিয়া উঠে—চণ্ডীমণ্ডপের দিকে চাহিয়া একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস মুক্ত করিয়া দিয়া বাড়ীর দিকে চলিতে থাকেন। মনের মধ্যে একটা বিষাদ ও অস্বস্তি তাঁহাকে যেন বৃশ্চিকের মত দংশন করিয়া ফিরে।

*

বাড়ীতে যাইয়া গোপাল কহিলেন, শিবু, খদ্দের ছাখ, হরির ধান বিক্রি করতে হবে, নইলে তার লাইফ্ ইনসিওরের কিস্তি খেলাপ হয়—

শিবু কহিল, হ্যাঁ, দেখছি। বাউরী শশী ত ধান কিন্‌তে এসেছিল।

গোপাল হুঁকা সাজিতে বসিলেন—মনে মনে ভাবেন—পূর্ব্বে ত এইরূপ লাইফ্ ইনসিওর কেহ করে নাই, কিন্তু জগত চলিয়াছে ত? তবে এখন কেন প্রয়োজন হয়। তখনকার দিনে গুরুজনের স্নেহে লোকের বিশ্বাস ছিল, পুত্রস্বজনদের কর্ত্তব্যবুদ্ধির উপর আস্থা ছিল—আজ নাই। নিজেরাই সেই বিশ্বাসের মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছে তাহাদের আত্মকেন্দ্রিক মন দিয়া—তাই আজ পরকালের কড়ি জড়ো করিবার জন্য এই তাড়াহুড়া—কিন্তু একটা নিঃসহায় পরিবারের পক্ষে দুই এক হাজার টাকা বসিয়া খাইলে কয় দিন? তাহার চেয়ে স্নেহ করুণার উদার-হৃদয় একটি ভাই, কি একটি আত্মীয় কি বেশী নয়? সে আত্মীয়তার বন্ধন এরা ছিন্ন করিয়াছে, নিজের স্বার্থবুদ্ধি ও শিক্ষার অহমিকা দিয়া—জগত হইয়াছে পর, এত পর যে তাহাকে এতটুকু বিশ্বাস করা যায় না। হায়, হায়—কোথায় গেল সেই পরস্পর নির্ভরশীল সমাজ, বহু সম্বন্ধবিশিষ্ট পরিবার, শাসক-পালক ভূস্বামী!

গোপাল অশ্রুসিক্ত-চোখে দূরের পানে চাহিয়া থাকেন—শেষের আর কত বাকী—কতদিন আর এমনি করিয়া আপনার দুঃখে আপনাকে পুড়িতে হইবে।

*

নতুন সমাজ, নতুন শিক্ষা গোপালের মনোবেদনা বুঝে না, তাহার কথায় লোকে হাসে, তাহার কথা কেহ বুঝে না। নিরন্তর গোপালের মনে হয় তিনি যেন গোপালপুর গ্রামে পড়িয়া আছেন, উৎসব শেষের স্তূপীকৃত আবর্জ্জনা ও উচ্ছিষ্টের মাঝে। অতীতের সেই সুখস্মৃতির মাঝে কখনও ডুবিয়া মধু পান করেন—মানুষের প্রয়োজন ছিল অল্প, মানুষ স্বল্পায়াসেই তাহা উপার্জ্জন করিত, বাকী সময়টা কাটাইত আনন্দে, পরস্পরের সহিত মিশিত, তাই ছিল প্রীতির বন্ধন। আজ সে বন্ধন ছিন্ন, মানুষ চাহিয়া আছে নিজের পানে—প্রয়োজন বাড়িয়াছে, সময় কমিয়াছে, বাসনার সঙ্গে ব্যসন বাড়িয়াছে কিন্তু উপার্জ্জন বাড়ে নাই।

গোপাল সেদিন বৈকালে চণ্ডীতলায় বসিয়া এই সবই ভাবিতেছিলেন, বার বার মা চণ্ডীর কাছে প্রশ্ন করিতেছিলেন—মা, কবে তুমি পৃথিবীকে এই পাপমুক্ত করিবে।

নবীন বাউরী আসিয়া প্রণাম করিল। কহিল, ঠাকুরমশায় হেথা একলাটি বসা করেছেন কেনে?

নবীন বৃদ্ধ, অতীতের সেই দিনের ছাপ তাহার মধ্যে আজও রহিয়া গিয়াছে। নবীন ঠাকুরমশায়ের সহিত দুই একটা কথা বলিয়া তাই তৃপ্তি পায়। নবীনের প্রশ্নে গোপাল কহিল, কোথা আর যাবো নবীন, পৃথিবীতে যাবার জায়গা ত আর নেই। আমাদের স্থান নেই হেথা,

তবে কেন মা চণ্ডী এখনও পায়ে নিচ্ছেন না, তাই ভাবি। কোন মহাপাতক ক'রেছি—

নবীন কহিল, হেথা কি হ'ল ঠাকুরমশাই—ভালোবাসা উঠে গেলেক। সুবল বাউরীর বেটী সাঙ্গা করলেক—আসনাই করলেক মদনের বেটার সঙ্গে, আর ষষ্ঠীর বেটা দু'খানা গয়না যতুক করলেক আর তাকেই সাঙ্গা করলেক। ভালোবাসার চেয়ে টাকার দাম বেশী হলেক ঠাকুরমশায়—

গোপাল ঠাকুরের অন্তরের ক্ষতস্থানটায় আঘাত লাগিয়াছিল, তিনি কহিলেন, তাই ত হয়েছে দেশে—নতুন রকম করে সব ভাবতে শিখেছে। পূজা পার্ব্বণে আজ আর পূজা নাই, তা হয়েছে উৎসব—ভক্তিহীন কর্ম্মহীন বিলাসিতা মাত্র—হায় হায়—এই ত কলি নবীন—

নবীন ও গোপাল অতীত দিনের পুরাতন চিত্রের পানে চাহিয়া ব্যথিত হইয়া উঠেন। অন্তর ক্ষোভে দুঃখে বেদনায় যেন চীৎকার করিয়া উঠিতে চায়—স্বপ্নাচ্ছন্নভাবে সন্ধ্যা কাটিয়া যায়।

দূরের দিকচক্রবালের উপরে ত্রয়োদশীর চাঁদ উঠিয়া পৃথিবীকে জোৎস্নায় স্নান করাইয়া দেয়। নবীন কহে, চলুন ঠাকুরমশায়, বাড়ী পৌঁছে দেওয়া করি।

—থাক্—নবীন, একলাই যেতে পারবো—

—তা কি হয়? আমি থাকতে একলাটি যাবেন—

—তবে চল—

*

বনলতা হঠাৎ সংবাদ দিলেন—গোপাল ঠাকুরকে তাহার অবিলম্বে প্রয়োজন। ঐ একটি মাত্র বধূ মাঝে মাঝে তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠান এবং দুই একটি কথা জিজ্ঞাসা করেন—কখনও শিবপূজা, কখনও চণ্ডীপাঠ

প্রভৃতির বরাত পড়ে এবং গোপালকে তাহা করিতেই হয়। বনলতার চণ্ডীপাঠ ও শিবপূজা গোপাল ব্যতীত সম্পন্ন হয় না।

গোপাল অন্দরে প্রবেশ করিলেন, বাড়ীটা ভাগাভাগি হইয়া গিয়াছে, একটা দিক চেয়ার টেবিল প্রভৃতি আধুনিক আসবাবে সজ্জিত, নতুন রকম রংএর প্রলেপ দেওয়া, অন্য অংশ জীর্ণ, নেহাত সেকেলে। বনলতার তথা শশধরের অংশ সেইটি। কাছারী বাড়ীটা এখনও সাধারণ ভাবে ব্যবহৃত হয়।

গোপাল অন্দরে পৌছিতেই বনলতা আসন পাতিয়া দিয়া গলবস্ত্রে প্রণাম করিলেন। গোপাল মনে মনে খুশী হইলেন, এমনিভাবে কেহ আর এখন অভ্যর্থনা করে না। গোপাল সহাস্যে কহিলেন, কি মা, হঠাৎ অকেজো লোকটিকে ডাক পড়ল কেন?

বনলতা ব্যথিতভাবে কহিল, আমি কি অপরাধ করেছি ঠাকুরমশাই?

—তোমার অপরাধ কি? দেহটা সত্যিই অকেজো হ'য়েছে, এইটুকু আসতে যেন দম আট্‌কে আসে—যাক্, হঠাৎ কেন মা?

বনলতা কহিলেন, ঠাকুরপোর আজ দু'দিন জ্বর, বুকে বেদনা। ঠাকুরেরও ঠিক এমনি বুকে ব্যথা হ'য়ে—বনলতা থামিয়া গেলেন। একটু পরে কহিলেন, ছোট বৌ ক'লকাতায়, এখানে আর কেউ নেই, আমার বড্ড ভয় হ'য়েছে। আপনি কাল একরূপ চণ্ডীপাঠ করুন—আমার সাধ্যমত সবই করতে হবে ত? এখনও যখন বেঁচে আছি—

গোপাল একটু হাসিয়া কি যেন ভাবিলেন, তাহার পর বলিলেন, তোমাকে ত ভেন্ন করেই দিয়েছে, তুমি কি ক'রবে? দরকারই বা কি? ক'লকাতায় চিঠি দিয়ে দাও—তারা যা জানে তাই করবে—

বনলতা কহিল, তাই কি হয় ঠাকুরমশায়, আমার দেওর আমার কাছে আছে যখন—সবই আমাকে করতে হবে। ওরা ফেলে দিলেই ত আমি ফেলে দিতে পারিনে ঠাকুরমশায়? ধর্ম্ম ত চিরদিনের—

গোপাল বনলতার কথা শুনিয়া প্রথম একটু হাসিতে চেষ্টা করিলেন—বনলতার মন পরীক্ষার জন্যেই প্রশ্নটা করিয়াছিলেন। কিন্তু দেখিতে দেখিতে চোখ দুইটি বাষ্পাকুল হইয়া উঠিল, তিনি কম্পিত কণ্ঠে কহিলেন, মা, এমনি কথা অনেক দিন শুনিনি, এমনি করে ধর্ম্মের কথা, ত্যাগের কথা, আর কেউ এখন বলে না—কেবল বলে আমার, আমার—আর একবার বল মা—বড় মধুর, বড় সুন্দর কথা—

গোপালের কোটরগত চক্ষু হইতে সত্য সত্যই দুই ফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িল। বনলতা একটু বিব্রত হইয়া পড়িলেন—তিনি কোন্ কথায় গোপালকে ব্যথিত করিয়াছেন তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না, তাই পদপ্রান্তে বসিয়া কহিলেন, ঠাকুরমশায়, ক্ষমা করুন, আমরা ত কথা ব'লতে জানি না—

গোপাল রুদ্ধপ্রায় কণ্ঠে কহিলেন, তুমি আমি যখন চলে যাবো তখন এই গোপালপুরে আর এসব কথা কেউ ব'লবে না। বড় দুঃখ মা মনে—মানুষ এমন হিংস্র হ'য়েছে কেন ?···আচ্ছা, কাল চণ্ডীপাঠ ক'রবো—নারায়ণকে তুলসী দেব—চাঁদু ভাল হবে—

গোপাল নিজেকে সংযত করিতে তাড়াতাড়ি চলিয়া আসিলেন। বাহিরে আসিয়া চক্ষু মার্জ্জনা করিয়া পথ চলিতে লাগিলেন—মনে মনে ভাবিলেন বনলতার সঙ্গে সঙ্গে ভগবতী চাটুয্যের সংসারে ধর্ম্মের শিক্ষা চিরদিনের মত নিভিয়া যাইবে। দেশে থাকিবে শুধু হিংস্র শ্বাপদ, স্বার্থ লইয়া হানাহানি করিবে—পূর্ব্বে কত ভাই একসঙ্গে চিরদিন থাকিয়াছে কিন্তু ইংরাজি শিক্ষিত শশধরের পুত্রদ্বয়ের হাঁড়িও ত ভাগ হইল বলিয়া। তিনি অনুচ্চ কণ্ঠে কহিলেন, দুর্গা, দুর্গা শ্রীহরি—

*

গোপাল আপন মনে যাইতেছিলেন—শ্রীধর তিলির ছেলে স্কুলে পড়িয়া এখন কলিয়ারীতে চাকুরী করে, সে কোনরূপ অভিবাদন না করিয়া পাশ কাটাইয়া চলিয়া যাইতেছিল দেখিয়া তিনি একটু হাসিলেন। তাহার হাসি দেখিয়া শ্রীধর পুত্র ধীরেন থমকিয়া দাঁড়াইয়া গেল। গোপাল কহিলেন—শ্রীধরের বেটা বটে ?

—হ্যাঁ ঠাকুরমশায়—

—ভাল আছ ? কাজকর্ম্ম ভাল চল্‌ছে—

—হ্যাঁ—

—ছুটি নিয়ে এসেছ ? ক'দিন ?

—ছুটি কি আছে, বলে কয়ে এক সপ্তাহের ছুটি নিয়েছি। বড় সাহেব সকলকে ছুটি দেবে, আমাকে দেবে না ?

—কেন ?

ধীরেন হাসিয়া কহিল, আমি না হ'লে চলে না। কিছু বোঝে না, আমি চালিয়ে নেই কিনা ? মেমসাহেব পর্য্যন্ত কত খাতির করে—

গোপাল হাসিলেন—তাহার গল্প শুনিয়া নয়, এতক্ষণও সে একটা শুষ্ক নমস্কার করে নাই—দেখিয়া। ধীরেন তাই প্রশ্ন করিল, হাসলেন যে ঠাকুরমশায় ? বিশ্বাস হ'ল না ?

—তা নয় বাবা, অন্য কারণে—

—বলুন না—

—ব'লবো ?

—বলুন—

—তোমার বাবা আমাকে কোনদিন প্রণাম না ক'রে রাস্তা পেরোয় নি, আর তুমি একটা কথাও না বলে চলে যাচ্ছিলে তাই—

—না ঠাকুরমশায়, আপনি আমার কথা বিশ্বাস করেন নি, ভেবেছেন গালগল্প, তাই হেসেছেন—

—না হে না—আমি ঠিকই বলেছি—

—নমস্কার না করলে হাস্‌বার কি আছে? আর খামকা নমস্কারই বা করতে হবে কেন? আপনি বিশ্বাস না করেন, চলুন একবার কলিয়ারীতে—দেখে আস্‌বেন—মেমসাহেব চা করে বসে আছে কিনা—

গোপাল মনে মনে ছেলেটির ধৃষ্টতা দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন। তাহার কথা সম্পূর্ণভাবে অবিশ্বাস ও উপেক্ষা করিয়া নিজের অনুমানটাকেই সে তাহার স্কন্ধে চাপাইতে চায়। গোপাল কহিলেন, ওহে আমি মিথ্যাকথা বলি না—আমি যা বলেছি তাই—আর তুমি যা অনুমান ক'রেছ তা অনুমানই এবং ভুল—

ধীরেন হাসিয়া কহিল, মানুষ চরিয়ে খাই ঠাকুরমশায়, আমার অনুমান ভুল হ'লে ফোর্থ ক্লাস বিত্তে নিয়ে করে খেতে হ'ত না—পাকা বাড়ীও ক'রতে হোত না—

গোপাল কটু কটাক্ষে ধৃষ্ট ছেলেটির পানে চাহিয়া চলিতে লাগিলেন। ধীরেনও ঠাকুরমশায়কে জব্দ করিয়াছে ভাবিয়া বিজয়োল্লাসে চলিয়া গেল। গোপাল ভাবিলেন—কলিয়ারীর চোরাই পয়সায় পাকা বাড়ী করিয়া ছেলেটা জগতের সবই বুঝিয়া ফেলিয়াছে! এত অহমিকা, এত ধৃষ্টতা কেমন করিয়া আসিল? তিনি অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া স্থির করিলেন—এমনি করিয়া যাচিয়া কুশল প্রশ্ন করিয়া আর অসম্মানকে আমন্ত্রণ করিয়া আনিবেন না। যে কয়েকদিন পরমায়ু আছে পৃথিবীর একান্তে নিঃসঙ্গ ভাবেই কাটাইয়া দিবেন—একমাত্র বিধাতার শ্রীচরণে নিজেকে সমর্পণ করিয়া।

*

চাঁদমোহনের পীড়া গুরুতর—

তাহার পুত্র অশোক কলিকাতা হইতে বড় ডাক্তার লইয়া আসিয়াছিল, তিনি চাঁদমোহনকে দেখিয়া ঔষধ পথ্যের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। দ্বাদশ দিন পার না হইলে এ রোগের সঙ্কটকাল উত্তীর্ণ হয় না। চিকিৎসা ও শুশ্রূষা চলিতেছে—অশোকের মাতাও কলিকাতা হইতে আসিয়াছেন।

বনলতা গৃহদেবতার পদতলে পড়িয়া কাঁদিতেছেন—ছোটবৌ বলিলেন, আপনি যদি ঠাকুর ঘরেই পড়ে পড়ে কাঁদবেন, তবে অষুধ পথ্যির ব্যবস্থা আমি কি করে করি—ডাক্তারের কথামত সব করতে হবে ত?

বনলতা চোখ মুছিয়া কহিলেন, ঠাকুর কুল দাও—আহা ছোটবৌ—তাহার অশ্রুর ধারা নামিয়া আসে।

ডাক্তারের ঔষধ, বনলতার অশ্রুমার্জ্জনা, ছোটবৌএর শুশ্রূষা ও অশোকের ব্যবস্থা কোনটাই বিশেষ ফলদায়ক হইল না, চাঁদমোহনের অবস্থা ধীরে ধীরে খারাপই হইতে লাগিল—

অশোক কলিকাতার ডাক্তারকে টেলিগ্রাম করিল, তিনি পুনরায় ঔষধাদির ব্যবস্থা করিলেন, কিন্তু খুব আশা দিতে পারিলেন না।

নবম দিন সকালে চাঁদমোহনের অবস্থা অত্যন্ত আশঙ্কাজনক হইয়া উঠিল। গোপাল বারান্দায় বসিয়াছিলেন—ভোলা আসিয়া সংবাদ দিল, ছোটবাবু বোধহয় আজই যাবেন—

—বলিস্ কিরে? চাঁদু চাঁদমোহন স্বর্গত হবে—সেদিনের ছেলে?

—হ্যাঁ, তাই ত শুনলাম—

গোপাল তাড়াতাড়ি লাঠিখানা লইয়া উঠিলেন এবং যথাসাধ্য

দ্রুতপদে ভগবতী চাটুয্যের বাড়ীর উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন। চাঁদমোহন তাঁহার আগেই ভবপারাবারের পাড়ি জমাইবে এটা তাঁহার নিকটে একেবারেই অবিশ্বাস্য বলিয়া মনে হইল—মনে মনে কহিলেন, হায় ভগবান এই সব দেখতেই কি বাঁচিয়ে রেখেছিলে?

গোপাল কাছারী বাড়ীতে আসিয়া দেখেন, কালী বাগ্দী বসিয়া তামাক খাইতেছে এবং তিনু বিষণ্ণমুখে বসিয়া আছে। গোপাল প্রশ্ন করিলেন, তিনু, চাঁদু কেমন আছে—

তিনু কহিল, ভালো নয়, বোধহয় আর আশা নেই—

—বলিস্ কি? আশা নেই—

গোপাল কাছারী হইতে বাহিরে আসিয়া অন্দরে ঢুকিতে যাইবেন—সহসা তাঁহার মনে হইল, ভগবতীর মৃত্যুর কথা, এই চণ্ডীমণ্ডপ বোঝাই লোক অশ্রুচোখে বসিয়াছিল, তাহারা শশধরকে অভয় দিয়াছিল—তাহারা আছে, দরকার হইলে প্রাণ দিতে প্রস্তুত। কিন্তু আজ চণ্ডীমণ্ডপ জনশূন্য, খড় গোবর ও নানা আবর্জ্জনায় পূর্ণ, তিনি দ্রুত অন্দরে প্রবেশ করিলেন। চাঁদমোহনের গৃহের দরজায় দাঁড়াইয়া বনলতা কাঁদিতেছিলেন। গোপাল কহিলেন—চাঁদু, চাঁদু কেমন?

বনলতা কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন, ঠাকুরমশায়, মা'র মনে কি এই ছিল—

গোপাল ঘরে ঢুকিলেন—চাঁদমোহন অজ্ঞান, অশোক একটা অষুধ খাওয়াইতে চেষ্টা করিতেছে কিন্তু চাঁদমোহন তাহা গিলিতে পারিলেন না। এই দৃশ্য দেখিয়া বনলতা পুনরায় কাঁদিয়া উঠিলেন। অশোক কহিল, অমনি করে কাঁদবেন না জেঠিমা—রোগীর ঘরে, ওতে ক্ষতি হয়, দুর্ব্বলতা আসে—

বনলতা বাহির হইয়া গেলেন। গোপাল রোগীর শিয়রে দাঁড়াইয়া দেখিলেন—একবার ডাকিলেন—চাঁদু, চাঁদু—

কোন জবাব কেহ দিল না—গোপাল চাঁদুর মাথায় হাত রাখিয়া কি একটা মন্ত্র জপ করিয়া কহিলেন, মাঁ ব্রহ্মময়ী মা—

অশোকের মুখে এমন একটা ভাব গোপাল লক্ষ্য করিলেন যেন সে তাহার এই আগমন ও কার্য্যে বিশেষ প্রীত হয় নাই। গোপাল তাহা অগ্রাহ্য করিয়া চলিয়া আসিলেন, কিন্তু সেদিনের ছেলে চাঁদু তাহাকে রাখিয়া চলিয়া যাইবে ইহা যেন তাঁহার পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল, তাই চোখ দুইটি বার বার অশ্রুপ্লুত হইয়া উঠিতেছিল। তিনি ধীরে ধীরে বাহির হইয়া আসিলেন—

কাছারী বাড়ীতে তিনু ও কালী বসিয়া আছে আদেশের অপেক্ষায়। তাহাদের কোন কর্ত্তব্য নাই—বাড়ী জনশূন্য, গ্রামে কাহারও যেন এই সংবাদের প্রয়োজন নাই। গ্রামের এতগুলি লোক, কেহ কোনও রূপে উদ্বিগ্ন হয় নাই—যে যাহার কাজ করিতেছে—

পথ দিয়া আসিতে লাগিলেন—কেহ তাঁহাকে প্রশ্ন করিল না, চাঁদু কেমন আছে—কেবলমাত্র মল্লিকমশায়ের ছেলে প্রশ্ন করিল, বাবুদের বাড়ী গিয়েছিলেন ঠাকুরমশায় ?

—হ্যাঁ—

—ছোটবাবু কেমন ?

—ভাল না—আমি ত আশা দেখি না—বেঘোরে পড়ে আছে—তোরা একবার দেখ্‌তেও যাস্‌না—

মল্লিকপুত্র কহিল, যাওয়া ত উচিত, গিয়েছিলামও—কিন্তু ওরা সেটা পছন্দ করেন না—তাই এমনি করেই সংবাদ নেই—

—হ্যাঁ—গোপাল চলিলেন। মনটা তাঁহার অত্যন্ত বিক্ষিপ্ত—চাঁদু চিরদিনের মত চলিয়াছে, আজ নিষ্ঠুর নির্দ্দয় গ্রাম নীরবে নিঃশব্দে তাহা দাঁড়াইয়া দেখিতেছে—এতটুকু করুণা, এতটুকু দুঃখ উদ্বেগ কোথাও আত্মপ্রকাশ করে নাই—কিন্তু ভগবতী যখন মারা যান তখন আদুরী

কাঁদিতে কাঁদিতে ছুটিয়াছিল, বলিয়াছিল, মোর ধর্ম্মের বাপ মারা গেলেক বটেরে—

গোপাল করুণার অশ্রু একবার মার্জ্জনা করিলেন—

*

দ্বিপ্রহরে বাবুদের বাড়ীর অন্দরে একটা আকস্মিক ক্রন্দনের রোল উঠিল। নিকটবর্ত্তী বাড়ীর পুরুষ স্ত্রী উৎকর্ণ হইয়া শুনিল—সকলে মিলিয়া কাঁদিতেছে। তাহারা কান্না শুনিয়া বুঝিল, চাঁদমোহনের প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়াছে। তাহারা শুনিয়াই বুঝিল এবং বুঝিয়াই চুপ করিয়া গেল—চাঁদমোহন আভিজাত্যের প্রাচীর দিয়া যে দূরত্ব সৃষ্টি করিয়াছিলেন তাহা ডিঙ্গাইয়া প্রতিবেশী কেহই দেখিতে গেল না।

লোকমুখে কথাটা প্রচারিত হইল মাত্র। ছোটলোকদের পাড়ায় শিবুর বৌ আসিয়া শিবুকে প্রশ্ন করিল, কান্না কেনে রে?

শিবু শণের দড়ি পাকাইতেছিল, কহিল, ছোটবাবু মারা গেলেক বটে—সে পুনরায় দড়ি পাকাইতে লাগিল। তাহার স্ত্রী কৌতূহল নিবৃত্ত করিয়া গৃহকার্য্যে মনোনিবেশ করিল।

মাঠে গরু রাখিতে রাখিতে নবীন বাউরীর ছেলে বাঁশী বাজাইতেছিল—কে একজন ডাকিয়া কহিল, ছোটবাবু মারা গেলেক বটে—

ছেলেটি বাঁশী বাজনা থামাইয়া কথাটা শুনিল এবং পুনরায় গরুগুলির উদ্দেশ্যে—হেঁই-পাঁপাঁ—হঃ হঃ বলিয়া বাঁশী বাজাইতে লাগিল।

তখন ছোটবৌ গৃহের মেঝেয় পড়িয়া উচ্চকণ্ঠে কাঁদিতেছেন, বনলতা তাহার মাথাটা কোলে করিয়া বসিয়া অশ্রুপাত করিতেছেন। অশোক বারান্দার দেয়ালে হেলান দিয়া বসিয়া নীরবে কাঁদিতেছে, তিনু দাঁড়াইয়া আছে নতমুখে, গ্রামের বয়স্ক দুই এক ব্যক্তি অন্দরের উঠানে দাঁড়াইয়া আছেন—সসঙ্কোচে, নীরবে।

*

অবিলম্বে গোপাল সংবাদ পাইলেন, চাঁদু শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়াছে। তিনি লাঠি লইয়া দ্রুত বাহির হইলেন। এখন শেষ ব্যবস্থা করিতে হইবে, চাঁদু ছেলেমানুষ, অশোক ত বালক, শশধরের দুই পুত্র ত শিশু—কে এই সব ব্যবস্থা করিবে?

তিনি অন্দরের উঠানে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, কয়েকজন প্রতিবেশী নীরবে দাঁড়াইয়া আছে। তিনু বারান্দায় ক্রন্দনরত অশোকের সাম্‌নে দাঁড়াইয়া। গৃহের অভ্যন্তরে বনলতা ও ছোটবৌ—গোপাল দরজায় দাঁড়াইয়া কহিলেন, মা, বনলতা ওঠো—সকলেরই এই গতি, অশোক ভাই ওঠো—তুমি ত শিক্ষিত, জানো জাতস্য হি ধ্রুব মৃত্যু—জরা মৃত্যু ব্যাধি মানব জীবনের অবশ্য পরিণতি—এখন সৎকারের ব্যবস্থা কর—সকলেরই এই এক গতি। ভগবান করুণাময়, শোকের দ্বারা অভিভূত হওয়া ত কর্ত্তব্য নয়। ওঠো বনলতা—

গোপাল ঠাকুরের কথায় অশোক একবার মুখ তুলিয়া চাহিল, কিন্তু কিছু বলিল না। গোপাল কহিলেন, ওঠ ভাই, এখন কাঁদবার সময় নেই, বাবা মায়ের জন্যে সারা জীবন কাঁদবে, ভাবনা কি তার জন্যে সারা জীবনই ত রয়েছে, এখন ওঠো, যাতে সদ্গতি হয় তার ব্যবস্থা কর—

অশোক অসহায়ের মত কহিল, যা করবার তা ত ক'রলাম, আর কি ক'রবো বলুন—

—বুকে বল সঞ্চয় করো, ভেবে দেখো তোমার মা, তোমার বোন, ভাই—সব তোমার উপরে নির্ভর করছে, এখন তোমাকে তাদের আশ্রয় দিতে হবে, সান্ত্বনা দিতে হবে—তোমার ত কাঁদবার সময় নেই।

অশোক কহিল, বলুন কি ক'রবো—

—চাঁহুর দেহ ত গঙ্গাতীরস্থ করতে হবে। তিনু তুমি সকলকে ডাকো—নবশাকদের আর বাগ্দী পাঁড়ায় সংবাদ দাও। বেলা বেশী নেই। সন্ধ্যার মধ্যে মুখাগ্নি ক'রে রওনা দিতে হবে—

তিনু অশোকের মুখের দিকে তাকাইয়া আদেশের প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়াছিল। অশোক কহিল—যা ভাল হয় কর—

তিনু চলিয়া গেল—

উঠানে অপেক্ষমান প্রতিবেশিগণকে উদ্দেশ্য করিয়া গোপাল কহিলেন, তোমরা এস বাবা সকল, অশোকের কাছে এস, বসো—আজ ওর কত বড় বিপদ, আমরা পাশে না দাঁড়ালে কে আর আসবে বল?

গোপাল বনলতা ও ছোটবৌএর উদ্দেশ্যে গীতার কয়েকটি শ্লোক ব্যাখ্যা করিলেন, পুরাতন বস্ত্রের মত মানবাত্মা পুরাতন জীর্ণ দেহ ত্যাগ করিয়া নূতন দেহ ধারণ করে। অতএব যাকে আমরা মৃত্যু বলে শোক করি সেটা নবজীবনের আরম্ভ। আমি বৃদ্ধ হ'য়েছি, জীর্ণ দেহ ত্যাগ করে নূতন সুন্দর দেহ লাভ করবো এটা কি আনন্দের নয়?···

তিনু বিষণ্ণমুখে দ্বারপ্রান্তে আসিয়া দাঁড়াইল। গোপাল প্রশ্ন করিলেন, ওরা সব আস্‌ছে ত? তুমি নববস্ত্র, চন্দন, ঘৃত, সমস্ত জোগাড় কর—

তিনু জবাব দিল না—দাঁড়াইয়া রহিল।

—কি, কি হ'য়েছে বল—

ওরা কেউ গঙ্গাতীরে যেতে পারবে না। যাকে বলছি সেই বলছে কাজ আছে, না হয় পায়ে ব্যথা, কোমরে ব্যথা। মোটের উপর যাবে না—

গোপাল উচ্চকণ্ঠে কহিলেন, কেন যাবে না? এতদিন গিয়েছে, আজ যাবে না কেন? ভগবতী চাটুয্যের ছেলের দেহ গঙ্গাতীরে দাহ হবে না, তবে কি হিঙ্গুলবাঁধে দাহ হবে?

তিনু আমতা আমতা করিয়া কহিল, তারা ত ব'লছে তাই, আমি কি করবো?

গোপাল কহিল, দেখি, আমি জিজ্ঞাসা করে দেখি, তারা কেন যাবে না, গ্রামে কি অরাজক হ'য়েছে—কারও কি পরের কথা ভাববার দরকার নেই? তারা কি কোন দিন ম'রবে না?

গোপাল ক্রুদ্ধ হইয়া বাহির বাড়ীতে আসিলেন। তিনু পিছন পিছন আসিয়া কহিল, ঠাকুর মশায়, ওরা বল্‌ছে, খাই খরচ ও মদের খরচা বাদে মাথাপিছু দশটাকা দিতে হবে—নইলে যাবে না—

—এই কি টাকা রোজগারের সময়? মানুষের যখন চরম বিপদ, তখন চাই টাকা? টাকাই কি পরমার্থ—প্রতিবেশীর প্রতি, মৃতের প্রতি কি তাদের কোন কর্ত্তব্য নেই?

গোপাল উষ্মাসহকারে বাহির হইয়া গেলেন। নবশাক পাড়ায় যাইয়া প্রথম পাইলেন, দোকানী বংশী তিলিকে। গোপাল কহিলেন, হ্যাঁরে বংশী, টাকা না হ'লে তোরা গঙ্গায় চাঁদুকে নিবিনে? দশটা টাকা না হ'লে কি তুই ফকির হ'য়ে যাবি? তোদের কি প্রতিবেশীর প্রতি কোন কর্ত্তব্য নেই—কোন মমতা নেই?

বংশী তাড়াতাড়ি গোপালকে প্রণাম করিয়া কহিল, ঠাকুর মশায়! আমাকে অপরাধী করবেন না। ছেলেরাই ত যাবে, তারা বলছে—আমার ত দেখুন সেদিন গাড়ী থেকে পড়ে পা মচ্‌কে গিয়েছে, চূণ হলুদ দিতে দিতে কোনমতে—

—টাকাই তোদের পরমার্থ। তোদের কি প্রতিবেশীকে কোন-কালেই লাগবে না! তোরা কি সব অমর—? আমি ত গরীব মানুষ, আমাকেও কি তোরা হিঙ্গুলবাঁধের কাদায় পুঁতে রাখবি?

বংশী পুনরায় সভক্তি প্রণাম করিয়া কহিল, আপনার পুণ্যের শরীর, ওকথা ব'লবেন না ঠাকুর মশায়। তবে আজকাল ত

মুরুব্বির কথা কেউ শোনে না—ছোকরারাই মুরুব্বি, কি ব'লবো বলুন—

গোপাল কহিলেন, হায় হায়, মানুষ এমন অধঃপাতেও যেতে পারে ? ভগবতী চাটুয্যের ছেলে আজ তোদের কাছে এতটুকু ভালবাসা শ্রদ্ধা পাবে না—

—আজ্ঞে কর্ত্তার কাল হ'লে দেখুন একহাজার লোক জড়ো হ'ল। মতি ঠাকুরমশায় পর্য্যন্ত তাদের ঠেকাতে পারলেন না। আর আজ তার ছেলের ব্যাপারে—দেখুন ঠাকুরমশায় কি আর ব'লবো—

বংশী যাহা বলিল, গোপাল তাহা বুঝিলেন না; তিনি হন্ হন্ করিয়া চলিয়া গেলেন। নবশাকদের কেহই প্রায় বাড়ী নাই, যাহারা বাড়ী ছিল তাহারা সাড়া দিল না—তরুণের দল তাহাকে দেখিয়া সরিয়া গেল। কেবল তাঁতিদের একটি ছেলে তাঁহার সামনে পড়িয়া গেল। তিনি তাহাকে প্রশ্ন করিতেই সে কহিল, গঙ্গাতীরে নিয়ে যাবার দরকার কি ঠাকুরমশায়। যার পুণ্য থাকে সে যাবেই, চেষ্টা করতে হবে না—ছোটবাবুর ত এমন পুণ্যের শরীর নয় যে—

বংশী যে কথাটি বলিতে পারে নাই তাঁতিদের ছেলেটি তাহা সুস্পষ্ট ভাবে বলিয়া দিল।

—কেন? কেন? ভগবতী চাটুয্যের ছেলে—যে ভগবতীর পুকুরের জল খেয়ে আজও বাঁচছিস্। গোপাল অশ্রুচোখে কহিলেন, দুদিন বাদে আমিও তো যাবো রে—তোরা কি এমনি করেই বলবি তখন—টাকা চাই—

—না ঠাকুরমশায়, আপনাকে নিয়ে যাবো—ছেলেটা একটু হাসিল। কিন্তু গোপালের চোখ দুইটি দুঃখে ক্ষোভে অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল—

গোপাল, বাগ্দী বাউরী পাড়ায় ঢুকিলেন। শশীকে ডাকিয়া কহিলেন,

কি রে, তোরাও কি যাবিনে শশী—শশী বাঁকা কোমর লইয়া নমস্কারান্তে কহিল, ঠাকুরমশায় আপনি কেনে আর? ওরা যাবেক নাই—ওরা যেতে লারবেক—বলছেন—ছোটবাবুর পুণ্যের দেহ হিঙ্গুল-বাঁধেই দেবেক?

—তোরা টাকা চেয়েছিস্ রে? মড়া পোড়াতে টাকা?

—না, ঠাকুরমশায় তা কেনে লেবেক। গঙ্গাতীরে, এত পথ যেতে লারবেক।

আশে পাশে আরও কতকগুলি লোক সঞ্চিত হইয়াছিল। গোপাল কহিলেন, ভগবতী চাটুয্যের ছেলেকে তোরা গঙ্গাতীরে নিয়ে যাবি নে—টাকা নিবি?

—না, আমরা কের্ত্তন করবেক—হিঙ্গুলবাঁধেই লেবেক। টাকা লেবেক কেনে?—লোকটা একটু মুখ টিপিয়া হাসিল, অর্থ তাহার সুপরিষ্কার।

—আমার দেহও তোরা নিবিনে গঙ্গাতীরে? টাকা চাইবি? আমার কে টাকা দেবে—

—না, ঠাকুরমশায়। আপনারে মোরা লেবেক!

শশী কোমর সোজা করিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, ঝাঁকা করে মু লিয়ে যাবেক ঠাকুরমশায়—একলাটি লিয়ে যাবেক।

গ্রামের সর্ব্বসাধারণের মনোবৃত্তি দেখিয়া গোপাল স্তম্ভিত হইয়া গেলেন—মৃতের সহিত আজ এরা ঝগড়া করিতে চায়।

*

গোপাল হতাশ হইয়া ফিরিয়া আসিলেন—

অশোকের কানে কথাটা গিয়াছিল—তিনু কথাটা বলিয়া থাকিবে। পিতার দেহ গঙ্গাতীরস্থ করিতে যদি তিরিশ জন লোকও লইয়া

যাইতে হয় তবে পাঁচশত টাকা খরচ। সে আধুনিক শিক্ষিত ছেলে, গঙ্গাস্নানকে কুসংস্কার বলিয়া জানে, গঙ্গাতীর ও হিঙ্গুলবাঁধের মধ্যে তাহার কাছে কোন পার্থক্য নাই। অকারণে একটা কুসংস্কারের বশে পাঁচশত টাকা ব্যয় করাটা একেবারেই নির্বুদ্ধিতা একথা সে জানিত, তাই কহিল, কি হল ঠাকুরমশায় ?

গোপাল ম্লানমুখে কহিলেন, টাকা না হ'লে গঙ্গাতীরে কেউ যাবে না। তবে হিঙ্গুলবাঁধে যেতে সকলেই প্রস্তুত।

অশোক কথা কহিতে জানিত, সে কহিল, বাবা আজ তিরিশ বৎসর ক'লকাতা বাস করেছেন কিন্তু একদিনের জন্যেও গঙ্গায় স্নান করেন নি ? তিনি বলতেন, জন্মস্থানের চেয়ে বড় তীর্থ নেই। গোপালপুরের পাঁকপুকুরে স্নান ক'রলে সেই আমার ত্রিবেণী স্নান। তাই বার বার এখানে ছুটে আসতেন, আমরা বারণ ক'রলেও শুনতেন না—মাঝে মাঝে বলতেন, গোপালপুরের মাটির সঙ্গেই যেন আমি মিশে যাই। তাই মনে হয় বাবার কাছে এই গ্রামের সব ছিল তীর্থক্ষেত্র—তাঁর দেহ এখানে ভস্মে পরিণত হ'য়ে গোপালপুরের মাটির সঙ্গে মিশে গেলেই তাঁর আত্মার বড় তৃপ্তি হবে—

গোপাল অশ্রুপ্লাবিত চোখ মুছিয়া কহিলেন, চাঁদু তাই বলতো!—আহা হা—গ্রামকে সে এত ভালবাসতো! সত্যিই ত জন্মভূমিই সর্ব্ব-তীর্থের সার—ভগবতীর ছেলে এমনি কথা বলবেই ত—ভগবতী গ্রামের জন্যে বুকের রক্ত ঢেলে দিয়েছে—এর একটা গাছের ডাল ছিল যেন তার প্রাণ—

গোপাল আত্মবিস্মৃত ভাবে বসিয়া অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন। বনলতা কহিলেন, গঙ্গাতীর পাবে না ঠাকুরমশায় ?

অশোক জানিত সরিকের টাকা খরচ করাইয়া দিবার একটা অস্ত্ররূপে জেঠাইমা এই হীন প্রস্তাব করিয়াছেন। অশোক তাই

তাড়াতাড়ি কহিল, আমি তাই স্থির ক'রলাম ঠাকুর মশায়। বাবাকে আমি জানি—এই গোপালপুরই তাঁর গঙ্গাতীর, বারাণসী, এখানেই তাঁর চিতাভস্ম, এই মাটির সঙ্গে মিশে গেলেই তাঁর বড় তৃপ্তি হবে—

গোপাল কহিলেন, তাই হোক্ ভাই, তাই হোক্। সার কথা তুমি বুঝেছ, জন্মপল্লীর চেয়ে বড় তীর্থ আর কি ?

অতএব হিঙ্গুলবাঁধেই চাঁদমোহনের শবদাহ করিবার ব্যবস্থা হইল এবং অনতিবিলম্বে পাঁচ ছয়জনের একটি কীর্ত্তনসহ দশ বারজন লোক চাঁদমোহনের দেহ লইয়া গ্রামপ্রান্ত ত্যাগ করিল।

*

সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে—

গোপাল অত্যন্ত ক্লান্তদেহে চণ্ডীতলায় বসিয়াছিলেন—দূরে হিঙ্গুল বনের নীচের বাঁধে চিতা জ্বলিয়াছে—তাহার লেলিহান জিহ্বা বনের শালগাছগুলিকে রক্ত লাল করিয়া তুলিয়াছে। ওখানে ওই গ্রাম-প্রান্তের পরিত্যক্ত জলাশয়ের কর্দ্দমাক্ত তীরে চাঁদমোহনের নশ্বরদেহ ধীরে ধীরে ভস্মীভূত হইতেছিল—

গোপাল চাহিয়া চাহিয়া দেখিতেছিলেন—সেদিনের চাঁহু চলিয়া গেল। তাঁহারও যাইবার সময় আগতপ্রায়—এমনি করিয়া ভালবাসার এই পৃথিবী, এই প্রতিবেশী, এই নিকটতম গ্রাম পরিজনকে ত্যাগ করিয়া তাঁহাকে যাইতে হইবে—পিছনে রহিবে এই পৃথিবী, ভগবানের রচিত পঞ্চভূতের দেহ আবার পঞ্চভূতে লয় পাইবে—

পিছনে রহিয়াছে—চিরপরিচিত কত শত স্মৃতিবিজড়িত এই গ্রাম —কি সুন্দর প্রেমপ্রীতিময় ছিল এই গ্রাম, মানুষ মানুষকে

ভালবাসিত। প্রতিবেশীকে করিয়া লইয়া ছিল পরমাত্মীয়, মানুষ ছিল সকলের জন্যে, সে ছিল সমাজের একজন, গ্রামের একজন—আজ তাহারা শুধু নিজেই আছে, চারিপাশের সকলে দূর হইতে সুদূরে চলিয়া গিয়াছে। কোথা হইতে কেমন করিয়া এক দানবীয় শক্তি আসিয়া অন্নবস্ত্র ঘুচাইল, মনের প্রেমপ্রীতি কর্ত্তব্য ভুলাইল—মানুষকে চিনাইল শুধু পশুর মত আহার ও বিহার—মানুষের পৃথিবীকে করিল শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্য···মানুষ হইয়া যদি মানুষকেই আপনার করিতে না পারিল—মানুষকে খাওয়াইয়া, ভালবাসিয়া, সেবা করিয়া যদি তৃপ্তি না পাইল তবে সে মানব জীবনের মূল্য কি? এই সমাজ এই জনশ্রেণী চলিয়াছে কোথায়? কি চাহে তারা জীবনে···

মনে পড়ে ভগবতীর কথা—গ্রামের সকলে ছিল তার বৃহৎ পরিবার-ভুক্ত, কাহারও দুঃখ দূর করিতে সে পশ্চাদপদ হয় নাই। সে ছিল শাসক, পালক—তার মৃত্যুর দিনটি আজও মনে পড়ে, পাড়ায় পাড়ায় উঠিয়াছিল ক্রন্দনের রোল, গ্রাম যেন সেদিন পিতৃহীন হইয়া ব্যাকুল ক্রন্দনে দিগন্ত পর্য্যন্ত বেদনাতুর করিয়া তুলিয়াছিল। যেদিন ছোটলোক পাড়ায় আগুন লাগিয়া সব পুড়িয়া গেল সেদিন ভগবতীর মুখে ফুটিয়া উঠিয়াছিল কি অপরিসীম বেদনা! সে আপনার সমস্ত সঞ্চয় নিঃশেষে বিলাইয়া দিল বসন্তসায়রের গৃহহীন লোকগুলির জন্য—তার মৃতদেহ লইয়া গিয়াছিল সহস্র লোক, অনুরোধ করিয়াও কাহাকে প্রতিনিবৃত্ত করা যায় নাই—আর আজ তাহারই পুত্রের মৃতদেহ দগ্ধ হইতেছে হিঙ্গুলবাঁধের পাড়ে। ভাড়াটিয়া লোকে কীর্ত্তন করিতেছে—লোকে চাহিয়াছে টাকা—ওর মৃত্যুর সুযোগে তারা উপার্জ্জন করিতে চাহিয়াছে। কি নির্ম্মম মানুষ—কি স্বার্থপর হইয়াছে ওদের অন্তর—অথচ দেখিতে দেখিতে এতবড় একটা পরিবর্ত্তন হইয়া গেল। সমগ্র দেশটা যেন নতুন

শিক্ষার উগ্র নেশায় মাতিয়া উঠিয়াছে। মদ্যপায়ীর মত হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া গিয়াছে নেশার উন্মাদনায়—

ভাবিতে ভাবিতে গোপাল ব্যাকুলভাবে মনে মনে কহিলেন, মা—মা চণ্ডী, আমাকে ত যথেষ্টই দেখালে, আর কেন? এইবার কোলে নাও—সাথী সকলে চলিয়া গেল, এই পশুর রাজ্যে আমাকে কেন ফেলিয়া রাখিলে? করুণাময়ী মা—তোমার চরণে স্থান দাও মা—

গোপাল অশ্রুচোখে চাহিয়া দেখিলেন—হিঙ্গুলবাঁধের নীচে, চিতার আগুন তখন মন্দীভূত হইয়া আসিয়াছে। বাউরীপাড়া হইতে মাদল ও বাঁশীর আওয়াজ ভাসিয়া আসিতেছে—নিত্য যেমন আসে—আজও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। সন্ধ্যায় মদ্যপানান্তে নৃত্য ও গীত চলিতেছে—আপনার আনন্দে।

গোপাল কহিলেন, মা জগদম্বা—মা—তোমার পায়ে স্থান দাও মা—দেখবার সাধ আমার মিটেছে—

বহুদিন পরের কথা—

দুইটি মহাযুদ্ধের অবশ্যম্ভাবী ফলরূপে পৃথিবীর মানচিত্রের বহু রং ও রেখার পরিবর্ত্তন হইয়াছে—পৃথিবীর চেহারা বদলাইয়াছে। পুরাতন দেশ মিলাইয়া গিয়াছে, নতুন দেশ সৃষ্টি হইয়াছে—দেশ বিভক্ত হইয়াছে, প্রবল ভূকম্পনে যেমন দেশের মৃত্তিকা বদলাইয়া যায়, পর্ব্বত উঠে, দেশ জলে ডুবিয়া যায়, তেমনি মহাযুদ্ধের প্রকম্পনে-পৃথিবী বদলাইয়াছে—

সঙ্গে সঙ্গে বদলাইয়াছে মানুষের চেহারা, মানুষের মনের চেহারা, চিন্তাধারা, আদর্শ, চলিবার, বলিবার ভঙ্গি, শীল, আচার, তাহার সঙ্গে জীবনের দৃষ্টি ভঙ্গি। মানুষের সম্পদেই দেশের সম্পদ, দেশের সম্পদ বাণিজ্য—বাণিজ্যক্ষেত্র লইয়া কাড়াকাড়ি মারামারি। কে কাহার রক্ত শোষণ করিবে তাহা লইয়া চলিতেছে বুদ্ধির প্রতিযোগিতা, বাকচাতুর্য্যে অনিষ্টকে ইষ্ট করিয়া তুলিয়াছে তীক্ষ্ণধী লোকজন। একদিন ছিল, যেদিন মানুষের পরিমাপ ছিল সততায়, চরিত্রে, উদারতায়, প্রেমে, শীলআচারে—আজ তাহার পরিমাপের যন্ত্র অর্থ—দেশের পরিমাপের যন্ত্র তার সম্পদ। শোষণেই তাহার শৌর্য্য, মঙ্গলের-শক্তিহীনতাই আধুনিকতার সংস্কৃতি। পিতামাতা ছিল দেবতা, আজ তাহারা হইয়াছে দুর্ব্বহ বোঝা—পুত্র লালন তাহার কর্ত্তব্য, যেহেতু নেহাত কামনা-প্রসূত তার পুত্র, তাই পুত্রের কোন কর্ত্তব্য নাই পিতার প্রতি। টাকার অঙ্কে টাকার মূল্যের বাঁধাধরা প্রাচীরের মাঝে রুদ্ধ হইয়াছে মানব জীবন। তাহার উর্দ্ধে, তাহার বাহিরে আর কিছুই নাই—সততা আজ উপহাসের বস্তু, বোকামীর নামান্তর, চরিত্র ভীরুতার পরিচায়ক। নিজে ছাড়া পৃথিবীতে কেহই নাই, কাহারও প্রতি কর্ত্তব্যও নাই। প্রেম-প্রীতি

ত্যাগহীন নিরস বুভুক্ষু পৃথিবীর পানে চাহিয়া যাহারা অশ্রুমোচন করে তাহারা সেকেলে, প্রাগৈতিহাসিক প্রাণী।

পৃথিবীর রং বদলাইয়াছে—বদলাইয়াছে মানুষের চেহারা, তাহার মনের রং—

*

আমাদের গোপালপুরের রংও বদলাইয়াছে, মানুষের চেহারা পাল্টাইয়াছে—মনেরও রং বদলাইয়াছে—

গোপালপুরের অদূরে একটা এরোড্রোম তৈয়ারী হইয়াছিল যুদ্ধের সময়—তখন আসিল দুর্ভিক্ষ। বাউরী মেয়েরা দলে দলে সেখানে গিয়াছিল কাজ করিতে—তাহারা মাটি কাটিত, কাঁকর কুড়াইয়া জীবিকা অর্জ্জন করিত। আমেরিকান সাহেবেরা যথেষ্ট সহৃদয়তার সঙ্গে তাহাদিগকে অর্থ ও খাদ্য দিয়াছিল—তাহার সঙ্গে দিয়াছিল সুন্দর ফুট-ফুটে ছেলে মেয়ে—তাই তাদের অনেককে আজ আর বাউরী বলিয়া চেনা যায় না। তাহাদের দেহের রংও বদলাইয়াছে—এমনি করিয়া আরও অনেক রংও বদলাইয়াছে—

ভগবতী চাটুয্যের কাছারী ও মণ্ডপের উপর জন্মিয়াছে অশ্বত্থবৃক্ষ—একপাশের প্রাচীর ফাটিয়া চৌচির হইয়াছে, কিন্তু বৃক্ষের মূলের আকর্ষণে দাঁড়াইয়া আছে। সেখানে বাস করে শত শত বন্য পারাবত—তাহাদের ত্যক্ত মলমূত্রে স্থানটা দুর্গন্ধময়। চণ্ডীমণ্ডপের কিয়দংশ ঘিরিয়া হইয়াছে কাছারীবাড়ী—সেখানে সরকার ও পেয়াদা থাকে। চাঁদমোহনের পরে অশোক বালীগঞ্জে বাড়ী করিয়াছিল, অশোকও গত হইয়াছে, তাহার বৃদ্ধা স্ত্রী এখনও জীবিত। ব্লাড-প্রেসারের রোগিণী, জ্যেষ্ঠ পুত্র ব্যবসায় দেখে, দ্বিতীয় পুত্র ডাক্তারী পাশ করিয়া বিলাত গিয়াছে, কন্যা নীলা কলেজে পড়ে—ছোট ভাই কাঞ্চনও কলেজে পড়ে—

শশধরের দুই পুত্র বিদেশে চাকুরী করিত, তাহাদের মধ্যে এক ভাই শহরে উকিল হইয়া সেখানে বাড়ী করিয়াছিল, তাহার বংশধররা সেখানেই থাকে। অন্য ভাই বাড়ীটা রক্ষা করিবার একটা দুরূহ আশা লইয়া জীবনে অশেষ দুর্গতি বরণ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র যথেষ্ট শিক্ষা না পাইয়া গোপালপুরের ভগ্নজীর্ণ বাড়ীতে এখনও বাস করে। ভগবতী চাটুয্যের জমিদারীর দুই আনা অংশের মালিক সে এবং জীর্ণ গোপালপুরের তথাকথিত জমিদার তিনিই—অর্থাৎ শিবশঙ্করবাবু।

*

গোপালপুর গ্রাম আজ ছিন্ন ভিন্ন—

মাঝে মাঝে পোড়ো বাড়ী, সর্প শ্বাপদসঙ্কুল। ব্রাহ্মণ-পাড়ায় বহু বাড়ী তালাবন্ধ এবং পরিত্যক্ত—যাহারা শিক্ষিত ও কিছু ক্ষমতাসম্পন্ন তাহারা বিদেশে থাকিয়া চাকুরী করে, একান্তই অশিক্ষিত ও অক্ষম যাহারা তাহারা বাড়ীতে বসিয়া, জমির ধান দেখাশোনা করে—এবং কোন মতে দিন গুজরাণ করে। তিলি তাম্বুলী পাড়ার বহু অংশ পরিত্যক্ত, কেহ চাষ করে, কেহ চাকর বা সরকারের চাকুরী করে। তাঁতি-কলুদের যে অংশ এখনও গ্রামে আছে তাহারা নানারূপ ভাবে উপার্জ্জন করিয়া দিন গুজরাণ করে। বাগ্দী বাউরী পাড়ায় অনেকে কাজে চলিয়া গিয়াছে—যেমন করিয়া বলাই গিয়াছিল।

গ্রামে ইউনিয়ন বোর্ড হইয়াছে, সারদা মল্লিকের এক বংশধর এখন প্রেসিডেণ্ট, তাহাতেই যাহা হয় তাহাতে সংসার চলে। সরকারী লোক আসিলে তাহার আদর আপ্যায়নের খরচাটাও হয়। সম্প্রতি রমেশ মল্লিক অর্থাৎ প্রেসিডেণ্টবাবুর নিকটে কতকগুলি গাছ আসিয়াছে

সেগুলি লাগাইতে হইবে। সরকারী হুকুম, বন-মহোৎসব করিতে হইবে—গাছ বড় হইলে দেশে আর অনাবৃষ্টি হইবে না।

তিনি সেক্রেটারী ওরফে কেরাণীবাবুকে কহিলেন, গাছগুলো যেখানে হয় পুঁতে ফেলুন। খাঁচা হিসাব করে ধরে দাও—সরকারের মাথা খারাপ, গাছ পুঁতলে বৃষ্টি হবে ?

দুই চার দিন পরে গাছ লাগান হইল কিন্তু খাঁচা দেওয়া হইল না। গাছ গরুতে খাইয়া বন-মহোৎসব সমাপ্ত করিয়া দিল। মতি ঠাকুরের আমলে লোকে বৃক্ষরোপণ করিত পুণ্যের মোহে, দুরন্ত বৈশাখে বনস্পতির মূলে জল সেচন করিত গ্রাম্য বধূগণ—সামাজিক কর্ত্তব্য হিসাবে। মতি ঠাকুর বিধান দিতেন—বৃক্ষরোপণ ও রক্ষণ করিতে হইবে।

গ্রামে বনস্পতিগুলির ডাল কাটিয়া তাহাকে বহুপূর্ব্বেই নির্মূল করা হইয়াছে—সমগ্র গ্রাম খাঁ খাঁ করে, ছায়াহীন নিরস প্রস্তরময় ভূখণ্ড।

কেবলমাত্র চণ্ডীতলায় বৃহৎ বটবৃক্ষ দাঁড়াইয়া আছে—তাহার শাখাপ্রশাখা সবই অটুট আছে এমন নয়—তবুও এখনও আছে—বাগ্দীপাড়ায় নটবরের এক বংশধর সেখানে বসিয়া গরু ছাড়িয়া দিয়াছে, গরুগুলি ইতস্ততঃ ঘুরিয়া খাইতেছে। পরণে তাহার একটা হাফ্ প্যাণ্ট হাতে পাচনী—চণ্ডীতলায় বসিয়া সে বাঁশী বাজাইতেছিল। বন-মহোৎসবের কয়েকটি গাছ তখনও বাঁচিয়াছিল এবং নূতন বর্ষণে নতুন পাতা গজাইয়াছিল। কয়েকটি গরু সেগুলি নির্ম্মূল করিয়া খাইল, ছেলেটা বসিয়া দেখিল কিন্তু কিছুই বলিল না। গরুগুলি ধীরে ধীরে সামনের ধানের জমিতে নামিল, ছেলেটা একবার পিছন ফিরিয়া দেখিল—কেহ আসিতেছে কিনা তাহার পর আবার বাঁশী বাজাইতে লাগিল।

বোর্ডের কেরাণীবাবুকে দেখিয়া সে ছুটিয়া গেল গরু তাড়াইতে। কেরাণীবাবু কহিলেন, হ্যাঁরে, বসে বসে সরকারী গাছগুলি গরু দিয়ে খাওয়ালি ?

—না বাবু, মোর গরুতে খাবেক কেনে—ও ত বহুদিন আগে সব গরুতে মিলে খাওয়া করলেক—

কেরাণীবাবু কহিলেন, হ্যাঁ, আমি দেখিনি ভাবছিস্, আচ্ছা।

উভয়েরই কর্ত্তব্য সমাপ্ত হইয়া গেল—এই তুচ্ছ ব্যাপার লইয়া আর কেহই মাথা ঘামাইল না।

*

গোপাল ঠাকুরের পুত্র ভোলানাথ আজ বৃদ্ধ—তিনিই পূজাপার্ব্বণ যজমান রক্ষা করেন। একটি পুত্র ইংরাজি শিখিয়া খাদে কাজ করে, আর একটি উকিল হইয়াছে। তাহাদের অবস্থার পরিবর্ত্তন না হইয়াছে এমন নয়, তবে দুই পুত্রই সস্ত্রীক বিদেশে থাকে; ভোলা ঠাকুর সস্ত্রীক গ্রামেই থাকেন।

পলাশডাঙ্গার রাধামোহন চক্রবর্ত্তীর মাতৃশ্রাদ্ধ। রাধামোহন সকালে আসিয়া ভোলা ঠাকুরের নিকট উপস্থিত হইলেন। রাধামোহন বিদেশে ভাল চাকরী করেন—শ্রাদ্ধ উপলক্ষে বাড়ীতে আসিয়াছেন। তাহার মা ও বিধবা ভগ্নী বাড়ীতেই থাকিতেন। রাধামোহন শুষ্ক নমস্কার করিয়া কহিলেন, ঠাকুরমশায়, শুনেছেন বোধ হয়, আমার দাদার কথা—

ভোলা কহিলেন, না, কি?

—তিনি আস্তে পারবেন না, বাসাবাড়ীতেই তিনি তাঁর মত শ্রাদ্ধ-শান্তি করবেন। এখন মাতৃদায়টা এসে পড়েছে আমারই ঘাড়ে—

ভোলা ঠাকুর এ সকল কথাই জানেন, কথা না বাড়াইয়া কহিলেন, যেমন পারবে তেমনি ক'রবে তার আবার কি আছে?

—তাই করবো, কিন্তু লোকে কিছু ব'লবে শেষে—

—তাতে তোমার কি? সে সব শুন্তে গেলে চল্বে কেন?

বাসায় চলে যাবে, তখন আর কানে ওসব কথা প্রবেশই করবে না। আর তুমিও বাসায় কাজটা করলেই চুকে যেত—তুমিই বা বোকার মত ছুটি পেতে গেলে কেন?

রাধামোহন হাসিলেন, কহিলেন, ঠিকই বলেছেন। ফর্দ্দটা ধরুন তা হ'লে—

—পাঁজিটা খোলো ধরাই আছে। ষোড়শ, বৃষোৎসর্গ সবই আছে। যা ক'রবে দেখে নাও—

—আমার ত বেশী সাধ্য নেই, সংক্ষেপে যা হয়—

—গরীব বড়লোক সকলেই সংক্ষেপে করে। তাতে মনে করবার কি আছে?

যাহা হউক সংক্ষেপ একটা ফর্দ্দ ধরা হইল। রাধামোহন কহিলেন, এত কাপড়, বাসনপত্র কিন্‌বো কি করে? এ ত সাধ্যাতীত—

ভোলা কহিলেন, তারও সংক্ষেপ আছে, অর্দ্ধেক মূল্য দিলে সবই ভাড়া দিতে পারি।

রাধামোহন কহিলেন, অর্দ্ধেক?

—হ্যাঁ, সেদিন ত নেই যে লোকে এমনি দেবে। শুনেছি বাবার আমলে ছিল। এখন কন্যাদায়, পিতৃদায়, মাতৃদায়ে না ঠেকলে কেউ কিছু দেয় না। কাজেই আমরা ঠেকলেই তবে পাই—বুঝলে ত?

—তবুও অর্দ্ধেক?

—কারণ, দায়টা মানুষের নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার নয়, কচিৎ কদাচিৎ ঘটে কিন্তু পুরোহিতের পেটটা নিত্যনৈমিত্তিক। দক্ষিণাটাও তাই দশটি টাকা দিতে হবে—কারণ আর ত দেবে না। এক যদি ছেলেমেয়ের বিয়েতে হয়—তাও ত বাসায় হবে।

—ঠাকুরমশায় কেবল নিজের দিকেই চেয়ে বললেন, আমার দিকে একটু চাইলেন না?

ভোলা ঠাকুর বলিলেন, হ্যাঁ বাবা, তুমি ত বৌমাকে নিয়ে বাসায় থেকে সিনেমা থিয়েটার দেখেছ, গয়না শাড়ীতে বাক্স বোঝাই করেছ, এদিকে তোমার মা বোন অশেষ দুর্গতিতে দিন কাটিয়েছে—তুমি কি তাদের দিকে তাকিয়েছ? মরার পরে না হয় একটু তাকাও, আর এ জগতে এখন কে কার দিকে তাকায় বল? সে অবশ্য ছিল সেকালে —শুনেছি বাবার মুখে—

রাধামোহন মুখগোঁজ করিয়া বসিয়া রহিলেন এবং স্বার্থপর এই বুড়া বামুনঠাকুরটির প্রতি নিষ্ফল আক্রোশে ফোঁপাইতে লাগিলেন।

*

একদিন নূতন সভ্যতার আকর্ষণে যে বীজ উপ্ত হইয়াছিল আজ তাহা মহীরুহে পরিণত হইয়াছে। মনের বিস্তৃতি ও ব্যাপ্তিই ছিল সভ্যতার মাপকাঠি—আজ অর্থ ও সম্পদই হইয়াছে সভ্যতার পরিমাপ—মানুষ কেবল চিনিয়াছে নিজের স্বার্থ। বড় হইবার নামে, শক্তি অর্জ্জনের নামে সে হইয়া উঠিয়াছে আত্মকেন্দ্রিক—নিজে সে চায় বড় হইতে, কিন্তু বড় করিতে চায় না, সে বড় হয় অন্যকে হত্যা করিয়া, অন্যকে দুর্ভাগ্যের মধ্যে ঠেলিয়া দিয়া। তাহার শক্তি গড়িয়া উঠে শোষণের জন্য—মঙ্গলের জন্য নয়।

গ্রামে গ্রামে তাই ইউনিয়ন বোর্ড ও কখনও কখনও স্কুল লইয়া চলে গ্রাম্য রাজনীতি, বিভক্ত বিচ্ছিন্ন জনগণ সামগ্রিক কল্যাণকে ভুলিয়া হানাহানি করে, দুইজনের মধ্যে মামলা বাধাইয়া দিয়া একজন তদ্বির করিবার নামে উপার্জ্জন করে—সেবার পরিবর্ত্তে স্বায়ত্তশাসন কেবল-মাত্র শোষণের প্রতীক মাত্র। রমেশ মল্লিক ও শিবশঙ্কর তাই আজ গ্রামের মধ্যে নেতা—বিভক্ত জনশ্রেণীকে লইয়া তাহারা ছিনিমিনি খেলেন।

*

গ্রামে একটি স্কুল স্থাপিত হইয়াছিল, ছেলেরা বৈকালে মাঠ হইতে ফুটবল খেলিয়া ফিরিবার পথে গ্রামের তেমাথায় অবস্থিত ইন্দারার পাড়ে বসিয়া আড্ডা দেয়। আড্ডার প্রধান অঙ্গ শিক্ষকদিগের সমালোচনা—তামুলীদের বিনোদ অঙ্গভঙ্গি করিয়া পণ্ডিতমহাশয়ের নাকি স্থর ও অঙ্কের শিক্ষক কমলবাবুর পড়ান দেখায়, ছেলেরা হাসিয়া গড়াগড়ি দেয়—পরীক্ষার পরে আজ সভা হইতেছিল—বিনোদ নকল করিবার সময় ধরা পড়িয়াছে তাই সে ক্ষুব্ধ ও রাগান্বিতভাবে বলিল, হরিবাবুর বকের ঠ্যাং ভেঙ্গে দেব। বকের মত এসে খপ্‌ করে ধরলে—কেন বড়বাবুর ছেলেও ত নকল ক'রলে তাকে ধরলে না?

আর একজন বুদ্ধিমান ছেলে কহিল, তাকে ধরবে কেন? বড়বাবু মাসে মাসে পনর টাকা দেন—সব কোশ্চেন বলে দিয়েছে ঐ বকটা, নইলে শিবু ফার্ষ্ট হ'তে পারে?

ছাত্রগণের নিজেদের বৈশিষ্ট্য ও শিক্ষকগণের প্রতি অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা যখন ভাষার মাধ্যমে প্রায় গগনস্পর্শী হইয়া উঠিয়াছে তখন আকস্মিকভাবে ভোলা ঠাকুর মশায় সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং আলোচনার কিয়দংশ তাঁহার কানে যাইতেই তিনি কহিলেন, হ্যাঁরে বিনোদ, শিক্ষক গুরু, তাঁর সম্বন্ধে অমনি সব কথা উচ্চারণ করতে আছে। ছি ছি, তোমরা ছাত্র, লেখাপড়া শিখছ—

ছাত্রগণ হাসিয়া উঠিল—যেন ভোলা ঠাকুরের এই কথাটা সত্যই হাস্যকর।

ভোলা ঠাকুর কহিলেন, গুরুর সমালোচনা করতে নেই, শাস্ত্রে আছে—এক অক্ষর যিনি শেখান, তার ঋণ জীবনে শোধ করা যায় না—

বিনোদ ক্রুদ্ধ হইয়াছিল, সে কহিল, শিক্ষক গুরু আবার কে? টাকা নিচ্ছে, পড়াচ্ছে, তার আবার ঋণ কি! পেটের দায়ে পড়াচ্ছে—আমরাও পেটের দায়ের জন্য পড়ছি।

—তবুও ন্যায় অন্যায় আছে ত। শ্রদ্ধা না থাকৃলে শিক্ষা হয় না। সেটা তোমাদের স্বার্থে-ই দরকার।

—লেখাপড়া করে কি হবে? কোনমতে পাশ করতে পারলেই চাকুরী হয়। সতীশবাবুও ত নকল করে পাশ করেছিল—কত টাকা রোজগার করছে। আর ফার্ষ্ট হ'য়েছিল সেবার নরেনবাবু—উপোস ক'রছে।

—তবুও নকল করাটা অন্যায় ত?

বিনোদ হিহি করিয়া হাসিয়া কহিল, যার দ্বারা টাকা হয়, সেইটেই ন্যায়। নকল ত সকলেই করে—আর আমরা করলেই দোষ বুঝি। মাষ্টাররা প্রাইভেট ছাত্রকে কোশ্চেন বলে দেয় যে! মরতে মরণ গরীবদের—টাকা থাকৃলে সব হয়—

ভোলা ঠাকুর কি উত্তর দিবেন ভাবিয়া পাইলেন না—পৃথিবীর এতটা পরিবর্ত্তন হইয়াছে তাহা বোধ হয় তিনিও ধারণা করিতে পারেন নাই, তাই নির্ব্বাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। ছেলেরা আর একবার সমবেত হাসিতে তাহাকে পরাজিত করিয়া দিয়া চলিয়া গেল। ভোলা ঠাকুর দাঁড়াইয়া ভাবিলেন তাহার পিতার কথা। তিনি পৃথিবীর পানে চাহিয়া নীরবে কেবল অশ্রু মোচন করিতেন এবং নিষ্ফল ক্রোধে তাহাদিগকে কটুবাক্য বলিতেন।

*

কিঙ্কর বাগ্দী শীতের সন্ধ্যায় আগুনের হাঁড়ি ও কাঁথা লইয়া মাঠে যাইতেছিল। কুঁড়েতে থাকিয়া রাত্রিতে কাটা ধান পাহারা দিতে হইবে।

কিছুকাল পূর্ব্বেও মাঠের ধান চুরি যাইত না কিন্তু আজ কয়েক বৎসর রাতারাতি মাঠের কাটা ধান কাহারা চুরি করিয়া লইয়া যায়। প্রত্যেক মাঠেই দুই চারিখানি কুঁড়ে রাখা হইয়াছে এবং রাত্রিতে তাহারা ধান পাহারা দেয়।

কিঙ্কর যাইবার সময় একটা বস্তা কাঁথার মাঝে জড়াইয়া লইয়া স্ত্রীকে কহিল, তু দেড় পহর পরে যাবি, চরণ সঙ্গে যাবেক, বুঝলি—

—মু যাবেক কেনে, তু লিয়ে আস্‌বি।

—না, বাবু চৌকীদার রাখা করালেক, জানছিস না—

কিঙ্কর মাঠের কুঁড়েয় চলিয়া গেল। সেখানে আশপাশের কুঁড়ের দুই একজন সমবেত হইয়া পঁচুই পান ও আগুন পোহান শেষ হইলে যে যাহার কুঁড়েয় ফিরিয়া গেল। কিঙ্কর ধীরে ধীরে মাঠে নামিল—

কাঁদোড়ের ওপারে একটু দূরে একটা অর্জ্জুন গাছ, তাহার তলায় বসিয়া পা দিয়া ধান মাড়াইয়া বস্তাবন্দী করিল অত্যন্ত নিঃশব্দে। ধানের আঁটি কয়েকটা ইতস্তত ফেলিয়া দিয়া চলিয়া আসিল। কার্য্য সমাপনান্তে একবার উচ্চকণ্ঠে হাঁক দিল—

অন্যান্য কুঁড়ে হইতে সকলে হাঁকিয়া জানাইল তাহারা জাগিয়া আছে। গভীর নিশীথের অন্ধকারে কিঙ্করের স্ত্রী-পুত্র চরণকে সঙ্গে লইয়া আসিল এবং ধান লইয়া বাড়ীতে চলিয়া গেল।

*

গভীর রাত্রে চৌকীদার যাইয়া প্রেসিডেণ্ট রমেশবাবুকে হাঁকিল— বাবু বাবু—

রমেশ মল্লিক বাহির হইয়া আসিলেন, এ ডাকের অর্থ তিনি জানেন। তিনি মৃদুকণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন—কি রে পঞ্চা—

পঞ্চানন চৌকিদার কহিল, বাবু, এই ধান চোর নিয়ে এসেছি। একেবারে হাতে নাতে ধরা মাঠ থেকে নিয়ে যাচ্ছে কাটা ধানের আঁটি—

রমেশ লণ্ঠন আনিয়া কহিলেন, বোঝাটা ফেল দেখি—কে তুই।

চোর বোঝাটা ধপাস্ করিয়া ফেলিল। রমেশ কহিলেন, ও তুই, সুন্দর—এ কাজ ক'র্‌ছিস্—

—আজ্ঞে পেটের দায়, কি ক'রবেক। আপনি হুজুর মা বাপ্—এইবারটি ছেড়ে দেন—আর ক'রবেক নাই—

—আর বছরেও ত তাই বলেছিলি, তা ছেড়েছিস্ কই—

—এজ্ঞে হুজুর—কপাল মোর মন্দ বটেক—সকলেই করলেক হুজুর ধরা পড়লেক সুন্দর—কপাল হুজুর—ছাড় করবে হুজুর—

—যা পনর টাকা নিয়ে আয়, ছেড়ে দিচ্ছি—নইলে গ্রামের মানুষ ডেকে দেখিয়ে দেব—হাল বন্ধ হয়ে যাবে—

—পনর টাকা কোথা পাবেক হুজুর—

—ধান বেচে কত পেয়েছ সেদিন বাপু, কথা বল্‌বিনি, নিয়ে আয়।

—কাল দেবেক হুজুর, রাতারাতি ধানমাড়া করাবেক ত? ভোর হ'লে ত ধরা পড়বেক হুজুর—

—তা ত, ধরা পড়বিই, শিগগির টাকা নিয়ে আয়।

—পনর টাকা।

—হ্যাঁ, ধান ত আমার মাঠেও চুরি যাচ্ছে, সেটা পুষিয়ে নিতে হবে ত? ওদিকে গেল, এদিকে আসুক—যা শিগগির—

সুন্দর বাউরী দ্রুত বাড়ী চলিয়া গেল এবং পনর টাকা আনিয়া দিল। রমেশ কহিলেন, পঞ্চা বোঝাটা তুলে দে।

পঞ্চা ধানের বোঝাটা তুলিয়া দিল—সুন্দর চলিয়া গেল। রমেশবাবু ঘরে ঢুকিতেছেন দেখিয়া পঞ্চা মৃদুকণ্ঠে ডাকিল—বাবু—বাবু—

রমেশ বিরক্ত হইয়া ফিরিয়া কহিলেন—এই নে। কাল সকালে নিলে আর হ'ত না। আমি খেয়ে ফেলতুম—

পঞ্চা সাগ্রহে আগাইয়া আসিয়া পাঁচ টাকার নোটখানি হাতে করিয়া কহিল, কাজ নগদানগদিই ভাল বটেক—রাতের পাওনা রাতেই ঘরে ঢোকা করাই ভাল বাবু—

রমেশ কহিলেন, যা ব্যাটা, ভাল করে পাহারা দে, তুই একটা না ধরলে চলবে না। কাল আবার মামলাটা রয়েছে—

*

পরদিন সকালে উঠিয়া শিবশঙ্কর রমেশকে ডাকিয়া কহিলেন, ওহে প্রেসিডেণ্ট, একটু দেখাশোনা কর, মাঠের ধান যে সব চোরেই নিলে। চৌকীদাররা কি নাকে তেল দিয়ে ঘুমুচ্ছে—

রমেশ কহিল, কি করবো বড়বাবু! মাঠে যত পাহারা বাড়ছে ততই চুরি বাড়ছে। এ চুরি কে ঠেকাবে—

—তাইত চিরদিন হয়, কুঁড়ে করা মানেই আর এক ঘর চোর পত্তন করা। কিন্তু এত চুরি ত হয় না কোন বছর—

রমেশ একটু চিন্তা করিয়া কহিল, আপনার ধান চুরি গিয়েছে নাকি? আপনার ধান চুরি গেলে ত বড় কঠিন কথা—

—এখনও যায় নি, তবে যাওয়ার বিচিত্র কি? যে কোনদিনই যাবে—

রমেশ একটু হাসিয়া কহিলেন, কিষাণদের আর পাহারা দিতে পাঠাবেন না—ও বেটারাই চোর। আলাদা লোক একজন রাখুন—আর চৌকীদারকে বলে দেব, দক্ষিণ মাঠটা যাতে দেখে ভাল করে।

শিবশঙ্কর কহিলেন, লোক রেখে আর কি হবে বল রমেশ।

ভগবানের হাতেই ছেড়ে দি—তবে আমার ধান চুরি গেলে আমি কিন্তু ছাড়বো না—

রমেশ কহিলেন, আচ্ছা, আমি ভাল করে পাহারার ব্যবস্থা করছি, যাতে চুরি না যায়—একটা চৌকীদার যাতে ওদিকে থাকে।

বড়বাবু হাসিয়া কহিলেন, কিষাণরা অর্দ্ধেক ভাগের জন্য সব জোট পাকিয়েছিল, সেটা ত ভেঙ্গে দেওয়া গেল—কিন্তু ভাগ ত শেষ পর্য্যন্ত আধাআধিই করে ফেললে দেখছি—

—তাইত দেখছি। রাতারাতিই সব ভাগ সমান সমান করে নিলে দেখছি।

—যাক্, এখন যার যার ভাগটা সাম্‌লে রাখতে পারলেই হয়, সেদিকে একটু চোখ দিও—

—হ্যাঁ, আখেরের ভাগ কি যাবার বড়বাবু। সকলের ভাগ সকলেই যদি চুরি করে তবে গড়পড়তা ভাগটা সমানই থেকে যায়—বুঝলেন ত? রমেশ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

*

চাষা ও বাউরীদের একটা ফৌজদারী চলিতেছিল—রমেশবাবুকে তাহার তদ্বির করিতে কাল সদরে যাইতে হইবে তাই রাত্রিতে কাগজপত্র দেখিতেছিলেন। তিনি চাষাদের পক্ষের—অতএব তাহাদেরই কাগজ দেখিতেছিলেন এমন সময় পুত্র আসিয়া সংবাদ দিল—বাবা, হেডমাষ্টার আমাকে ফেল করিয়ে দিয়েছে!

রমেশ কহিলেন, কেন?

—নকল করেছিলাম বলে, নইলে সব বিষয়ে পাশ করেছি—

নকল করতে গেলি কেন?

পুত্র পাড়ার আরও পাঁচ ছয়টি ছেলের নাম করিয়া কহিল, ওরাও ত নকল করেছে—

—তারা ফেল করেছে—

—না তারা ত ধরা পড়ে নি—

—তুই ধরা পড়তে গেলি কেন ?

—মাষ্টার তাদের ধরলে না—তার আমি কি ক'রবো—

—তা এখন আমি কি ক'রবো ?

স্ত্রী দরজার আড়ালে দাঁড়াইয়াছিলেন, তিনি কহিলেন, তাই বলে ছেলে ফেল ক'রবে ? ছেলেমানুষ তাই ধরা পড়েছে, ওরা পাকা, ধরা পড়েনি—

রমেশ হাসিয়া কহিলেন, চোরের ত সাজা হয় না, ধরা পড়ারই ত সাজা হয়।

—তুমি একবার হেড মাষ্টারকে বল, ছেলেমানুষ ক'রে ফেলেছে—

—তুমি জানো না, এ হেড মাষ্টারটা ভারি পাজি, কারও কথা শোনে না। ভদ্রলোকের অনুরোধ শোনে না—

—তবে আর তুমি কি করলে ? কথাই যদি না শুন্‌লে সকলে—

—আচ্ছা দেখবো বলে। কিন্তু ও বেকুবটা কি করে খাবে, লেখাপড়া শিখেই বা কি হবে ওর—আমার ছেলে হয়ে কিনা বল্‌ছে এসে ধরা পড়েছি—কুলাঙ্গার একটা জন্মেছে এসে—

পুত্র কহিল, তুমি গেলে প্রমোশন দেবে বলেছে—

স্ত্রী কহিলেন, একবার যাও, ছেলেটা কাঁদছে—

—আচ্ছা যাবো'খন, তবে কথা রাখবে মনে হয় না।

পুত্র কহিল, হরির বাবা ব'লতেই তার প্রমোশন হ'য়েছে ত, সেও ত ধরা পড়েছিল।

—বড়বাবু গিয়েছিলেন ?

স্ত্রী কহিলেন, সকলেই যায়, গেলেই প্রমোশন হয়। মাষ্টার আবার কথা শুন্‌বে না তাও কি হয় কখনও? ছেলে মানুষ—করে ফেলেছে—ওরাই ভারতের ভবিষ্যৎ নাগরিক।

*

আতুরীর কন্যা সরোজের একটি সুন্দরী মেয়ে হইয়াছিল—পাড়েজির মত টুক্‌টুকে ছিল তার গায়ের রং। তাহার একটি কন্যা হইয়াছিল আরও সুন্দরী, মিস্ত্রী কৃপাল সিংএর মত নাক মুখ তার, রংও উজ্জ্বল গৌর। মেয়েটির নাম ছিল সুন্দরী—কুলির ধাওড়ায় সে লালিতপালিত হইয়াছিল, কিন্তু যে যাইত সেই একবার অবিশ্বাসের সহিত চাহিয়া দেখিত—এমন সুন্দরী মেয়ে কুলির ধাওড়ায় আসিল কি করিয়া? সুন্দরী যখন ষোড়শী হইল তখন ম্যানেজারবাবুও কুলির গৃহে পদধূলি দিয়াছেন—এমন কি ফিরিঙ্গি ইলেকট্রীকবাবুও আসিয়াছেন। সুন্দরীর অঙ্গে ছিল সোনার গহনা, দামী তাঁতের শাড়ী, বৃদ্ধা মাতারও কোন কষ্ট হয় নাই—কিন্তু হঠাৎ উত্তর প্রদেশের একটি যুবক ফিটার-মিস্ত্রী ও সে কোথায় নিরুদ্দেশ হইয়া গেল—তাহা আর কেহ জানিল না।

ঘুরিতে ঘুরিতে সুন্দরী ও বদ্রী মিস্ত্রি আসিয়া উঠিয়াছিল এক চটকলে। এখানে বদ্রীর দূরসম্পর্কের কোন এক আত্মীয় থাকিত, কিন্তু মজুত অর্থ চিরদিন থাকে না—রঙীন নেশা ও সঞ্চিত অর্থের থলি উবিয়া যাইতেই প্রয়োজন হইল চাকুরীর—চটকলের এলাকা, অতএব চাকুরী করিতে হইলে এখানেই চাকুরী করিতে হইবে। বদ্রী খোঁজ লইয়া জানিল—পুরুষের চাকুরী হওয়া এখানে কঠিন তবে সুন্দরীর স্পিনিং সেক্‌সনে যদি কাজ জোগাড় করিয়া দেওয়া যায়, তবে বদ্রীর পরে চাকুরী হইতে পারে এবং স্পিনিংএর কর্ত্তা মহিমবাবু দয়ালু ব্যক্তি, সুন্দরী তাহার নিকট গেলে তিনি ফিরাইবেন না মনে হয়। অতএব সুন্দরী

একদিন ভাল শাড়ী এবং গালে স্নো-পাউডার লেপিয়া মহিমবাবুর শরণাপন্ন হইবে স্থির করিল।

গলির মোড়ের দোকানে তিনি নিত্য পান খান, সেখানে তাহাকে ধরাই সুবিধা, একথাও জানা গেল—

*

হরিহর গ্রামের সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া এখানে বাড়ী করিয়াছিলেন—বড় যোগীন, ম্যাট্রিক পাশ করিয়া একটা সওদাগরী আপিসে চাকুরী করে, ছোট মহিম পাটকলে স্পিনিং বাবু। হরিহরের স্ত্রী বাঁচিয়া আছেন তবে অত্যন্ত বৃদ্ধা। মহিম ও যোগীন বহুদিন পৃথগন্ন হইয়াছে—যোগীনের সন্তানাদিও বেশী, উপার্জ্জনও কম, উপরি পাওনাও নাই, কাজেই অবস্থা খারাপ, বৃদ্ধা মাতা তাহার ভাগেই পড়িয়াছেন। মহিমের মাহিনা যাহাই হোক, উপরি পাওনা যথেষ্ট, সংসারে লোকও কম, কাজেই অপেক্ষাকৃত অবস্থাপন্ন।

হরিহর বাঁচিয়া থাকিতেই দুই ভাইয়ের মধ্যে বনিবনাও ছিল না, বিবাহ ও সন্তানাদি হইবার পর দুই বধূর মাঝে বহুদিন বহু অশোভন ব্যাপার ঘটিয়া গিয়াছে। ছেলেকে বেশী দিয়াছে, দামী জামা পরাইয়াছে, মাছের মাথা দিয়াছে ইত্যাদি তুচ্ছ ঘটনা লইয়া স্বার্থান্ধ ও স্নেহান্ধ দুইটি স্ত্রীলোকের ঝগড়া একই জঠরে লালিত দুই ভাইকে পৃথক করিয়া দিয়াছিল। হরিহরের মৃত্যুর পরে বাড়ীর মাঝখান দিয়া দেওয়াল উঠিয়াছে, —যোগীনের ঘরে চলে চিরদারিদ্র্যের সঙ্গে অবিশ্রাম সংগ্রাম। তাহার ছেলেমেয়েরা শীতের দিনে খালি পায়ে, ছেঁড়া জামা পরিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়, মহিম-মহিষী তাহা দেখিয়া হাসেন এবং নিজের ছেলেকে সাজাইয়া খেলিতে পাঠাইয়া দেন। ওদিকে চলে যোগীন-মহিষীর দুর্ভাগ্যের ক্রন্দন

—এঘরে বাজে রেডিও, রাঁধুনী চা করিয়া আনে, মহিমের স্ত্রী চা পান করিতে করিতে রেডিও শুনেন।

এরা মতি ঠাকুরের বংশধর, গোপাল ঠাকুরের নাতি।

*

মহিম কল হইতে বাহির হইয়া পানের দোকান হইতে পান খান—সাইকেলের সিটের উপর ভর দিয়া দাঁড়াইয়া, কুলি কামিনদের সহিত, কখনও বা সর্দ্দারদের সহিত কথা বলেন। সেদিনও তেমনি কথা কহিতেছিলেন—সর্দ্দারকে টিকিট ভাঙ্গাইবার জন্য লোক সংগ্রহ প্রভৃতি করিতে উপদেশ দিতেছিলেন, এমন সময় সুন্দরী আসিয়া হঠাৎ তাহাকে প্রণাম করিল। প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইতেই মহিম অবাক হইয়া গেল—এমন সুন্দরী মেয়েটি কে? কেনই বা তাহাকে প্রণাম করিল?

সুন্দরী কহিল, বাবু, আপনার নাম শুনে এলাম, আপনি কলে একটা কাজ না দিলে উপোস করে ম'রতে হবে—

—কতদিন এসেছিস্? তোর মানুষ কে? কোথায় থাকিস—

—অল্প কদিন এসেছি বাবু—মানুষের নাম বদ্রী।

—সে কি করে—

—কিছুই করে না। কাজ পায় নি—তাকে নয় আমাকে কাজ না দিলে—

অত্যন্ত করুণ কণ্ঠে কথা কয়েকটি বলিয়া আবেদন করা উচিত ছিল, তাহা হইলেই দয়া হইতে পারিত কিন্তু সুন্দরী কথাটা শেষ করিবার পূর্ব্বেই ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিল। মহিম এ হাসি চিনিতেন—সুন্দরীও এরূপ হাসিতে অভ্যস্ত। মহিম কহিল—কোথা থাকিস্?

—ঐ বাবু বাগান বস্তিতে, এ হপ্তায় কাজ না দিলে উপোস করতে হবে—

মহিম কহিল, সর্দ্দারনীকে একবার বল গিয়ে। সর্দ্দার, সর্দ্দারনীকে দেখা করতে বলিস্ ত। সেও ত বাবু বাগানেই থাকে—

সুন্দরী হাসিয়া কহিল, হ্যাঁ হুজুর—আমি তাকে বলেছি কিন্তু আপনার হুকুম না হলে ত হয় না—বাবু—

আচ্ছা—দেখবো, চাকরী ত মুখের কথা নয়। চটকলের চাকুরী একটু কঠিন, বুঝলি—

—হুজুর একবার পায়ের ধূলো দিলে দেখ্তেন কি কষ্টে আছি—

—তোর আবার কষ্ট কিরে সুন্দরী—এমন চেহারা থাকতে—

—বাবু—

—আচ্ছা—দেখবো—পরে দেখা করিস্—বদ্রী কোথায় ?

—ঘরকেই আছে—আপনার কাছে যাবে ?

—হ্যাঁ—রবিবার—সকালে যায় যেন—

মহিম সাইকেলে উঠিয়া চলিয়া গেলেন। কুলির সর্দ্দার সুন্দরীকে লক্ষ্য করিয়া কহিল, হ্যাঁ, তোর চাকুরী হবে—বাবুকে কিছু দে, নইলে—

সুন্দরী কহিল, কি দেবো ? কিছুই ত নেই—

সর্দ্দার পরিহাস করিল, সবইত আছে—টাকায় কি হবে—বাবু বড় ভাল লোক, টাকার ভুখী নয়—

সুন্দরী সবই জানিত এবং সবই বুঝিল। এসব কাজ সে পূর্ব্বে বহু করিয়াছে।

*

মাসের শেষ—

যোগীন প্রবল মাথা ধরা ও জর লইয়া আফিস্ হইতে ফিরিলেন। ঘরে বাজারের পয়সা নাই, এখন অসুস্থ হইলে চিকিৎসারও উপায় নাই—মুদি দোকান, ডাক্তারখানায় যথেষ্ট দেনা পূর্ব্ব হইতেই হইয়া আছে—

সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে—

যোগীন জ্বর ও মাথা ধরার জন্যে ছট্‌ফট্‌ করিতেছে। বৃদ্ধা মাতা মাথায় জল দিয়া বাতাস করিতেছিলেন—পাশে মহিমের ঘরের রেডিওটা তারস্বরে চিৎকার করিতেছিল—তাহার শুষ্ক শব্দ যোগীনের মাথার মধ্যে যেন হাতুড়ীর আঘাত করিতেছিল—গৃহিণী বুভুক্ষু ছেলেমেয়েদিগকে ধমকাইতেছিলেন, তাহারা চিৎকার করিতেছে—উনুনের ধোঁয়া ঘরের মাঝে ঢুকিয়া শ্বাসকষ্ট উপস্থিত করিতেছিল। চারিপাশের এই গোলমালের মধ্যে যোগীন প্রাণপণে দাঁত কামড়াইয়া পড়িয়া তীব্র মাথার বেদনা ভোগ করিতেছেন।

মাতা প্রশ্ন করিলেন—খুব কষ্ট হ'চ্ছে বাবা—যোগীন—

—উঃ মাথাটা ফেটে চৌচির হয়ে যাচ্ছে যেন, আর ঐ রেডিওটা যেন মাথায় হাতুড়ী মারছে—একটু আস্তে বাজানো যায় না—

দুই ভাইএর পৈতৃক বাড়ির মাঝে সীমানার দেওয়াল তাহাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছে, তবুও সেই দেওয়ালের গায়ে একটা দরজা ছিল—কখনও কখনও খোলা হইত। বৃদ্ধা মাতা সেই দরজাটা খুলিয়া মহিমের আঙ্গিনায় উপস্থিত হইলেন। মহিমের স্ত্রী টেবিলে চা'র পেয়ালা রাখিয়া হাতে কি যেন বুনিতেছিলেন এবং আন্‌মনে বসিয়া রেডিও শুনিতেছিলেন—

মাতা ডাকিলেন—বৌমা! বৌমা—

বধূমাতা শ্বশ্রূঠাকুরাণীর আগমনে বিশেষ প্রীত হইলেন এমন নয়, তবে শুষ্ক 'আসুন' বলিয়া একটা আসন আগাইয়া দিলেন।

—বসবো না বৌমা, যোগীন জ্বর আর মাথা ধরা নিয়ে এসেছে আফিস্‌ থেকে—

বৌমা নীরবে শুনিতেছিলেন—শাশুড়ী নীরব হওয়ায় কহিলেন, আজকাল জ্বর জারি হচ্ছে—

—খুব মাথা ধরেছে, গোলমালে মাথায় যেন হাতুড়ী পিটুছে—রেডিওটা একটু আস্তে করে দাও, তার বড় কষ্ট হ'চ্ছে—

—বৌমা অবাক হইয়া কহিলেন, রেডিওর গান শুন্‌লে মাথা ধরা বাড়ে এমন ত শুনিনি।

—সে ত তাই ব'ল্‌ছে—

—আমি না হয় বন্ধ করলাম, কিন্তু অন্য কোন ভাড়াটে যদি থাক্‌তো তাদের কি বন্ধ করতে বল্‌তে পারতেন?

—তা হ'লে কি আর বলা যেত? সে ত সত্যিই—তবে খুব কষ্ট হচ্ছে কিনা তার তাই—

বৌমা রেডিওটা বন্ধ করিয়া দিয়া কহিলেন, বন্ধ করে রাখ্‌তেই যদি হয় তবে এ বালাই কেনা কেন?

—বন্ধ ক'রো না—আস্তে আস্তে বাজাও, তাতে ক্ষতি কি?

বৌমা রেডিও খুলিলেন না, চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া কহিলেন, একটু চা করতে ব'লবো?

—না।

কিছুক্ষণের মধ্যেই মহিম আসিয়া পড়িল। মহিম মাতাকে দেখিয়া একটু বিস্মিত হইল এবং স্ত্রীর মুখের পানে চাহিয়া ভীত ভাবে প্রশ্ন করিল, কি হ'য়েছে—

মাতা ব্যাপারটা বুঝাইয়া দিলে মহিম নীরবে জামা কাপড় ছাড়িতে লাগিল। মাতা কহিলেন, যোগীনের হাতে একটা পয়সা নেই, বাজার দেনায় অস্থির, কাল ডাক্তার ডাকার উপায় নেই, মাসের শেষ। ডাক্তার ত দেখাতে হবে—

মহিম উপেক্ষার সহিত কহিল, ও একটু জর হ'য়েছে, সেরে যাবে—ডাক্তার কি হবে—

—আফিস্ কামাই হবে, দু'দিন রোগে শুয়ে থাকারও ত উপায়

নেই, এমনি পোড়া চাকরী, তুই—কিছু ধার দে, কাল রবীন ডাক্তারকে ডাকি—

—ঐ কথাটাই ত তোমরা ভুলে যাও, মাসের শেষ ত আমারও বটে—

—তবুও তোর ত উপরি পাওনা কিছু আছে—ওর ত তাও নেই—

—উপরি খরচাও আছে—ঠাকুর, চাকর, ঝি, মাষ্টার, রেডিওর দোকান, এসব ত দিতে হয়। সেকরার দোকানেই মাসে পঞ্চাশ টাকা দিতে হয় অর্থাৎ উপার্জ্জন আজ যতই বাড়ুক, অভাব কমিবে না—

—তবুও, ভাই থাকতে দাদার চিকিৎসে হবে না, এক মায়ের পেটের ভাই—এতটুকু দয়ামায়া কি থাকতে নেই মহিম, রোগে পড়েছে—

—আমিও ত তাই ভাবি মা, এক মায়ের পেটের ভাই নিজের ছেলেকে মশারীর মাঝে বসিয়ে সন্দেশ খাইয়েছে আর ভাইএর ছেলেকে শুকনো মুড়ি দিয়েছে খেতে—এই বা সম্ভব কি করে?

—ও কথা তুই বিশ্বাস করিস্ মহিম—নিজে চোখে না দেখ্‌লে একথা কি বিশ্বাস করা যায়—ও কথা তুই বিশ্বাস করিস্ নে। ওদের পানে একবার তাকিয়ে দেখ্—

—কে আর কার পানে তাকায় বল—আমার অভাবটা তুমিও ত দেখছ না মা! দেনা শুধ্‌তে শুধ্‌তে হাড় কালি হয়ে গেল—উদয়াস্ত খেটেও ত দুঃখ যায় না—

মাতা দীর্ঘশ্বাস ফেলিলেন—ভাই ভাইকে এত দূর করিয়া দিতে পারে—মানুষ এমন স্বার্থপরও হইতে পারে! মাতা সাশ্রু নেত্রে উঠিয়া আসিলেন—বৌমা তাঁহাকে শুনাইয়া শুনাইয়া মহিমকে কহিলেন—রেডিও ফেরৎ দিয়ে এস—

—কেন ?

—যদি বাজানোই না যায় তবে ও ঘরে রেখে কি আমি ধূনো দেব—

আর শুনিতে সাহস হইল না—মাতা তাড়াতাড়ি দরজা পার হইয়া বড়ছেলের আঙ্গিনায় আসিয়া দরজা দিয়া দিলেন।

*

মহিম দয়ালু ব্যক্তি, টাকার জন্যেই সবকিছু করেন না—অতএব সুন্দরীর কলে চাকুরী হইয়াছে ; সে হাজিরা দিয়া চলিয়া আসে, বিশেষ কিছু করিতে হয় না, শনিবারে টিকিট ভাঙ্গাইয়া হপ্তা আনে তাহাতেই তাহাদের চলে—বদ্রী চাকুরীর চেষ্টায় ঘুরিতেছিল। মহিম তাহাকেও ভরসা দিয়াছেন। অন্য কলেও তিনি চেষ্টা করিয়াছেন।

সুন্দরী কিরূপ দুরবস্থার মধ্যে বাবু বাগান বস্তিতে আছে তাহা স্বচক্ষে দেখিবার জন্যও মহিম দুই একদিন সেখানে গিয়াছিলেন। সুন্দরী যথাসাধ্য আপ্যায়িত করিয়াছে—বদ্রী পান করে, তাহার জন্য তিনি কিছু দিয়াছেনও—

কল্পতরু মহিমের খ্যাতি আছে—সর্দ্দার কয়েকজন তাহার বিশেষ অনুগত। বেশী টিকেট যাহা ভাঙ্গান হয়, তাহার লভ্যাংশ তিনি সমান ভাগে বণ্টন করিয়া দেন, অতএব সকলেই তাহাকে শ্রদ্ধার চোখে দেখে—

শনিবারে মহিমের ফিরিতে একটু রাত্রি হয়—সারা সপ্তাহ পরিশ্রমের পর সেদিন বন্ধু বান্ধব সহ তিনি একটু সিনেমা দেখিতে যান। তাঁহার স্ত্রী এইরূপই জানেন, এবং শনিবার ফিরিয়াই সাধারণতঃ শুইয়া পড়েন কেন—তাহা স্ত্রী একেবারে না জানেন এমন নয়।

শুক্রবার হইতে মহিমের বছর তিনের ছেলেটির জর হইয়াছে—জর খুব বেশী, অচৈতন্যের মত পড়িয়া আছে। রাত্রে মহিম কয়েকবার

উঠিয়া দেখিল—জ্বর একটুও কমে নাই। সকালে সাড়ে ছ'টায় কলের বাঁশী বাজে তখন হাজিরা দিতেই হয়, তাহা নইলে আর কলে প্রবেশ করা যায় না। কলের প্রথম বাঁশী বাজে ছ'টায়। মহিম তাড়াতাড়ি প্রস্তুত হইতেছিল—আজ শনিবার কলে যাইতেই হইবে—হপ্তার দিন।

স্ত্রী কহিলেন, ছেলেটার এত জ্বর, আমার ত বড্ড ভয় হ'চ্ছে। কলে না গেলে হয় না?

—আজ শনিবার। না গেলে হবে কি করে? ভয় নেই ডাক্তারকে খবর দিয়ে যাচ্ছি, দেখে গিয়ে অযুধ পাঠিয়ে—

—তবুও, অচৈতন্য হ'য়ে পড়ে আছে, চোখও মেলছে না—

—কলের চাকুরী—এখন ত ছেলের পানে চেয়ে কাঁদবার সময় নেই, চাকুরী থাকে না। ম'রলেও ত কাঁদবার অবসর নেই—চাকুরী গেলে ত সবই যাবে—

স্ত্রী বাদানুবাদ করিলেন না, মহিম সাইকেল লইয়া বাহির হইয়া যাইবার সময় কহিল, ভয় নেই, ডাক্তার সব ব্যবস্থা করবে। আমি থেকে কি ক'রবো? আমি ত ডাক্তার নই, আমি থেকে কি হবে— ব্যস্ত হ'য়ো না।

মহিম চলিয়া গেল—স্ত্রী অচৈতন্য ছেলেটার পানে চাহিয়া চোখের জল ছাড়িয়া দিলেন। সারাটা দিন এই অজ্ঞান ছেলেকে লইয়া একাকী কাটাইতে হইবে—এমনই পোড়া চাকুরী, যে পুত্রের অসুখেও কামাই করিবার উপায় নাই—কি পরাধীন জীবন!

মহিম রেডিও, সোনার গহনা, সাইকেল, সিনেমার মোহে স্বাধীনতা বিক্রয় করিয়াছে বহুদিন আগে—হরিহরও এমনি করিয়া স্বাধীনতা বিক্রয় করিয়া চাকুরীর প্রলোভনে পড়িয়াছিলেন, আজ সেকথা ভাবিয়া লাভ নাই। এই জন্যই গোপালপুর ত্যাগ করিয়া তিনি এখানে বাড়ী করিয়াছিলেন—

*

যোগীন জ্বরের ঘোরে পড়িয়া আছেন—অর্থাভাবে ডাক্তার ডাকা হয় নাই। স্ত্রী নীরবে রান্না করিতেছিলেন—মাতা শিয়রে বসিয়া চোখের জল ফেলিতেছিলেন। কেহ আসিয়া প্রশ্ন করে নাই কি হইয়াছে, কেহ জিজ্ঞাসা করে নাই, ডাক্তার ডাকা হয় নাই কেন? সকলেই কলে, অফিসে, কর্ম্মস্থানে চলিয়া গিয়াছে—অক্ষম স্ত্রীলোকগুলি নীরবে কাঁদিতেছে মাত্র!

শিল্পাঞ্চলের ক্ষুদ্র সহর—এখানে প্রতিবেশী নাই। যুগযুগান্তর পাশাপাশি বাস করিয়াও কেহ প্রতিবেশী হয় না, সমাজ গড়িয়া উঠে না, পরস্পরের প্রতি কোন কর্ত্তব্য গড়িয়া উঠে না। কলের বাঁশী, আট'টা দশ, ন'টা পনর'র গাড়ী লইয়া জীবন, কলের চাকার মত নিয়মিত ঘুরে, কাহারও দিকে চাহিবার অবসর নাই, কর্ত্তব্যও নাই, চাকুরী, ভোজন ও প্রজননের সংকীর্ণ সীমায় আবদ্ধ জীবন। —'ভাল ত?' প্রশ্ন করার মাঝেই এখানকার প্রতিবেশীর কর্ত্তব্য শেষ হইয়া যায়। অর্থের ঔদ্ধত্য ও অহঙ্কার এখানে গগনস্পর্শী, অজ্ঞানতার অন্ধকার গাঢ়তম, তামসিকতার উচ্ছৃঙ্খল লীলাভূমি। সেই জন্যই যোগীনের মাতার অশ্রু, মহিমের স্ত্রীর অশ্রুর প্রতি এখানে চরম ঔদাসিন্য প্রকট হইয়া উঠিয়াছে—তাহারা অসহায়, একান্তই অসহায় ভাবে অশ্রু-মোচন করেন—কেহ প্রশ্ন করে না, চোখে জল কেন?

মহিম দ্বিপ্রহরে বাড়ীতে আসিয়া দেখেন ছেলেটি সেইরূপই অজ্ঞান অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। ডাক্তার দেখিয়া গিয়া ঔষধ পাঠাইয়াছেন। ডাক্তার বলিয়াছেন ভয় নাই, সম্ভবতঃ হাম বাহির হইবে। মহিম দ্বিপ্রহরে বিশ্রাম করিয়া বৈকালে বাহির হইতেছিল। স্ত্রী প্রশ্ন করিল, আবার বেরুবে নাকি?

মহিম কহিল, শনিবার, আজ না বেরুলে সামনের সপ্তাহে খাবো কি ?

স্ত্রী কথাটা বুঝিলেন—মাহিনা সামান্যই, তাহা মাসের প্রথমেই সেকরা ও রেডিওর কিস্তি দিতে ফুরাইয়া যায়, শনিবারের উপরিটা না সংগ্রহ করিলে উপায় নাই—ডাক্তার ও ঔষধের খরচ আছে।

স্ত্রী কহিলেন, কাজ হয়ে গেলেই ফিরে এসো, একা একা বড় ভয় করে—একটা কথা কইছে না, চোখ মেলে তাকাচ্ছে না—স্ত্রীর চোখ দুইটি জলে ভরিয়া উঠিল।

—এক্ষুণি আসবো—

মহিম বাহির হইয়া ডাক্তারের সঙ্গে দেখা করিলেন। ডাক্তার কহিলেন, হাম জ্বরে অমন হয়, ওতে ভাবনার কিছু নেই, মাথায় আইস্ ব্যাগ দিন, জ্বরটা কমবে।

মহিম বরফ কিনিয়া বাড়ীতে দিয়া আসিলেন।

কিন্তু শনিবার—সর্দ্দারদিগের নিকট হইতে উপরি পাওনাটা এখনি আদায় করিতে হইবে, নচেৎ মদের দোকানে সবই নিঃশেষ হইয়া যাইবে। মহিম তাড়াতাড়ি টাকাগুলি আদায় করিয়া লইলেন এবং শনিবারের অবশ্য করণীয় কারণটুকুও গ্রহণ করিলেন। কারণ-পানের সঙ্গে সঙ্গেই মনের অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়া গেল—সুন্দরী আজ সন্ধ্যায় যাইতে বলিয়াছে, চাকুরির জন্য সে কৃতজ্ঞতা জানাইয়া সাদর নিমন্ত্রণ করিয়াছে। প্রলোভন ও একটা জৈব উন্মাদনা তাহাকে যেন ঠেলিয়া লইয়া যাইতে লাগিল—

দ্রব্যগুণে মনের অবস্থা অত্যন্ত অনুভূতিশীল হইয়াছে। বাবু-বাগান বস্তি অন্ধকারময়, পুরুষেরা তাড়ি ও মদের দোকানে গিয়াছে, মেয়েরা বাড়ীতে আছে, কেহবা নাই—কেহবা গৃহেই বসিয়া দ্রব্যগুণে গান আরম্ভ করিয়াছে। সমাজ-বন্ধনহীন এই বস্তি—আর্য্যাবর্ত্ত, দাক্ষিণাত্য,

কাবুল, আরাকান সমস্ত দেশের প্রতিনিধি এই বস্তিতে বাস করে, বিচিত্র তাদের জীবন, বিচিত্র সমাজ ব্যবস্থা—

মহিম সন্ধ্যার পরে ধীরে ধীরে বস্তিতে প্রবেশ করিল—একটি মেয়ে বারান্দায় বসিয়া গান করিতে করিতে রুটি সেঁকিতেছিল। সে কহিল, বাবু যে! বস্থন বাবু—আস্থন—

মহিম জবাব দিলেন না, ধীরে ধীরে স্থন্দরীর ঘরের সামনে আসিয়া দাঁড়াইলেন—দরজায় তালাবন্ধ। ব্যর্থতায় দুঃখে ও ক্রোধে তিনি জলিয়া উঠিলেন—পাশের কুঠুরীর একটি মেয়ে কোমরে হাত দিয়া আসিয়া দাঁড়াইয়া প্রশ্ন করিল, কি বাবু? প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গেই খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল। এই ব্যঙ্গের হাসি মহিমকে আরও উত্তেজিত করিয়া তুলিল। মহিম প্রশ্ন করিল, স্থন্দরী কোথা? বদ্রী কোথা?

মেয়েটি কহিল, ছোট সাহেবের কুঠীতে গেছে ওরা—টোমাস্ সাহেব আর্দ্দালী পাঠিয়েছিল—

সমস্তই স্থপরিষ্কার হইয়া গেল—টমাস্ সাহেব তাহাদের সেক্সনের বড়কর্ত্তা, বলিবার কিছুই নাই। মহিম দুঃখে অভিমানে ও ক্রোধে দাঁড়াইয়া রহিলেন—

মন দ্রুত ভাবিতে লাগিল—কি অকৃতজ্ঞ এই পৃথিবী, পঞ্চাশটা টাকা ছাড়িয়া দিয়া তিনি স্থন্দরীর চাকুরী দিয়াছেন, তাহা ছাড়াও অর্থ সাহায্য করিয়াছেন, তাহা না হইলে পথে পথে কাটাইতে হইত, আর আজ সে আহ্বান করিয়া ফিরাইয়া দিল। দ্রব্যগুণে মনটা অত্যন্ত বিষাদার্ত্ত হইয়া উঠিল মহিমের—চোখের কোণে দুঃখ ও ক্ষোভের অশ্রু জমা হইয়া উঠিল—

মেয়েটা কহিল, আস্থন বাবু, আঁমার গরীবের ওখানে বসবেন। ফিরে যাবেন কেন? মেয়েটি তেমনি করিয়া দাঁড়াইয়াই ফিক্ ফিক করিয়া হাসিতে লাগিল। মহিমের ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে—মহিম

অকৃতজ্ঞ পৃথিবীর পানে চাহিয়া কেবল নিজেকে ধিক্কার দিলেন—আর কোনদিন কাহারও উপকার করিবেন না।

চোখের কোণ হইতে ব্যর্থতার অশ্রু রুমালে মার্জ্জনা করিয়া চলিয়া আসিলেন।

*

মহিমের স্ত্রী অচৈতন্য ছেলেটাকে কোলে লইয়া বসিয়া ছিলেন। বরফের ব্যাগ মাথায় চাপাইয়াও জ্বর ৪°৫ ডিগ্রির কম হইতেছে না—ছেলেটা মাঝে মাঝে চমকাইয়া উঠিতেছে। একাকী বাড়ীর মাঝে বসিয়া অসহায়ের মত কেবল অশ্রু মার্জ্জনা করিতেছেন, আর ঘন ঘন দরজার পানে চাহিতেছেন মহিম আসে কিনা। মাঝে মাঝে ছেলেটা যেন হাত পা কেমন করিতেছেন—

তিনি ডাকিলেন, বাবা, বাবা, খোকোন—

খোকন চোখ মেলিল না। একবার যেন চমকাইয়া উঠিল মাত্র—

অসহায়ের মত মহিমের স্ত্রী কাঁদিয়া উঠিলেন—বাবা, বাবাগো—চোখ মেলে তাকা একবার—

টেবিলের উপর রহিয়াছে রেডিও—হাতে সোনার ষোলটি চুড়ি, কাঁচের আলমারী ভর্ত্তি কত কাপড় জামা, তাহারা আজ কোন সান্ত্বনাই দিতেছে না—

*

যোগীন জ্বরের ঘোরে প্রলাপ বকিতেছেন, মা, মা, আর বাঁচবো না—আর নয়—

মাতা শিয়রে বসিয়া ব্যাকুল কণ্ঠে ডাকিলেন, যোগীন, যোগীন, অমন ক'রছিস্ কেন? কি হ'য়েছে, বল যোগীন—

যোগীন 'উঃ' বলিয়া পাশ ফিরিয়া শুইল। মাতা হাতপাখা লইয়া বাতাস করিতে করিতে চোখের জল ফেলিতেছেন। মানুষ এমন অনুদার—বিনা চিকিৎসায় যোগীন মরিতে বসিয়াছে অথচ মহিম এতটুকু দিয়া সাহায্য করিল না। এক মাতৃজঠরে তাদের জন্ম, একই স্তন্যপান করিয়া লালিত—অথচ স্বার্থের দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীরের দ্বারা আজ এতই দূর হইয়াছে। হরিহরের স্ত্রী রোগাক্রান্ত পুত্রকে কোলে লইয়া তাই অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছিলেন—

কক্ষান্তরে যোগীন-পত্নী রাঁধিয়া শুধু ফেন ভাত ছেলেদের সামনে ধরিয়া দিয়াছেন, তাহারা খাইবে না বলিয়া মুখ বাঁকাইয়া বসিয়া আছে। সামান্য যাহা ধারে পাওয়া গিয়াছিল তাহাতে ঔষধ আসিয়াছে, কিন্তু বাজার হয় নাই। যোগীনের স্ত্রী ছেলেদের পানে চাহিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন—হায় হায়, ভগবান ছেলেমেয়েদের পেটের ভাতও জুটাইলেন না, সোনার ছেলেমেয়ে, এত আদরের ছেলেমেয়ে শুধু ভাত কেমন করিয়া খাইবে—

অবোধ শিশুগুলি কিছুই না বুঝিয়া অভিযোগ করিতে লাগিল—শুধু ভাত খাব কি ক'রে, তুমি আর কিছু রাঁধো না—

যোগীন-পত্নী হলুদ তেল কালি অবলুপ্ত শাড়ীর আঁচল দিয়া অশ্রু মার্জ্জনা করিয়া একবার আর্ত্তকণ্ঠে কহিলেন, উঃ ভগবান!

যোগীন রোগের ঘোরে কহিল—উঃ—

পাশের বাড়ী মহীমের স্ত্রী ছেলে কোলে করিয়া কহিলেন, হায় ভগবান প্রাণটা ভিক্ষা দাও—নিষ্ঠুর ভগবান—বাছাকে মার্জ্জনা কর—তিনি কাঁদিয়া উঠিলেন, এত বড় পৃথিবীতে 'আহা' বলিয়া সান্ত্বনা দিবার একটি লোক নাই।

ঘরে ঘরে অশ্রুর প্লাবন বহিয়া গিয়াছে—

*

হরিহর একদিন গোপাল ঠাকুরের চোখে অশ্রুর প্লাবন বহাইয়া দিয়া তাহার মুখের ধান কয়টি বিক্রয় করিয়া লইয়া আসিয়া এই বাড়ী করিয়াছিলেন। নতুন শিক্ষার দম্ভে, বড় হইবার স্বার্থবুদ্ধিতে হরিহর স্নেহ মমতা উদারতায় দেবতুল্য গোপালকে ত্যাগ করিয়াছিলেন। হরিহর সেদিন শিল্পাঞ্চলের জৌলুস, শহরের কাঞ্চন ও কৌলিন্যের মোহে স্বজনকে ত্যাগ করিয়াছিলেন, সেদিন গোপাল অভিযোগ করেন নাই, নীরবে অশ্রুমোচন করিয়া পরম সহিষ্ণুতা ও উদারতার সঙ্গে তাহাকে ক্ষমা করিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন—ওরা সুখে থাক্। কিন্তু তাঁহার আশীর্ব্বাদ নিষ্ফল হইয়া গিয়াছে, সত্য হইয়া রহিয়াছে শুধু চোখের জল—আজ হরিহরের ঘরে ঘরে প্রবাহিত হইয়াছে অশ্রুর বন্যা। আপনার কর্ম্মফল ও মোহান্ধ জীবনে ডাকিয়া আনিয়াছে এই অপরিসীম ব্যর্থতা ও দৈন্য, এই প্রবাহমান অশ্রুর বন্যা কতদিনে কত সুদূরে যাইয়া বিলুপ্ত হইবে তাহা কে জানে! এরা দিতে শিখে নাই, তাই জগতে কিছুই পায় নাই—একান্ত একাকী অসহায় জীবনে বেদনা পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিয়াছে—অশ্রুর বন্যা প্রবাহিত হইয়াছে।

এরা ভগবতী চাটুয্যের গোপালপুরের অধিবাসী।

*

বালীগঞ্জের প্রশস্ত রাস্তার উপরে বিরাট বাড়ী, সামনে একটু স্থানে কয়েকটি মরসুমী ফুলের গাছ। মালী, দারোয়ান ঠাকুর চাকর লইয়া সংসার বড়ই। অশোক সাহেববাড়ী হইতে বাড়ীর নক্সা করাইয়া এই বাড়ী তুলিয়াছিলেন, লোকে দেখিয়া তারিফ করিয়াছে। বাড়ীর

প্রান্তে গ্যারেজ—মোটর থাকে। জ্যেষ্ঠ কমল মোটর করিয়া আফিস যান—আমদানী রপ্তানীর ব্যবসায়—চাঁদমোহনের ব্যবসা দিনে দিনে বাড়িয়াছে। বাঙ্গালীদের মধ্যে ধনী বলিয়া একটা সম্মান আছে—

অশোকের স্ত্রীর শরীর খারাপ, ব্লাডপ্রেসার সহ হৃদযন্ত্রের দৌর্ব্বল্য। উপর নীচে করিতে পারেন না। তিনি শুইয়া ছিলেন—শরীরটা অত্যন্ত খারাপ। কাঞ্চনকুমার আসিয়া কহিল, আমাকে পঞ্চাশটা টাকা দাও ত—

—কেন ?

—কাজ আছে—

—কি কাজ ?

—খেলে হেরে গেছি তাই দিতে হবে।

—কি ? আবার তাস খেলেছিস্—

—হ্যাঁ, ও ছাড়া আমি কিছুতেই আনন্দ পাইনে—

মাতা ধীরে ধীরে কহিলেন, শরীর ভাল নেই, ওসব টাকা আমি দেব না—

—দেবে না মানে ? আমি মান-ইজ্জত সব খোয়াবো ? পঞ্চাশটা টাকার জন্যে—

—ও সম্মান রাখবার দরকার নেই—আমাকে বকিও না—

—টাকা দিতেই হবে—দেবে না কেন ? টাকার অভাব নেই ত—

—আছে বৈ কি ? ব্যবসা মন্দা হ'য়েছে, জাহাজ পৌঁছে গেছে মাল খালাস ক'রতে হবে, মাসে মাসে বিলেত টাকা পাঠাতে হচ্ছে এখন ওসব হবে না—কথা বল্‌তে কষ্ট হচ্ছে, আর বকিও না—

—তোমাদের ছেলে যখন, তখন আমার দরকার যা তা দিতেই হবে। যে বাপ-মার ছেলেকে মানুষ ক'রবার ক্ষমতা নেই, কর্ত্তব্যপালন করবার ক্ষমতা নেই—তাদের ছেলে হয় কেন ?

মাতা ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিয়া বসিলেন। কহিলেন, এই সব শিখেছ বুঝি কলেজে। তোমার কোন কর্ত্তব্য নেই, আমি নড়তে পারছি নে, বুকের মধ্যে কাঁপছে—সেদিকে তাকানও তোমার কর্ত্তব্য নয়—না? মানুষের ছেলে হয় এই জন্যেই—

উত্তেজিতভাবে কথা কয়েকটি বলিয়াই তিনি শুইয়া পড়িলেন—একটা আচ্ছন্নতা যেন সহসা অচৈতন্য করিয়া ফেলিল—কাঞ্চন বিরস মুখে ক্ষণিক দাঁড়াইয়া থাকিয়া বাহিরে গেল—মাতার কি হইয়াছে, কেন সহসা এমনিভাবে শুইয়া পড়িলেন তাহা প্রশ্নও করিল না।

নীলা প্রসাধন শেষ করিয়া আসিয়া মায়ের দিকে চাহিয়া একটু ব্যস্তভাবে বারান্দায় অপেক্ষমান কাঞ্চনকে প্রশ্ন করিল, মা'র কি হয়েছে রে?

কাঞ্চন জবাব দিল, টাকা চাইলে যা হয় তাই—শরীর খারাপ হয়ে কথা ব'লতে পারছেন না—

নীলা কহিল, রোজ রোজ ফ্লাস খেলে হারলে কে এত টাকা দেবে—খেলিস্ কেন? খেলিস্ ত একদিনও জিত্‌তে নেই—

নীলা ঘরের মাঝে যাইয়া ডাকিল, মা—

মাতা চক্ষু মেলিয়া মৃদুকণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন, কোথায় যাবি—

—পার্টিতে, ফিরপোয় আজ মিঃ লোহিয়ার পার্টি—

শরীরটা বড্ড খারাপ হ'য়েছে, মনে হচ্ছে বুকের ধুক্‌ধুকি থেমে যাবে, আজ আর যাস্ নে কোথায়ও—

—তা কি হয় মা, আমার জন্যেই পার্টি। এত কষ্টে মোটর ড্রাইভিং শিখালে, আজ গাড়ী পছন্দ করতে যাবো—না গেলে ত হয় না মা।

মা নীরবভাবে চাহিয়া রহিলেন। নীলা হাসিয়া কহিল, তুমি বড্ড দুষ্টু, আজ মিঃ লোহিয়ার পার্টির দিনে শরীরটা খারাপ করে বস্‌লে?

নীলা শিয়রে বসিয়া মাথায় হাত বুলাইয়া কহিল, তোমার শরীরটাও

বড্ড দুষ্টুমি করে, আমার সঙ্গে। যেদিনই এনগেজমেণ্ট থাকে সেইদিনই বিকল হ'য়ে পড়ে—না ?

মাতা চক্ষু মুদিয়াই রহিলেন—বুকের মাঝে হৃৎযন্ত্রটা কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে। নীলা কহিল, একটু ভাল বোধ করছো মা ? ঐ ওষুধটা খাও—

নীলা টেবিলে রক্ষিত একটা ঔষধ একমাত্রা খাওয়াইয়া দিয়া বিছানায় বসিল। আস্তে আস্তে কহিল, এ হার্ট টনিকটা অব্যর্থ—শরীর চাঙ্গা হয়ে ওঠে—

নীচে রাস্তার পাশে ষ্টুডিবেকারের বৈদ্যুতিক হর্ণ বাজিল—এ হর্ণ সকলেরই সুপরিচিত। মিঃ লোহিয়ার গাড়ীর ডাক্—নীলাকে ডাকিতেছে।

নীলা কহিল, ঐ যে! মিঃ লোহিয়া নিতে এসেছেন। দুষ্টুমি ক'রো না মা, কেমন ? আমি—চট্ করে ফিরে আস্বো। চুপ করে শুয়ে থাকো—কেমন ? আসি—

মাতা চোখ মেলিয়া নীরবে চাহিয়া রহিলেন, নীলা উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, এক্ষুনি আস্বো—পার্টির পরেই। ক্রিমকলার অষ্টিন একখানা দেবে বলেছে—তোমাকে নিয়ে রোজ বেড়িয়ে আসবো—

—কে দেবে ?

—লোহিয়া, আমাকে উপহার দেবে—আমাকে খুব ভালবাসে কিনা ? জন্মদিনে গাড়ীখানা প্রেসেণ্ট করবে, আজকে পছন্দ ক'রে রেখে আস্বো—লোহিয়া দাঁড়িয়ে আছে, আসি।

নীলা উঁচু হিলের খট্ খট্ শব্দ করিয়া, হাতের রঙীন ব্যাগটা দোলাইয়া চলিয়া গেল। নীচে ষ্টুডিবেকার গাড়ী গ্যাস নির্গমনের শব্দ করিয়া প্রস্থান করিল—

মাতা দরজার পানে চাহিয়া নীরবে নীলার প্রস্থান দেখিলেন—

*

মাতা দ্বিতলের ঘরে রোগশয্যায় শুইয়া আছেন—মাথা ঘুরিতেছে, বুকের মধ্যে হৃৎযন্ত্রটা অনিয়মিত আঘাত করিতেছে—যে কোন সময় হয়ত বন্ধ হইয়া যাইবে। টেবিলে রক্ষিত একটা টাইমপিস্ টিক্ টিক্ শব্দ করিতেছে—মাতা চাহিয়া দেখিলেন—সাড়ে ন'টা—

সন্ধ্যা হইতে একান্ত একাকী শুইয়া আছেন—কেহ ঔষধ দেয় নাই, কেহ প্রশ্ন করে নাই কেমন আছ? চাকর যথাসময়ে চা লইয়া আসিয়াছিল, তিনি ফিরাইয়া দিয়াছেন—

অকস্মাৎ তাঁহার ভয় হইল যদি এখনই মৃত্যু হয়—পুত্র কন্যা কেহ নাই, কেহ জল দিবে না—ঔষধটুকু আগাইয়া দিবার কেহ নাই। ঝি চাকর ঠাকুর নীচের ঘরে রাঁধিতেছে। পুত্রবধূ রেডিও খুলিয়া দিয়া গান শুনিতেছে—নীলা গিয়াছে মিঃ লোহিয়ার সহিত পার্টিতে—কাঞ্চন টাকা না পাইয়া অভিমানে চলিয়া গিয়াছে। কমল ফিরিবে রাত্রি দশটায়—

কি নিঃসঙ্গ, একক জীবন। পুত্র কন্যা পরিজনের মাঝে কি অসহায় একাকীত্ব? তাহার প্রতি কেহ চাহিল না—মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করিল না—চলিয়া গেল আপনার কাজে—আপনার আনন্দে। মাতার চোখ দুইটি জলে ভরিয়া উঠিল—যদি মরিয়া যান তবে কেহই দেখিবে না—পথের ভিখারীর মত একাকী নিঃশব্দে মরণকে বরণ করিতে হইবে··· ওদের সম্পর্ক টাকার সঙ্গে—কাঞ্চন টাকা পায় নাই তাই নাই, কমল টাকা উপার্জ্জন করিতে গিয়াছে, নীলা গিয়াছে মোটর গাড়ীর পিছনে—একাকী মাতা পড়িয়া আছেন পিছনে—অভিজাত অট্টালিকায় সুসজ্জিত দ্বিতলের কক্ষে। প্রাচুর্য্যের মাঝে এত দৈন্য, পরিজনবর্গের মধ্যে এমন একাকীত্ব কেমন করিয়া আসিল? তাহারই মত প্রত্যেকটি

প্রাণী আপনার চারিদেওয়ালের মাঝে বন্দী—নিঃসঙ্গ, স্নেহমমতাহীন জীবন! মাতা তাই চোখের জল ফেলিতেছিলেন—

কমল ফিরিল দশটায়—আফিস হইতে ক্লাব, ক্লাব হইতে বাড়ীতে। চাকর সংবাদ দিল, মায়ের শরীরটা আজ একটু বেশী খারাপ হইয়াছে। কমল বিরক্ত হইয়া কহিল, সারাদিন হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম ক'রে এখন এই অসুখের তাল আমি দেব—নীলা কোথায়? কাঞ্চনই বা কোথায়—তারা একটু মাকে দেখতে পারে না—

জামা কাপড় ছাড়িয়া কমল মায়ের দিকে যাইতেছিল, স্ত্রী কহিল, কি খাবে। কফি, না কোকো, না ওভালটিন? একটু খেয়ে যাও—

—আগে শুনে আসি—

—বারমেসে রোগী, ব্যস্ত হওয়ার কি আছে?

—তুমি একটু কফি কর, আসি—

কমল আসিয়া মাকে প্রশ্ন করিল, কি হ'য়েছে মা? প্রেসার বেড়েছে—

মাতা চক্ষু মেলিয়া কহিলেন, তেমন কিছু না, আমার অসুখ ত লেগেই আছে, যা তুই একটু জিরো গিয়ে—

—ওষুধ খেয়েছিলে?

হ্যাঁ, নীলা দিয়ে গেছে—ওষুধে আর কি ক'রবে বাবা, শরীর ত ভেঙ্গেই গেছে—

মাতা আর কিছু বলিলেন না, কমলও তাহার কর্ত্তব্য শেষ করিয়া ফিরিয়া আসিল। মাতা জানিতেন ঔষধে এ রোগ আর ভাল হইবে না—মনের মাঝে একটা না-পাওয়ার বেদনা, একটা ব্যর্থতার বিষাদ নিরন্তর উৎপীড়ন করিতেছে। স্নেহের শ্রদ্ধার প্রলেপে তাহা শীতল না হইলে রক্তের চাপ বাড়িয়াই যাইবে—হৃদযন্ত্রও বিকল হইবে—

*

নীলার জন্মদিনে মিঃ লোহিয়া ক্রিম রংএর একখানা অষ্টিন গাড়ী উপহার দিয়াছেন—মূল্য তাহার অনেক। মিঃ লোহিয়া বাঙ্গালী নহে কিন্তু ধনী ব্যবসায়ী, কমলের সহিত পরিচয়সূত্রে নীলার সহিত পরিচয়—পরিচয় ধীরে ধীরে নৈকট্যে পরিণত হইয়াছে। মিঃ লোহিয়া বিবাহিত, নীলাকে একেবারে ভগিনীর মত দেখেন—

ভগবতী চাটুয্যের বংশের এই কুমারী কন্যাকে মিঃ লোহিয়া কেন এই গাড়ী উপহার দিলেন, কেনই বা নীলা তাহা গ্রহণ করিবে এবং কেনই বা নীলা তাহার ষ্টুডিবেকার চড়িয়া পার্টিতে গিয়াছে তাহা লইয়া কেহ কোন প্রশ্ন করে নাই—সকলের নিকটই সেটা স্বাভাবিক বলিয়া মনে হইয়াছে এবং কমল, কাঞ্চন ও মাতা সকলেই নীলার বুদ্ধির প্রশংসা করিয়াছে। এমন একখানা গাড়ী যে মেয়ে উপার্জ্জন করিতে পারে সে নিশ্চয়ই বুদ্ধিমতী। অতএব জন্মদিনে লোহিয়াকে সকলে বারবার ধন্যবাদ দিয়াছেন, লোহিয়া বিনয় করিয়া বলিয়াছেন, সামান্য উপহার গ্রহণ করেছেন বলেই আমি সুখী—আমি আন্তরিক ভাবে কৃতজ্ঞ। নীলার জন্মদিন অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে কাটিয়া গিয়াছে।

*

নীলা যেদিন নতুন অষ্টিন লইয়া কলেজে গেল সেদিন সহপাঠিনী ও সহপাঠী সকলে বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া গেল এবং অনেকেই সশ্রদ্ধ ভাবে চাহিয়া রহিল। সহপাঠিনী বেলা প্রশ্ন করিল, গাড়ী কিনেছিস্ নাকি? ড্রাইভিং শিখ্‌লি কবে?

নীলা হাসিয়া কহিল, ড্রাইভিং শিখেছিলাম আগেই, তাই জন্মদিনে

এটা উপহার দিলে। ভালই, দাদার গাড়ীর জন্য আর অপেক্ষা ক'রতে হবে না। নীলা এমন ভাবে উত্তর দিল যেন এ ব্যাপারটা অতি তুচ্ছ, গাড়ী কেনাটা এমন বিস্ময়ের বিষয় কিছু নয়।

ইউনিভার্সিটির ফার্ষ্ট বয়, শৈবাল গাঙ্গুলী নতুন অষ্টিনখানার দিকে চাহিয়া চলিয়া যাইতেছিল। নীলা কহিল, চিন্‌তে পারছেন না, বুঝি!

—আপনাকে চিন্‌তে পারিনি এটা একটা প্রশ্নই হল না, তবে গাড়ীটা চিন্‌তে পারিনি। এখন বুঝলাম ওটা আপনারই—হঠাৎ গাড়ী কিন্‌লেন যে!

—জন্মদিনের উপহার—তিনদিনে ড্রাইভিং শিখেছি তাই—

—তিনদিনে ড্রাইভিং শিখেছেন, ও তাই কাগজে এত এ্যাকসিডেণ্টের সংবাদ পাচ্ছি।

শৈবাল গাঙ্গুলীর বাবা সরকারী বড় রাজকর্ম্মচারী, নিজেও ভাল ছেলে, কাজেই সহপাঠিনীদের মধ্যে তাহার প্রতিষ্ঠা ছিল। নীলার মোটর আজ তাহাকে শৈবালের নিকটে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া দিল—

নীলা কহিল, চলুন না আজ, দেখাব কি রকম ফার্ষ্টক্লাস্‌ ড্রাইভ করি।

—আজ নয় কাল—

—কেন?

আজ মোটা রকম একটা লাইফ্‌ ইনসিওর করি, কাল আপনার মোটরে যাবো।

পরিহাসে সকলেই হাসিয়া উঠিল।

কিছুদিনের মধ্যেই ছাত্রেরা বলা আরম্ভ করিল—চল্‌ চল্‌, অষ্টিন এসেছে। মোটরের কৌলিন্যে নীলার এতদিনে এই মহলে আত্মপ্রতিষ্ঠা ঘটল—

*

কাঞ্চন কহিল, দিদি, তোর গাড়ীটা নিয়ে যাবো আজ—

—কেন ?

—রাণুকে বলেছি, আমাদের অষ্টিনের কথা, না গেলে মান থাক্‌বে না।

—আমি যে বেরুব—

—চল্‌ একসঙ্গে যাই, রাণুকে তুলে নিয়ে আস্‌বো, তার পর মেট্রোতে নামিয়ে দিয়ে তুই চলে যাবি। রাণুর মা গাড়ী দেখ্‌তে চেয়েছে—

কাঞ্চন দিদির অর্জ্জিত গাড়ী দেখাইয়া রাণুর মায়ের নিকট নিজের কৌলিন্য সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে চায়। নীলা বুদ্ধিমতী সে কথাটার সমস্তই বুঝিয়াছিল, সে কহিল, রাণুরা আবার মোটর কি দেখ্‌বে—ওদের ত তিনপুরুষেও গাড়ী নেই—

—না থাক্‌, আমি গল্প করেছি ত, গাড়ী না নিয়ে গেলে রাণু বেরোবে না।

—আচ্ছা যা, আমি নিয়ে যাবো—

ওদিকে কমল সস্ত্রীক বাহির হইয়া যায় নিজের মোটরে—সিনেমায় যাইবে। মাতা দ্বিতলের কক্ষ হইতে দেখেন—

*

সেদিন দ্বিপ্রহরে মাতার শরীর অত্যন্ত খারাপ হইয়াছিল, তাহার মনে হইতেছিল আজ বোধ হয় আর বাঁচিবেন না—হৃদয়ন্ত্রটা মাঝে মাঝে যেন থামিয়া যাইতে চায়। নীলা জানিত পথ্য সেবন না করিয়া মাতা এমন করিয়াছেন। তাই সে আসিয়া মাথার নিকটে বিছানায়

বসিয়া মাথায় গায়ে হাত বুলাইয়া কহিল, এই ত এখন বেশ ভাল হ'য়েছ মনে হচ্ছে—ভাল বোধ কচ্ছ না মা?

মা কিছু বলিলেন না, অত্যন্ত দুর্ব্বলভাবে চোখ দুইটি মেলিয়া তিনি একবার চাহিলেন মাত্র—

নীলা কহিল, আজ যেন শরীরটা দুষ্টুমি না করে মা—ক'লকাতার বাইরে মিঃ লোহিয়ার বাগানে আজ পিকনিক আছে—অষ্টিন নিয়ে যেতে হবে তার বিশেষ অনুরোধ—ফিরতে দশটা হবে হয়ত—

মাতা সংক্ষেপে কহিলেন, আজ বাঁচবো না—মনে হয় মা। তোরাও কাছে থাকবিনে?

—ও তোমার ম্যানিয়া মা, তোমাকে বেশ ভাল দেখাচ্ছে, অনেক সবল। কাঞ্চনকে বলে যাচ্ছি, সে বাড়ীতে থাকবে—কোন কিছু হবে না।

—না গেলে হয় না রে?

—তাকি হয় মা, সেদিন দশ হাজার টাকার অষ্টিনটা দিলে, আজই যদি পিকনিকে না যাই কি ভাববে বল ত? একটা কৃতজ্ঞতাও আছে—

মাতা ভাবিলেন—কৃতজ্ঞতা অবশ্যই আছে, কিন্তু তাহার প্রতি, রুগ্ন মাতার প্রতি কোন কর্ত্তব্য কোন কৃতজ্ঞতাই কি আর অবশিষ্ট নাই?

নীলা পুনরায় মাথায় হাত দিয়া কহিল, কিচ্ছু হয়নি মা, তুমি ভেবে ভেবে ওরকম মনে হ'চ্ছে। একটু চুপ করে একা একা শুয়ে থাকো, ঘুমোও ভাল লাগবে—

নীলা উত্তরের অপেক্ষা করিল না, নিজের ঘরে গিয়া ধীরে ধীরে প্রসাধন শেষ করিল। তাহার পর রঙীন ব্যাগটা গোছাইয়া লইয়া নীচে নামিয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে অষ্টিন ষ্টার্টের শব্দ পাওয়া গেল—বৈদ্যুতিক হর্ণ বাজাইয়া গাড়ী গেটের বাহির হইয়া গেল।

মাতা চোখ বুজিয়া সবই শুনিলেন—বুকের মাঝে অসহ্য একটা নৈরাশ্য ও বেদনা যেন হৃৎপিণ্ডটা ধরিয়া মুচড়াইয়া দিল। চোখ দুইটি জ্বালা করিয়া অশ্রু প্রবাহিত হইল—অশ্রুর বন্যায় বালিশ ভিজিয়া যাইতে লাগিল—

*

সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে—

নীচে চাকরটা দুম দুম করিয়া শিলের উপর হলুদ গুঁড়া করিতেছে—শব্দটা বৃহৎ ও মর্ম্মভেদী হইয়া মাতার কানে প্রবেশ করিতেছে—মাথার মধ্যে শব্দটা যেন হাতুড়ী মারিতেছে—পাশে বৌমার ঘরে মৃদুস্বরে রেডিও চলিতেছে—নাকি সুরে কে যেন গান করিতেছে। টেবিলের উপর টাইমপিস্‌টা চলিতেছে—টিক্ টিক্—সুস্পষ্ট—সময়ের নির্দ্দেশ দিতেছে—নীরব সন্ধ্যা, এতক্ষণে হয়ত রাস্তায় বাতি জ্বলিল।

মাতার চক্ষু দিয়া জল পড়িতেছিল—এই নির্জ্জন সন্ধ্যায় কেন মৃত্যু আসিয়া তাহাকে ঘিরিতেছে না—এই দুর্ব্বহ জীবন ও অপরিসীম নিঃসঙ্গতা হইতে কেন মুক্তি দিতেছে না—

মাতা অভিমানে ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছিলেন—অভিমান মৃত্যুর উপর ;—মৃত্যু কেন তাহার কালো অজ্ঞান যবনিকা দিয়া তাহার নিষ্পিষ্ট অন্তরকে ঘিরিয়া দিতেছে না—

পুত্র কন্যা থাকিতেও শিয়রে কেহ দাঁড়াইয়া নাই—ব্যাকুলভাবে কেহই অপেক্ষা করিতেছে না। দেয়ালের রঙীন ছবিটা কেবল তাহার দিকে নিষ্পলক দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে। আপনার জন আজ পর হইয়া গিয়াছে—তাহারা ছুটিয়াছে বিলাস ব্যসন সম্পদের পিছনে। স্নেহ মমতা কৃতজ্ঞতা ত্যাগ সব কিছুকে পিছনে ফেলিয়া—এই ত জগৎ—

চাঁদমোহন বড় লোক হইবার জন্য আসিয়াছিলেন শহরে—গ্রামকে শোষণ করিয়া আনিয়াছিলেন নিজের ভাগ্যকে ফিরাইয়া প্রভূত ধন উপার্জ্জনের জন্য—অন্য কাহারও কথা তিনি ভাবেন নাই—সেই আত্মকেন্দ্রিকতা আজ নীলা ও কাঞ্চনকে মাতার পার্শ্ব হইতে ছিনাইয়া লইয়া গিয়াছে। মাতা নিস্ফল অভিমানে অশ্রুমোচন করিতে করিতে বলিতেছেন—মরণ, শরণ দাও—এ নিঃসঙ্গ জীবনকে দীর্ঘতর করিয়া আর দুর্ভাগ্যকে দুর্ব্বহ করিও না—চোখের জলে মূল্যবান বালিশ ভিজিয়া যাইতেছে—

*

শেরশাহের রচিত গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোড—ভারতের বুক চিরিয়া চলিয়া গিয়াছে। পিচঢালা মসৃণ সুন্দর—তাহার পাশে পাশে বিরাট কারখানায় গগনচুম্বী চিম্‌নি—ভারতের পবিত্র সুন্দর নীলাকাশ ধূমমলিন করিয়া তুলিয়াছে। কারখানায় কাজ করে কত শত হরিহর, আদুরী, সরোজের বংশধর, মালিক তাহার চাঁদমোহনের বংশধরগণ। গোপালপুর ছাড়িয়া এরা আসিয়াছিল, নূতনের মোহে, অর্থের মোহে। সরকারের উৎসাহে হইবে আরও কত কারখানা, রচিত হইবে কত চিমনী—নীলাকাশ ধূমমলিন হইবে। গোপালপুর ছাড়িয়া আসিবে বাগ্দী বাউরী ডোমেরা—সুন্দরী, সরোজ, সুমীরা এখানের বাতাস করিয়া তুলিবে ক্লেদাক্ত—যোগীন, মহিম, নীলার মাতার ন্যায় অশ্রুর বন্যা বহাইবে কত মাতা, কত পুত্র কন্যা। জগৎ আগাইবে—হৃদয় পিছাইবে—প্রাচুর্য্য আসিবে মনের দৈন্য লইয়া, সম্পদ আসিবে ঔদ্ধত্য লইয়া, অকল্যাণ আসিবে কল্যাণের বেশে—আমরা চলিয়াছি—আমরা চলিব নিরুদ্দিষ্ট পিচঢালা রাস্তা দিয়া—বেগে, বিপুল গতিতে—রামলক্ষণ সীতা সাবিত্রীর দেওয়া ত্যাগের

উপর প্রতিষ্ঠিত ভারতের বহু সম্বন্ধ বিশিষ্ট উদার আত্মত্যাগ পুষ্টশান্ত সুন্দর পবিত্র সমাজে জন্মিয়াছে রহিম, যোগীন, নীলা, কাঞ্চন, সুন্দরী— তাহারা ছুটিয়াছে মোটরে—পিছনে জমিয়া উঠিতেছে অশ্রুসায়র—

গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোড দিয়া ছুটিয়াছে নীলার অষ্টিন, পিছনে লোহিয়ার ষ্টুডিবেকার, পেট্রোলের ধোঁয়ায়, চাকার ধূলায় বাতাস হইয়াছে মলিন। ওরা ছুটিয়াছে পিকনিক করিতে—পিছনে ঝরিতেছে মাতার অশ্রু—ধরিত্রীর অশ্রু—

পিচঢালা রাস্তায় নীলার মোটর চলিতেছে দ্রুত, নীলা হাঁকাইতেছে মোটর, পথচারীকে সচকিত করিয়া গ্রামবাসীকে বিস্মিত করিয়া। পাশে রহিয়াছে তাহার রঙীন ভ্যানিটী ব্যাগ—তাহাতে আছে টাকা—আর···

গোপালপুর ছাড়িয়া এরা কোথায় যাইতেছে কেহ বলিতে পারেন? পিছনে আর্ত্তকণ্ঠে—কাঁদিতেছে শ্যামলা সুন্দরী স্নেহময়ী উদার বসুন্ধরা।

সমাপ্ত

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স-এর পক্ষে
প্রকাশক ও মুদ্রাকর—শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য, ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্‌,
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

শ্রীপৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রণীত

দেহ ও দেহাতীত ৪,

বিবস্ত্র মানব ৪,

মরা নদী ৩॥০

পতঙ্গ ১ম ২॥০, ২য় ২॥০

কারটুন ২,

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৬